শিলালিপি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

নতুন সপ্তম সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৭৪

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :
শ্রীশিশিরকুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

—বাবার স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

এই বইয়ের সব চরিত্রই কাল্পনিক। নামসাম্য, স্থানসাম্য কিংবা ঘটনাসাম্য যদি কোথাও কিছু পাওয়া যায়, তা হলে সে সব নিছক যোগাযোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সম্পর্কে লেখকেরও কোনো দায়িত্ব নেই।

প্রথম অধ্যায়

—এক—

আকাশে শাদা মেঘের পাল, নীচে মহাজনী নৌকোর।

বড় ভালো লাগছে অলস কর্মহীন চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতে। মনে হচ্ছে ওই নৌকোগুলো আর কিছুই নয়—পদ্মার ঘোলাজলের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে অতিকায় কয়েকটা চখাচখী।

পদ্মা। গভীর, গম্ভীর। খড়্গধার জলতরঙ্গ। নিজের রক্তের সঙ্গে তার সংযোগ আছে। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে পদ্মার কলধ্বনি শুনতে শুনতে কেমন যেন ঘোর ঘনিয়ে আসে চেতনায়। আর তখন, ঠিক তখনই শোলাবনের নীচে হঠাৎ কে যেন হেসে ওঠে খল খল শব্দে। একটি ছোট্ট নদী—তার নাম আত্রাই।

শিশির-ঝরা কোনো একটা আশ্চর্য সকালে সে চোখ মেলেছিল। চোখ মেলেছিল পদ্মের একটা কুঁড়ির মতো। কিন্তু তখন কি জানত অগ্নিকমল হয়ে ফুটে উঠবে তার সেই দৃষ্টি? শিশির-ঝরা সকাল পথ হারিয়ে ফেলবে মৃত একটা আগ্নেয়গিরির চড়াই উত্‌রাইয়ে?

তারপরে একটা নিঃসীম সমতলের দেশ। বাতাসে ঢেউ-জাগানো-ধান। সুখী, স্বাস্থ্যবান আর কর্মী মানুষের মুখের ওপর রামধনু-রঙা আলো। তার হাতের কাস্তেটা যেন চাঁদ-ঝরা জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া।

তারও পরে আবার সেই শিশির-ঝরা সকাল। সেই আত্রাই নদীর খল্ খল্ শব্দ।

কিন্তু এখনও তো প্রখর পদ্মার মুখর তরঙ্গ। ওপারের বালুচর চোখে ধাঁধাঁ লাগায়—চোখে পড়ে না জনপদ, বালিতে ঘূর্ণি ঘুরে ছুটে যায় কোনো অদৃশ্য চিতার ধোঁয়ার মতো। মৃত আগ্নেয়গিরির শেষ নিশ্বাস—ওরই ওপর দিয়ে এখনো তার দীর্ঘপথ।

—রঞ্জন দা!

ঘুম থেকে জেগে উঠল অন্তরীণবন্দী রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। ডাক্তারবাবুর মেয়ে সীতা।

—কী খবর সীতু?

—মান্টুকে দেখেছেন এদিকে ?

—না তো। কেন, কী হয়েছে ?

—ইস্কুল থেকে পালিয়ে এসেছে—খবর পেয়ে রাগারাগি করছেন বাবা। ভারী দুষ্টু ছেলে হয়েছে।

রঞ্জন হাসল: ইস্কুল থেকে পালিয়েছে বলে অত নিন্দা করছ কেন ? হয়তো বড় হয়ে রবীন্দ্রনাথ হবে।

—ছাই হবে।—পাতলা ঠোঁটদুটিতে এক ঝলক স্নেহভরা ভৎ'সনা ফুটিয়ে তুলল সীতা: ইস্কুল থেকে পালাতে শিখলে কিছু আর হবে ওর ? বয়ে যাবে একদম।

সীতা চলে গেল।

পদ্মার উপর থেকে উঠে এল একটা হু-হু-করা বাতাস। পেছনের বন্ধ দরজাটা শব্দ করে খুলে গেল; আর দরজা খোলবার সেই শব্দটা হঠাৎ যেন একটা ইথারের ঢেউকে আশ্রয় করল—স্পন্দিত হতে হতে ভেসে চলল সময়ের আকাশ দিয়ে পনেরো বছর পেছনে; যেখানে ইস্কুল-পালানো একটি দিনের দরজা খুলল—হঠাৎ শুক্তি-খুলে-যাওয়া নিটোল-মুক্তোর মতো উজ্জ্বল একটি দিন।

ইস্কুল-পালানোর সুবুদ্ধিটা প্রথম বাতলে দিল বাদল।

ভয় যে না করছিল তা নয়। বাড়ীতে কড়া শাসন—একেবারে নিখুঁত ভালো ছেলে করে গড়ে তোলবার চেষ্টায় ত্রুটি নেই কারো। বিশেষ করে বাবার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাবার কল্পনাও করতে পারে না রঞ্জু। বাইরের বারান্দায় তাঁর চটির শব্দ পেলেই অন্তরাত্মা একেবারে শুকিয়ে যেতে থাকে। অপরাধের অঙ্কটা তো সারাদিনে নেহাৎ মন্দ জমা হয়ে ওঠে না। ছোটবোনের ঝুঁটি ধরে টেনে দেওয়া, তেঁতুল গাছে উঠে টক কাঁচা তেঁতুল চিবানো, ঠাকুরমার আচার অপহরণ, গদাযুদ্ধ করতে গিয়ে বালিশ ফাটানো, পড়ার সময় মেজদার সঙ্গে বল খেলা এবং যথা নিয়মে সে বলের রান্নাঘরে ডালের গামলায় অবতরণ। সন্ধ্যাবেলা বাবার চটির শব্দে আদালতের পরোয়ানা বয়ে আনে এবং ফাঁসির আসামীর মতো ম্লান মুখে বসে থাকে রঞ্জু। সময়-মতো ঠাকুরমা যদি কপালগুণে এসে পড়েন সে যাত্রা রক্ষা মেলে, নইলে দু-চার ঘা অনিবার্য এবং দৈনন্দিন।

কিন্তু ইস্কুল পালানো! সে ভয়ঙ্কর, সে কল্পনাতীত। বাবা যদি টের পান তাহলে পিঠের চামড়া সেলাই করতে যে মুচি ডাকতে হবে এ নিঃসন্দেহ। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে রঞ্জু বললে, না ভাই।

—দূর খোকা তুই, খালি ভয় পাস। তোর বাবা জানবে কী করে? আমি তো রোজই ইস্কুল পালাই, কই কাকা তো টের পায়না।

—না, আমার ভয় করে।

—তবে তোর ভয় নিয়ে তুই বসে থাক—বাদল বিরক্ত হয়ে উঠল: আমি খরগোস মারতে যাই।

—খরগোস মারতে যাবি!—এতক্ষণে রঞ্জুর মুখে বিস্মিত কৌতূহল দেখা দিল: কী করে মারবি ভাই? কোথায় পাবি?

বাদল ততক্ষণে বসে পড়েছে বকুল গাছের ছায়ার নিচে। চারদিকে ছড়িয়ে গেছে অজস্র ফুল—ভিজে ঘাসের সঙ্গে তার স্বপ্নের মতো গন্ধ ভাসছে বাতাসে। একটু দূরে আত্রাই। তার খাড়া পাড়ের ওপরে শিমুল গাছের ন্যাড়া ডালগুলো আলো হয়ে আছে—রাঙা টকটকে ফুলে আত্রাইয়ের নীল-ঘোলাটে জলে পাল তুলেছে পাঁচশো-মনী ধানের নৌকো, চলেছে কাঁটাবাড়ীর গঞ্জের দিকে।

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করলে রঞ্জু, একবার তাকিয়ে দেখল সোনারতলী ইস্কুল যাওয়ার রাঙা রাস্তাটা, রবিশস্যের ঐশ্বর্যে ভরপুর সোনালি বড় মাঠটার ভেতর দিয়ে যেটা এঁকে বেঁকে ঈশানপুকুরে বটতলায় গিয়ে হারিয়ে গেছে। বাদলের মুখের দিকে একটা চোরা-চাহনি ফেলে নিজেও ঘাসের ওপরে বসে পড়ল।

বাদল নিশ্চিন্ত আরামে বকুল গাছটায় হেলান দিয়ে বসেছে। ছিঁড়ে নিয়েছে চোরকাঁটার একটা লম্বা ডাঁটা, অখণ্ড মনোযোগে চিবিয়ে চলেছে সেটাকে। আধবোজা চোখে দুষ্টুমিভরা একটা ভঙ্গি করে বললে, কই, গেলিনে ইস্কুলে?

—আগে বল, কোথায় খরগোস মারতে যাবি?

বাদল বললে, কেন বলব? তুই তো আমার সঙ্গে যাবি না। বরং ইস্কুলে গিয়ে আমার নামে লাগাবি, আর পণ্ডিত আমাকে ধরে ঠেঙিয়ে দেবে।

—সত্যি বলছি কাউকে বলব না।

—যাবি আমার সঙ্গে?

রঞ্জুর বুক কেঁপে উঠল: কিন্তু বাবা—

—ধ্যাৎ—চিবোনো চোর-কাঁটাটা ফেলে দিয়ে বাদল বিরক্তিভরে উঠে পড়ল: তোকে বলাই আমার ভুল হয়েছে। ভীতুর ডিম কোথাকার!

—না ভাই, তবে আমাকেও নিয়ে চল।

—কাউকে বলবি না তো?

—কক্ষণো না।

বাদল বললে, তবে আয়।

খরগোশ মারবার আয়োজন সত্যিই তৈরী। বাদলের বুদ্ধি দেখে রঞ্জুর তাক লেগে গেল।

, ছোট আমবাগানটা পেরিয়ে দুজনে এল চণ্ডীবাড়ীতে।

গ্রামের বারোয়ারীতলা এই চণ্ডীবাড়ী। দুর্গাপুজো কালীপুজোর সময় এখানে চালী তোলা হয়, প্রতিমা আসে, বাজনা বাজে, লোকের ভিড় জমে। তিন রাত যাত্রাগান হয়। তারপর সারাটা বছর পড়ে থাকে অনাদৃত হয়ে, এলোমেলো আগাছা গজায়, সাপের আমদানী হয়, শেয়ালের আসর বসে। বোধনের বড় বেলগাছটা থেকে অসংখ্য কাঁচাপাকা বেল চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে, শুকিয়ে শুকিয়ে পাকা বেলগুলো কালো হয়ে যায়, কিন্তু কেউ কুড়োতে যায় না—লোকে বলে ওখানে ব্রহ্মদৈত্য আছে। নিঝুম রাত্রে চারদিকের পৃথিবী যখন থমথম করে, চণ্ডীবাড়ীর আগাছা জঙ্গলের আনাচে কানাচে ঝিঁঝিরা যখন আশ্চর্য তীব্রগলায় ঝিঁ ঝিঁ করতে থাকে, শেয়ালের সাড়া পেয়ে গাঁয়ের কুকুরগুলো যখন ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে—তেমনি সময়, ঠিক তেমনি সময় আচমকা জেগে ওঠে একটা অদ্ভুত খট্ খট্ শব্দ; কে যেন খড়ম পায়ে দিয়ে হেঁটে চলেছে, তাকে দেখা যায় না, শুধু তার শরীরের অতি-বিশাল একটা ছায়া অন্ধকার দিগ্‌দিগন্তের ওপর দিয়ে পিছলে চলে যায়।

চণ্ডীবাড়ীতে ঢুকতে রঞ্জুর পা আর ওঠে না।

—এখানে কেন এলি বাদল ?

—বাঃ রে, এখানেই তো খরগোস।

—ব্রহ্মদৈত্য আছে ভাই, আমি যাব না।

ব্রহ্মদৈত্য না তোর মুণ্ডু। সব বাজে কথা—

এক লাফে বাদল উঠে পড়ল চণ্ডীমণ্ডপে। ক্যাঁচক্যাঁচ করে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করলে একদল চামচিকে, পাখা ঝট্‌পট্ করে তিন চারটে উড়ে চলে গেল বাইরে। রঞ্জুর সমস্ত শরীরটা ছমছম করে উঠল। বড় বেলগাছটা দুলছে—কেমন বিশ্রীভাবে যে দুলছে! কখন ওখান থেকে খড়ম পায়ে ব্রহ্মদৈত্য নেমে আসবে কে বলতে পারে।

ততক্ষণে বাদল অবতীর্ণ হয়েছে চণ্ডীমণ্ডপ থেকে। হাতে করে এনেছে দুটো ধনুক, আর একরাশ প্যাকাটির তীর। তীরগুলোর মাথায় ছোট ছোট পেরেক বসিয়ে একেবারে মোক্ষম করে তৈরী করা হয়েছে। একবার লাগলেই আর দেখতে হবে না—খরগোসের পতন ও মৃত্যু।

—বাঃ, চমৎকার হয়েছে।

—চমৎকার হবে না ?—অসীম আত্মতৃপ্তিতে বাদল হেসে উঠল : কাল সারা দুপুর বসে বসে বানিয়েছি। একেবারে রামের ধনুক হয়েছে—হয়নি রে ?

—তাতো হয়েছে। কিন্তু এখান থেকে এখন চল ভাই—

—আঃ গেল যা। তুই যে ভয়েই মরে যাচ্ছিস। জানিস হাতে তীর-ধনুক রয়েছে, রামচন্দ্রের নাম করে যেই বাণ ছুড়ব, অমনি ব্রহ্মদৈত্য একেবারে ঠাণ্ডা।

—ব্রহ্মদৈত্য আর মারতে হবে না, কোথায় খরগোস আছে দেখাবি চল।

চণ্ডীবাড়ীর একেবারে গা ঘেসেই সুরু হয়েছে কবিরাজের বড় আমের বাগান। একটা পায়ে চলার সরু পথ ঠাণ্ডা ছায়ার ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেছে। রওনা হল দুজনে।

ফাল্গুন মাস। কবিরাজের আমবাগান মুকুলে মুকুলে ছেয়ে গেছে। শুকনো পাতারা ছড়িয়ে আছে সমস্ত বাগানময়, তাদের ওপর ঝির ঝির টপ টপ করে ঝরছে মৌ। মধুর গন্ধে বাতাসেরও যেন নেশা ধরে গেছে, ঠাণ্ডা মিষ্টি ছায়াটা আছে আচ্ছন্ন আর অভিভূত হয়ে। পুরানো আমগাছের শ্যাওলাধরা মোটা গুঁড়িতে জড়িয়ে উঠেছে পরগাছা, হালকা নীল রঙের গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ধরেছে এখানে ওখানে। জংলা বাগান, মাঝে মাঝে গুলঞ্চের লতা দুলছে, পায়ের নিচে অসংখ্য ভুইচাঁপা এক একটা রোদের ঝলক পড়ে মণি-মুক্তোর মতো ঝলমিলিয়ে উঠছে। আর উড়ে বেড়াচ্ছে অসংখ্য ক্ষুদে ক্ষুদে পাহাড়ী মৌমাছি, উড়ে বসছে মধুভরা মুকুলে, আকাশী-রঙের অর্কিডগুচ্ছে, আর ভুইচাঁপার পাতলা পাতলা বেগুনী পাঁপড়ীতে।

বাগানের ভেতর দিয়ে হাঁটতে এখন বেশ ভালো লাগছে রঞ্জুর। ইস্কুল পালিয়েছে—বাড়ীর রূঢ়তম শাসনের ভয়কে অস্বীকার করেই বেরিয়ে পড়েছে দুপুরের এই রোমাঞ্চকর অভিযানে। নিষিদ্ধ আনন্দের উত্তেজনা ঝিনঝিন করে বাজছে রক্তের মধ্যে। ওদিকে এতক্ষণে ক্লাশ নিচ্ছে ধনঞ্জয় পণ্ডিত। টেবিলের ওপরে জোড়া বেত, মুখে বাঘের মত গর্জন! সমস্ত ক্লাসটা আতঙ্কে কাঁপছে—মধ্যপদলোপী আর বহুব্রীহি সমাস বিভীষিকার মতো রাজত্ব করছে।

আর এই বাগান। ঘুমের মতো ঠাণ্ডা। পায়ের নিচে মধুতে চট্‌চটে শুকনো পাতাগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে—জড়িয়ে যাচ্ছে স্নেহের মতো। ইস্কুলের পথটা চলে গেছে শর্ষেফুলের সোনালি রঙেভরা উজ্জ্বল মাঠের ভেতর দিয়ে, কিন্তু এখানে ছায়া, এখানে মিষ্টি গন্ধ আর পাহাড়ী মৌমাছির গুঞ্জন যেন আর একটা—দেশের—আর একটা পালিয়ে যাওয়া জগতের সন্ধান আনছে।

—কোথায় তোর খরগোস ভাই ?

—আর একটু দাঁড়া না, ব্যস্ত হচ্ছিস কেন ?

বাগান ছাড়তেই খানিকটা নিচু জমি। বর্ষায় আত্রাইয়ের জল আসে—তখন নজীপুরের সীমানা পর্যন্ত টানা একটা বিল হয়ে যায়, থই থই করে ঘোলা জলে, মেঠো পিঁপড়েতে ভরা দামঘাসের শিস্‌গুলো ঢেউয়ে দোলা খায়। তারপরে জল নেমে গেলে, থকথকে কাদায় আর একটু টান ধরলে জন্মায় বিশল্যকরণীর জঙ্গল। এদেশে বলে 'বিশ্‌লা'।

বিশ্‌লার জঙ্গল। জঙ্গল বললে ঠিক হয় না, কাল্‌চে সবুজ আর লালের একটা বিশাল সমুদ্র যেন। এদিকে লোকের যাতায়াত বড় নেই, একটু দূরে ভাগাড়ে মরা গোরু ফেলার উপলক্ষে যা দু চারজন আসে যায় মাত্র।

বাদল বললে, এর ভেতরে খরগোস আছে।

—এই জঙ্গলে!

—হ্যাঁ, এই বিশ্‌লার বনে। অনেক আছে, বুঝলি ? সাঁওতালেরা এসে সেদিন তিনচারটে মেরে নিয়ে গেল। তাই দেখেই তো আমি তীর ধনুক তৈরী করলাম।

—কিন্তু খুঁজে পাবি কী করে ?

—ত্যাখ্‌না। তুই জঙ্গলের ভেতর হৈ হৈ করে ছুটে যাবি, আমি তীর ধনুক বাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। তাড়া খেলেই ব্যাটারা বেরিয়ে আসবে আর আমি তীর দিয়ে পটাপট মেরে ফেলব। সাঁওতালেরা সেদিন অমনি করেই মারল কিনা। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শিখে নিয়েছি।

—আচ্ছা। কিন্তু যা জঙ্গল, যদি সাপ থাকে ?

—দূর বোকা—বাদল হো হো করে হেসে উঠল: সাপ থাকবে কেন ?

—বাঃ জঙ্গলে সাপ থাক্‌বে না ?

—আরে, এ যে বিশ্‌লা।

—বিশ্‌লা তো কী হয়েছে ?

—ধ্যাৎ, কিচ্ছু জানিস না তুই—বাদল আশ্চর্য হয়ে গেল রঞ্জুর অজ্ঞতায়: এর আসল নাম কী জানিস ? হুঁ হুঁ, এ বাবা বিশল্যকরণী। রামায়ণের গল্প পড়িসনি ?

রঞ্জু মাথা নেড়ে জানাল সে পড়েছে।

—লক্ষ্মণকে যখন শক্তিশেল মেরেছিল ইন্দ্রজিৎ, তখন হনুমান গন্ধমাদন বয়ে বিশল্যকরণী নিয়ে এল না ? তার তাইতেই তো লক্ষ্মণের প্রাণ বেঁচে গেল। তবে ?

রঞ্জু তবু বুঝতে পারল না, তাকিয়ে রইল।

—বিশল্যার বনে সাপ থাকতে পারে না, গন্ধেই পালিয়ে যায়। কোনো ভয় নেই, তুই ওদিক থেকে তাড়া দে। এক্ষুণি কান উঁচু করে দৌড়ে বেরিয়ে আসবে'খন। তারপর তুই তীর মারবি, আমিও মারব, দেখি ব্যাটারা পালায় কী করে।

অসীম আত্মবিশ্বাসভরে একটা ছোট টিলার ওপরে তীর-ধনুক বাগিয়ে দাঁড়ালো বাদল। নিতান্তই বাঁকারির ধনুক আর প্যাকাটির বান, নইলে মনে করা যেতো অর্জুনের মতো এই মুহূর্তে বাদল একটা ভয়ঙ্কর এবং প্রলয়ঙ্কর কিছু ঘটিয়ে বসতে পারে।

—কোন্‌দিক থেকে তাড়া দেব ?

ধনুকটা আরো জুৎসই করে বাগিয়ে নিয়ে বাদল বললে, যেদিক থেকে খুশি। তুই বড্ড বকাস রঞ্জু। ওদিকে আবার দেরী হয়ে যাবে, খেয়াল আছে তো ?

তা বটে। ইস্কুল ছুটির সময়টা নাগাদ বাড়ি পৌঁছুতেই হবে যেমন করে হোক। নইলে হাতে-নাতেই ধরা পড়তে হবে এবং তার পরিণতি যে কী ঘটবে সেটাও অনুমান করা শক্ত নয় একেবারে।

—দে-দে, তাড়া দে। ওই ওদিক থেকে—হৈ-হৈ—হায়—উৎসাহের আধিক্যে বাদলও টিলার ওপর থেকে লাফিয়ে জঙ্গলের মধ্যে নেমে পড়ল। আর ব্যাপারটাও ঘটল ঠিক সেই সময়ে।

—কক্—কক্—কক্—

জঙ্গলের ভেতর থেকে উঠল একটা বিশ্রী বেখাপ্পা শব্দ। এ তো খরগোসের আওয়াজ নয়। দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

—কক্—কক্—কক্—

আচমকা বিশল্যার বন তোলপাড় করে, প্রবল ঝট্‌পট্‌ আওয়াজ তুলে বেরিয়ে এল একটা বিকট বিভীষিকা। একটা পাখি বটে, কিন্তু রাক্ষুসে পাখি। দেড়হাত লম্বা মিশকালো একটা ন্যাড়া গলা, পিট্ পিট্ করছে লাল বর্ডার দেওয়া গোল গোল চোখ। মস্ত বড় ঠোঁটদুটোকে ফাঁক করে সে তেড়ে আসছে ওদের দিকে, তার পাখার ঝাপটে খণ্ড-প্রলয় উপস্থিত হয়েছে বিশল্যার বনে। বিশল্যকরণীর জঙ্গলে সাপ না হয় নাই থাকল, কিন্তু বকরাক্ষস যে বাস করতে পারবে না এমন কথা তো রামায়ণে লেখা নেই।

—ওরে বাপরে, হাড়গিলা পাখি—

বীর ধনুর্ধর বাদলের দুর্জয় গণ্ডীব হাত থেকে খসে পড়েছে, জঙ্গল ভেঙে

ঊর্ধশ্বাসে আমবাগানের দিকে ছুটেছে বাদল। রঞ্জু যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে, ভয়ে তার পা সরছে না, শুধু সম্মোহিতের মতো পাখিটার লাল টকটকে মস্ত হাঁ-টার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

চমক ভাঙল বাদলের আর্তনাদে।

—পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়। হাড়গিলা পাখি, এক্ষুণি হাড়টাড়শুদ্ধ, গিলে ফেলবে—

—ওরে বাবা—

কোথায় রইল তীর ধনুক, কোথায় রইল ব্রহ্মদৈত্যবধের কঠিন সংকল্প। দুজনে প্রাণপণে ছুটতে সুরু করলে, এখনও বুঝি কক্ কক্ করে পেছন পেছন তেড়ে আসছে পাখিটা। চক্ষের পলক ফেলতে না ফেলতে বাদল অদৃশ্য হয়ে গেল, আর একটা লাটাঝোপের কাঁটাবনে জামাকাপড় জড়িয়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল রঞ্জু। মুখ থেকে বেরিয়ে এল কাতর কান্নার একটা প্রবল শব্দ।

একটু দূরে জঙ্গলের ভেতরে গুলঞ্চের লতা সংগ্রহ করছিলেন অবিনাশবাবু। রঞ্জুর কান্নার শব্দ তিনি শুনতে পেলেন। চমকে তাকাতেই চোখে পড়ল কাঁটাবনের ভেতরে একটি ছোট ছেলে ছটফট্ করছে। কী সর্বনাশ, সাপে-টাপে কামড়াল নাকি।

অবিনাশবাবু দ্রুত ছুটে এলেন।

—একি, রঞ্জন!

রঞ্জু জবাব দিল না, ব্যথায়, লজ্জায় আর ভয়ে দুচোখ দিয়ে তার টপটপ করে জল পড়ছে। হাতমুখ ছড়ে গেছে কাঁটায়, গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। চারদিকে ছড়িয়ে আছে বই, খাতা, শ্লেট, পেন্সিল।

—সর্বনাশ, একি হয়েছে! এই জঙ্গলেই বা ঢুকেছিলে কেন?

তবু জবাব নেই। দুঃখের পাত্র পূর্ণ হয়ে গেছে। বাবার কাছে খবরটা আর চাপা থাকবে না। ইস্কুল পালিয়েছে, জামা কাপড় ছিঁড়ে গেছে, রক্তারক্তি হয়ে গেছে সমস্ত শরীর। খড়মের বাড়িতে পিঠের একখানা হাড়ও আস্ত থাকবে না আজকে—একবার রাগলে বাবার মেজাজ বাঘের চাইতেও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। রঞ্জুর বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা যেন বরফের মতো জমাট বেঁধে গেল। হাড়গিলা পাখিটা যদি হাড়-মাসশুদ্ধ তাকে টক করে আস্ত গিলে ফেললে এর চাইতে বরং ঢের ভালো হত সেটা।

স্নেহে করুণায় অবিনাশবাবুর চোখের দৃষ্টি কোমল হয়ে এল। দুখানি বলিষ্ঠ হাতে রঞ্জুকে তিনি তুলে আনলেন বুকের মধ্যে, কুড়িয়ে নিলেন বইখাতা-

গুলো। বললেন, দুষ্টু ছেলে! এই ভর দুপুরবেলা এমন জঙ্গলের ভেতরে আসতে আছে কখনো!

অবিনাশবাবুর বিশাল বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল রঞ্জু।

কাটা জায়গাগুলো বেশ করে ধুয়ে আইডিন লাগিয়ে দিলেন অবিনাশবাবু, তারপর পেছন দিকের জানালাটা দিলেন খুলে। আত্রাইয়ের বুক থেকে এক ঝলক ভিজে বাতাস এসে রঞ্জুর সর্বাঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

—তা হলে বলো, দুপুরবেলা জঙ্গলে ঢুকেছিলে কেন?

রঞ্জু নতমস্তকে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল, জবাব দিলে না।

—ইস্কুল পালিয়েছিলে, কেমন?

রঞ্জু তেমনি নিরুত্তর।

—এবার তবে তোমার বাবাকে খবর পাঠিয়ে দিই, কী বলো?

রঞ্জু কেঁদে উঠল।

অবিনাশবাবুর একখানা মস্তবড় হাত সস্নেহে রঞ্জুর পিঠের ওপরে নেমে এল। স্নিগ্ধ গলায় বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, খবর না হয় দেব না। কিন্তু কী করছিলে বলো।

—বাবাকে বলবেন না তো?

—তুমি যদি সত্যি কথা বলো, তা হলে এ যাত্রা তোমায় বাঁচিয়ে দিতে পারি। ওখানে কেন গিয়েছিলে?

—ওই বাদল।

—হু, এক নম্বর বাঁদর ছেলে। তা বাদল কী করেছে?

পাংশুমুখে রঞ্জু ঘটনাটা বিবৃত করে গেল।

—ছিঃ, ছিঃ, এমন কাজ কখনো করতে আছে! এইটুকু বয়েস থেকেই মিথ্যে কথা বলতে শিখছ, এখনও তো সমস্ত জীবনটা পড়ে রয়েছে! অন্যায় দিয়ে সুরু করলে সারাটা জীবনই যে অপরাধের বোঝা টেনে কাটাতে হবে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

রঞ্জু চমকে অবিনাশবাবুর মুখের দিকে তাকালো। সে মুখে রাগের চিহ্নমাত্র নেই, চোখের দৃষ্টিতে একটুখানি কৌতুকের আভাসই উঁকি দিচ্ছে বরং। তবু রঞ্জুর মনে হল, বাড়ীর নিষ্ঠুর শাসনের চাইতেও কঠিন একটা নির্মমতা লুকিয়ে আছে অবিনাশবাবুর কণ্ঠস্বরে, অবিনাশবাবুর ধিক্কারের জ্বালাটা যেন ধনঞ্জয় পণ্ডিতের জোড়া বেতের চাইতেও তীব্রবেগে ওর পিঠের ওপরে এসে পড়েছে।

—কী বলো, এমন আর করবে কখনো ?

কান্নাভরা গলায় রঞ্জু জবাব দিলে, না।

অবিনাশবাবু খানিকক্ষণ ওর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আস্তে আস্তে বললেন, বেশ, খুশি হলাম। অন্যায়কে চিনতে শেখো, তাকে স্বীকার করতে শেখো। আমি আরো বেশি খুশি হবো, যদি তুমি তোমার বাবার কাছে গিয়ে যা করেছ সব খুলে বলতে পারো : আমি অন্যায় করেছি, শাস্তি দিন আমাকে।

—বাবা তাহলে মেরে ফেলবেন।

অবিনাশবাবু হাসলেন, না মারবেন না। আর যদি মারেন, তাহলেও পাওনা হিসেবেই সেটা তোমার মেনে নেওয়া উচিত। কেমন, তাই না ?

রঞ্জু মাথা নীচু করে রইল। বোঝা গেল, সাত আট বছরের একটি ছেলের মধ্যে অতটা সৎসাহস এখনো সঞ্চারিত হয়ে ওঠেনি। ওর মুখের ওপর থেকে অবিনাশবাবু দৃষ্টিটা দেওয়ালের ওপরে সরিয়ে নিলেন।

বিচিত্র লোক এই অবিনাশবাবু। সকলের মাঝখানে থেকেও তিনি সকলের চাইতে আলাদা, তাঁর চারদিকে যেন একটা কুয়াশার আড়াল। গ্রামের প্রান্তে একটা ছোট টিনের বাড়িতে একা বাস করেন তিনি। এ দেশের লোক নন, তাঁর দেশ কোথায় তাও কেউ জানে না। হঠাৎ যেন আকাশ থেকে একদিন নেমে এসেছেন অবিনাশবাবু। তিনি স্বদেশী, তিনি কাজ করেন কংগ্রেসের।

কংগ্রেস। একটা স্বপ্নের মতো নাম, রূপকথার মতো অপূর্ব বস্তু একটা। রঞ্জু মাঝে মাঝে বাবার মুখে শুনেছে কথাটা। কংগ্রেসের নামে বাবার মুখের ওপর যেন মেঘের ছাপ পড়ে, চিন্তার রেখা দেখা দেয় কপালে। বাবা পুলিশের দারোগা, এখানকার থানার বড়বাবু। একদিন মাকে বলেছিলেন কংগ্রেসীরা বড় গণ্ডগোল পাকাচ্ছে, ওদের নিয়ে মুস্কিলে পড়তে হবে এরপর।

অবিনাশবাবু কংগ্রেসী। বাবার সঙ্গে পরিচয় আছে, রঞ্জুদের বাড়িতে কখনো কখনো তিনি না আসেন এমনও নয়। তবু রঞ্জুর মনে হয়, বাবা যেন কেমন ভয় করেন অবিনাশবাবুকে, হয়ত এড়িয়ে চলতে পারলেই খুশি হন তিনি।

ওদের ইস্কুলে ক্লাশ সিক্সে পড়ে অশ্বিনী। ধেড়ে ছেলে, পাঁচ বছর ধরে আইনার পরীক্ষা দিয়ে আসছে, পাশ করবার আশা তার নিজেরও নেই, মাস্টারদেরও নেই। হা-ডুডু খেলার মাঠে সেই অশ্বিনী একদিন নিচু গলায় অনেকগুলো কথা বলেছিল ফিস ফিস করে।

—জানিস, অবিনাশবাবু স্বদেশী।

আর একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, স্বদেশী তো কী হয়েছে?

—কী হয়েছে?—বিজ্ঞের মতো মুখ করে তাচ্ছিল্যভরা গলায় অশ্বিনী বলেছিল, স্বদেশীরা কী করছে জানিস কিছু? না ধনঞ্জয় পণ্ডিতের বেত খেয়ে কর্মধারায় সমাস মুখস্থ করেছিস খালি?

শ্রোতারা জবাব দেয়নি।

—ক্ষুদিরামের নাম শুনেছ কেউ?

—না ভাই কে ক্ষুদিরাম?

—হুহু!—অশ্বিনীর গলার স্বর আরো গম্ভীর হয়ে উঠেছিল: নিখিলিস্ট কদের বলে বুঝিস? (রঞ্জু পরে জেনেছিল, কথাটা নিহিলিস্ট)

সবাই জানিয়েছিল, কেউ বোঝে না।

—তাহলে শোন—চোখ দুটো বড় বড় করে অশ্বিনী তেমনি ফিস্ ফিস্ করে বলে গিয়েছিল: তারা সব বোমা আর কামান তৈরী করে। মাটির তলায় তাদের বড় বড় কারখানা আছে—সেখানে সব তৈরী হচ্ছে। ক্ষুদিরাম সেই বোমা দিয়ে লাটসায়েবকে মেরে ফেলেছিল।

—কেন ভাই?

—বাঃ—মারবে না? ওরা যে—অশ্বিনীর গলা আরো নেমে এসেছিল, আরো অনেকগুলো কথা বলেছিলো তেমনি চাপা ভয়ঙ্কর গলাতে। রঞ্জুর মনে আছে স্বাধীনতা বলে শব্দটা শুনেছিল সেই প্রথম।

—তাহলে স্বদেশীরা—

—ওরা বোমা তৈরী করবার দল।

—আর অবিনাশবাবু? কংগ্রেস?

—সব এক।

মনে আছে, সারাটা রাত একটা অশ্রান্ত আশ্চর্য উত্তেজনায় ঘুম আসেনি তার। সমস্ত রাত শুয়ে শুয়ে ভেবেছিল স্বদেশী 'নিখিলিস্ট'দের কথা। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিল কাচের জানালার ওপারে থরে থরে অন্ধকার; আর বাইরে অভ্রাইয়ের বাতাসে দোলা-লাগা কৃষ্ণচূড়া গাছটার ছায়ানৃত্য। মাটির তলায় বোমা আর কামানের কারখানা। যেখানে মখমলের মতো সবুজ আর নরম ঘাস গুচ্ছে গুচ্ছে মাথা তুলেছে, যেখানে ছায়ায় ঘেরা বকুল বনের ভেতরে টুপটুপ করে শিশির পড়বার মতো শব্দ করে ফুল ঝরে পড়েছে—সেইখানে, সেই নিশ্চিন্ত মাটির তলায় কামান আর বোমা তৈরী

হচ্ছে! হঠাৎ একদিন, কেউ বলতে পারে না সে কবে—সেই মাটিতে ভয়ঙ্কর শব্দে চিড় খাবে একটা—রাশি রাশি ধুলোবালি উড়ে চারিদিক অন্ধকার হয়ে যাবে, বাঁশের চাঙাড় আর গাছপালাগুলো যেন ঝড়ের মুখে শোঁ শোঁ করে উড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে আত্রাইয়ের ফেঁপে ওঠা নীল জলে, বেরিয়ে আসবে ক্ষুদিরামের কামান। তারপর—

তারপর আর ভাবতে পারেনি রঞ্জু। অশ্বিনী আরো বলেছিল, শুধু মাটির নিচে নয়, সমুদ্রের জলের ভেতরেও সে কারখানা আছে। সমুদ্রের কাছে যারা থাকে, তারা বলে মাঝে মাঝে নিশুর নিস্তব্ধ রাত্রে আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে ক্ষুদিরামের কামান গর্জন করে ওঠে। সে শব্দ ভয়ানক, সে শব্দ শুনলে তালা ধরে যায় কানে। ক্ষুদিরামের সেই কামান উঠে আসবে একদিন উঠে আসবে মাটির তলা থেকে—সমুদ্রের অতল থেকে। সেদিন—

আজ অবিনাশবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল রঞ্জুর। সে কারখানার খবর জানেন অবিনাশবাবু, জানেন সেই রহস্য ভরা পাতাল-পুরীর কথা। আলিবাবার গল্পে শুনেছিল চি-চিংফাঁক মন্ত্রটা। উচ্চারণ করলেই পাহাড়ের মুখ দু-ভাগ হয়ে যেত, খুলে যেত দস্যুদের রত্ন সঞ্চয়ের চোরা-ভাণ্ডার। তেমনি অবিনাশবাবুও একটা আশ্চর্য মন্ত্র জানেন, যার বলে এই সবুজ ঘাস আর বকুল বনের আবরণটা সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ, পাতালপুরীতে ক্ষুদিরামের কারখানায় যাওয়ার রাস্তা।

অবিনাশবাবুর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রঞ্জু ভাবছিল কথাটা একবার জিজ্ঞাসা করবে নাকি।

আর অবিনাশবাবু তাকিয়েছিলেন দেওয়ালের একখানা ছবির দিকে। তিনি কী ভাবছিলেন তিনিই জানেন, হঠাৎ মুখ ফেরালেন।

—ওই ছবিটা কার জানো? ওই যে চরকা কাটছেন?

—না।

—জানো না? ওঁর নাম মহাত্মা গান্ধী।

রঞ্জু মন দিয়ে ছবিটা দেখবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু আকৃষ্ট হওয়ার মতো কিছু তার চোখে পড়ল না।

—এ যুগে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় সত্যবাদী মানুষ উনি। যা কিছু মিথ্যার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, অত্যাচার, দুঃখ সহ্য করছেন। হতে পারবে ওঁর মতো?

রঞ্জু লজ্জিত হয়ে মাথা নত করে বসে রইল।

অবিনাশবাবুর স্বর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল, ছলছল করে উঠল তাঁর চোখ।

বললেন, শোনো রঞ্জন, বাড়িতে বাবার শাসনের ভয়ে তুমি একটা সত্যি কথা বলতে ভয় পাও, কিন্তু অসংখ্য শাসন, অসহ্য নির্যাতনও ওঁকে সত্যের আশ্রয় থেকে এক তিল নড়াতে পারেনি। তাই আজ উনি এত বড়—তাই যাঁরা ওঁকে শাস্তি দিতে চায়, তাঁরাও মনে মনে ওঁকে দেবতা বলে প্রণাম করে।

—উনি বুঝি স্বদেশী ?

—হ্যাঁ, স্বদেশী বইকি।—অবিনাশবাবুর গলা কাঁপতে লাগল : নিজের দেশে আমরা এতকাল পরদেশী হয়ে ছিলাম, আজ দেশের মধ্যে উনি আমাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। সমস্ত জীবন দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, নিষ্ঠা দিয়ে। তুমি এই গানটা শুনেছ কখনো ?—

হঠাৎ গুন্ গুন্ করে গাইতে শুরু করলেন :

স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে
এ দেশ তোদের নয়—
এই যমুনা গঙ্গা নদী,
তোদের ইহা হত যদি,
পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে
জাহাজ কেন হয়—

রঞ্জু বিহ্বল হয়ে বসে রইল। অবিনাশবাবুর কথা সে বুঝতে পারছে না, ধরতে পারছে না তাঁর ব্যবহারের একটা সঙ্গত ও শোভন অর্থ। সবই তার কাছে বিচিত্র বিস্ময়কর বলে বোধ হচ্ছে।

হঠাৎ চমক ভেঙে গেল অবিনাশবাবুর। এতটুকু একটা ছেলের সামনে এই ভাবে খানিকটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়েছেন তিনি। সামলে নিয়ে বললেন, তুমি গান গাইতে পারো রঞ্জন ?

—ভালো পারি না।

—আমি তোমাকে গান শেখাব। শিখবে ? অনেক ভালো ভালো গান, নতুন নতুন গান।

—শিখব।

বাইরে বেলা পড়ে আসছিল। আত্রাইয়ের নীল জলে লাল-রোদের ঝিলিমিলি। নদীর ওপারের বাগানগুলোর ওপর দিয়ে বকের ঝাঁক উড়ে চলেছে। অবিনাশবাবুর খেয়াল হল।

—আজ আর নয়, অন্যদিন হবে। চলো, বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি তোমায়।

কিন্তু রঞ্জুর মনের মধ্যে উদগ্র কৌতূহলটা থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে

উঠছে। বাড়িতে শাসনের ভয়টা মন থেকে যে মুছে গেছে তা নয়, বুকের ভিতরেও দুরু দুরু করছে এখনো ; তবু ভরসা আছে অবিনাশবাবু একটা কিছু উপায় করে দেবেনই। কাজেই ভয়ের চাইতে একটা কৌতুহলের পীড়নই এখন বেশি তীব্র বলে বোধ হচ্ছে।

—আচ্ছা, অবিনাশকাকা ?

—কী বলছিলে ?

—আপনি—দ্বিধা জড়িত ভাবে রঞ্জু থেমে গেল।

—আমি কী ?—সস্নেহে কৌতুকে অবিনাশবাবু বললেন, কী জিজ্ঞাসা করছিলে ?

—আপনি ক্ষুদিরামের কারখানায় একদিন আমাকে নিয়ে যাবেন ?

—ক্ষুদিরামের কারখানা ! সে কী ?

—বাঃ, সেই যেখানে বোমা আর কামান তৈরি হয় ? মাটির তলায়, সমুদ্রের জলে—

অবিনাশবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

—এসব কথা তোমায় কে বলেছে ?

রঞ্জু বুঝতে পেরেছে একটা বোকামি করে ফেলেছে কোথাও। ক্ষীণ স্বরে বললে, আমি শুনেছি।

কৌতুক-প্রফুল্ল-মুখে অবিনাশবাবু বললেন, আর কী শুনেছ ?

—আপনি তাদের খবর জানেন, আপনি তাদের দলের—

হেসে উঠতে গিয়েও হঠাৎ কেন যেন থেমে গেলেন অবিনাশবাবু। শান্ত কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন রঞ্জুর দিকে। বললেন, তুমি এখনো একেবারে ছেলেমানুষ—এসব কথা এখন বুঝতে পারবে না। শুধু একটা জিনিস মনে রেখো। আজ যাঁর ছবি তোমাকে দেখালাম, তিনি স্বদেশী বটে, কিন্তু এ দলের নন। তিনি বলেন, বোমা কামান দিয়ে কখনো অন্যায়কে জয় করা যায় না, তাকে জয় করা চলে ত্যাগে, জয় করা যায় অহিংসায়। আমি সেই মন্ত্রের সাধক। ক্ষুদিরামের কারখানা যদি কোথাও থাকে, তার সন্ধান নেওয়ার অধিকার আমার নেই ভাই।

রঞ্জুর চোখমুখে অবিশ্বাসের ছায়া স্পষ্ট হয়ে আসে—কথাটা বোঝেও নি, গ্রহণও করতে পারে নি। মৃদু হেসে অবিনাশবাবু বললেন, চলো এবার বাড়িতে তোমাকে জিম্মা করে দিয়ে আসি।

শিলালিপিতে আঁচড় পড়ল সেই প্রথম।

—দুই—

একটা আশ্চর্য জগৎ আছে মনের ভেতরে! সেখানকার নিয়মকানুনগুলোর সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর কোনো মিল নেই। তার আলাদা খাতা, আলাদা নিয়মে তার জমাখরচ। অনেক বড় বড় দুঃখ মিলিয়ে যায়, অনেক উচ্ছ্বসিত আনন্দের স্মৃতি হারিয়ে যায় তার নির্বিচার অপচয়ের নেপথ্যলোকে। হয়তো মনে রাখে কোনো একটা অসংলগ্ন মুহূর্তের একটুখানি সোনালি রেখাকে, ছোট্ট একটু অভিমানের একফোঁটা চোখের জলকে। আকাশ দিয়ে উড়ে যাওয়া নানা রঙের পাখির খসে-পড়া এক এক টুকরো হাল্‌কা পালকের মতো অযত্নে কেউ সেগুলোকে জড়ো করে রাখে; তাদের ভার নেই—শুধু সেই সব উড়ন্ত পাখির মতো আবছা অস্পষ্ট স্মৃতি তাদের ঘিরে থাকে।

আরো আশ্চর্য ছেলেমানুষের মন—। তার হিসাবের খাতা আরো অসংলগ্ন, আরো বিশৃঙ্খল। সেখানে যোগঅঙ্কে প্রতি পদে পদে ভুল, সেখানকার বিয়োগে ঠিক মেলেনা। নিজের দিকে তাকিয়ে এই এলোমেলো হিসেবটা আরো বিচিত্র লাগে রঞ্জুর। রঞ্জুর বললে ঠিক হয়না, পরিণত—হিসেবী রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের।

সেদিনের সেই শিকার অভিযানের পরে কী ঘটেছিল একেবারেই মনে পড়ে না। হয়তো বাড়িতে খানিকটা বকুনি জুটেছিল, হয়তো বাবা কান ধরে দুটো থাপ্পড় দিয়ে থাকবেন অথবা কিছুই হয়নি হয়তো। শুধু সেদিনের সেই ভয়টা, সেই নিষেধ ভাঙবার একটা অপূর্ব উত্তেজনা—শিশুমনের কাছে এর চাইতে বড় সত্য আর কিছুই ছিল না সেদিন। আর তার চাইতে সত্য ছিলেন অবিনাশ-বাবু। তাঁর সেই টিনের চালা দেওয়া ছোট্ট ঘরখানা, দেওয়ালে একটি বিচিত্র মানুষের ছবি—যাঁর নাম মহাত্মা গান্ধী। বাইরে সেই আত্রাইয়ের জলে ঝিলি-মিলি আলোর দোলা আর সেই গানের টুকরোটা: "স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এদেশ তোদের নয়—"

অবিনাশবাবু। অবিনাশবাবুকে আরো একবার দেখেছিল সে—শেষ দেখা।

কত সাল? রঞ্জু তখন জানত না, এখন জেনেছে। বড় হয়ে বই পড়ে জেনেছে। সেই সেবার—যেবার উত্তর বাংলার বুকের ওপর দিয়ে সর্বনাশা বন্যায় মৃত্যুর স্রোত বয়ে গিয়েছিল, সেই বার। এই এতটুকু নদী আত্রাই—এই ঘুমের মতো শান্ত নীল জল, ওপারে বাঁশ আর আমের ছায়া, এপারে

রঙে রঙে আলো-করা ন্যাড়া শিমুলের সারি, এই নদীর বুকেও জেগেছিল মাতলামির নেশা। নদীর জলে ঘূর্ণি ঘুরিয়েছিল পাহাড় ভাঙা গেরি মাটির ঢল, উপড়ে পড়েছিল বড় বড় শিমূল, ডুবিয়ে দিয়েছিল ওপারের ছায়াশ্যামল আমের বন। সেই সেবার।

তিরিশ সালের বন্যা। তেরোশো তিরিশ সাল। অত বড় বান এদিকে আর কেউ দেখেনি কখনো। সমস্ত উত্তরবঙ্গের ওপর নেমেছিল মৃত্যুর তাণ্ডব।

হয়তো সে বন্যার কথাও মনে থাকত না রঞ্জুর। ছোট বড় আরো অনেক স্মৃতির সঞ্চয়ের সঙ্গে সেটাও হারিয়ে যেত—তলিয়ে যেত কালো পর্দাটার আড়ালে। কিন্তু সেই অবিনাশবাবু।

মনে পড়ছে তিন চার দিন থেকে বিশ্রী ঘোলাটে হয়ে ছিল আকাশটা। টিপ্ টিপ্, ঝির্ ঝির্, ঝর্ ঝর্। এলোমেলো বাতাসে শোঁ শোঁ করছিল কৃষ্ণচূড়া গাছটা, ফুল আর পাতা ঝরে ঝরে তার তলাটা একাকার হয়ে গিয়েছিল, তার সঙ্গে পড়ে ছিল জলে-ভেজা দুটো মরা কাকের ছানা। আর কাকের কান্না উতরোল হয়ে উঠে ছাপিয়ে গিয়েছিল বৃষ্টি আর বাতাসের শব্দ।

বাড়ী থেকে বেরুনো বন্ধ। ইস্কুল ছুটি। কাচের জানালা দিয়ে দেখা যায় ওপারের মাঠটা একটা ধূসর ছায়ায় হারিয়ে গেছে—হারিয়ে গেছে নতুন ধানের শীষ্ ওঠা মস্ত মাঠের ভেতর দিয়ে ইস্কুলে যাওয়ার পথটাও। একটু দূরে বকুল বনের নিচে শাদা জল থইথই করছে। বাইরে ঘাসের মধ্যেও জল চিক চিক করছে, সারা দিনরাত ধরে চলেছে ব্যাঙের ডাক। জানা অজানা কত পোকা, কত প্রজাপতি আর ফড়িং উড়ে উড়ে এসে ঘরের ভেতরে আশ্রয় নিচ্ছে অনবরত গুম্ গুম্ করে মেঘের ধমকানি।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে রঞ্জু। ভারী ভালো লাগে। চুপ করে একা একা বসে বৃষ্টি পড়া দেখতে আশ্চর্য ভালো লাগে তার। কেমন ঘুম পায়, কেমন ঝিম ধরে। সত্যিই কি ঘুম পায়? না—ঠিক তা নয়। রূপকথাগুলো মনে পড়ে—ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্প মনে পড়ে—মনে পড়ে কোথায় ক্ষীর-সমুদ্রে ফুটেছে সোনার পদ্ম, তার ঝকঝকে পাপড়িগুলোর ওপর দিয়ে নিটোল মুক্তোর মতো গড়িয়ে পড়ছে বৃষ্টির বিন্দু। অন্ধকার—নীলাভ হালকা অন্ধকার—মস্ত বড় ঘন বৃষ্টি ছায়ায় আরো অন্ধকার হয়ে গেছে, ঘন পাতার ফাঁকে ফাঁকে চুঁইয়ে পড়ছে জল, ফুটেছে অজস্র ভুঁইচাপা; পথ নেই, হাত বাড়িয়ে লতারা আঁকড়ে আঁকড়ে ধরছে। আর তারই ভেতরে পথ ভুলেছে রাজপুত্রের পক্ষিরাজ ঘোড়া, সেই ঘোড়া—যার মনপবনের গতি, পূর্ণিমার রূপালি জ্যোৎস্নায় ডুব

দিয়ে আসা যায় গায়ের রঙ। ওদিকে একটা কালো পাহাড়—মস্ত একটা জানোয়ারের মতো থাবা গেড়ে রয়েছে। বৃষ্টিতে ঠিক বোঝা যায় না ওটা কড়ির পাহাড়, না হাড়ের পাহাড়? ওটা পাশাবতীর দেশ, না শঙ্খমালার পুরী?

বৃষ্টিতে এই সব মনে পড়ে—মনে পড়ে এই সব এলোমেলো গল্প। আকাশের কোণে কোণে ধোঁয়ায় তৈরী নানা আকারের মেঘ উড়ে যায় অতিকায় ফানুষের মতো। এই সব মেঘের যেমন কোনো বাধা-বন্ধন নেই—সাত সমুদ্র তেরো নদী আর অনেক পাহাড় যাদের কাছে সব সমান, ওদের মতোই সমস্ত ভাবনাটা সব কিছুর ওপর দিয়ে পাখনা মেলে দেয়। খালি ইচ্ছে করে—এই বৃষ্টিটা যেন কখনো না থামে—ইস্কুল, ধনঞ্জয় পণ্ডিতের জোড়া বেত, হেড্-মাস্টারের গভীর গম্‌গমে স্বর, অঙ্কের ক্লাসে ভয়ে গলা আর বুকের ভেতরটা অবধি শুকিয়ে ওঠা, পাশাবতীর পাশার একটি দানে তারা যেন মিলিয়ে যায় ভোজবাজীর মতো।

তবু মনটা ফিরে আসে পৃথিবীতে। বেশ লাগে কৈবর্তপাড়ার কালো কালো লেংটি-পরা ছেলেগুলোকে দেখতে। মেঘের ডাকে নাকি কানখাড়া পুকুর-ডোবার জল থেকে বেপরোয়া হয়ে উঠে পড়েছে কইমাছের ঝাঁক। চলছে আধডোবা ঘাসের ভেতর দিয়ে, চলছে বৃষ্টি-ভেজা এটেল পায়ে চলার পথটা দিয়ে কিল্ বিল্ করে। মচ্ছব লেগেছে কৈবর্তপাড়ার ছেলেদের। লেংটি পরে পরে বেরিয়ে এসেছে সব। কারো মাথায় ভাঙা ছাতা, কারো মাথায় টোকা—আর বেশীর ভাগই বৃষ্টি সম্পর্কে একেবারে নিরঙ্কুশ। লাফালাফি, ঝাঁপাঝাপি আর কাড়াকাড়ি করে কইমাছ ধরছে তারা। একজন বেশ চীৎকার করেই গান ধরেছে:

পরাণ পুড়ে গেলরে সই, শ্যামের বিহনে—

বেশ আছে ওরা। ইস্কুলে কখনো যেতে হয়না, বৃষ্টিতে বাইরে বেরুতে ওদের নিষেধ নেই। ওদের জ্বর হবে না কোনোদিন—সর্দিও হবে না কখনো। রঞ্জু ওদের থেকে আলাদা। সে ভদ্রলোকের ছেলে, থানার বড়বাবুর ছেলে। ওদের সঙ্গে ঝাঁপাঝাঁপি করে—তাকে কেউ কই মাছ ধরতে দেবে না। তার মান সম্মান আছে, তার সুকুমার শরীরে জলে ভেজার অত্যাচার সইবে না। রঞ্জু সত্যিই ওদের থেকে আলাদা। আলাদা ওই সব ছোটলোকদের দল থেকে।

লোভ হয়, ইচ্ছে করে সেও ওদের সঙ্গে মিশে দুটো একটা মাছ ধরে। সেদিন যেমন ইস্কুল পালিয়ে বাদলের সঙ্গে খরগোস শিকার করতে গিয়েছিল, রক্তের মধ্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে নিষেধ ভাঙাবার তেমনি একটা উন্মাদনা। কিন্তু

বাবা—বারান্দায় তাঁরই খড়মের শব্দ। কার সঙ্গে যেন কথা কইছেন তিনি।

—নদীতে বান ডাকবে বলে মনে হয়।

কে যেন জবাব দিচ্ছে: হুঁ, খুব জল বাড়ছে।

আর একজন বলছে: লক্ষণ ভারী খারাপ। ধানের ক্ষেতে জল ঢুকেছে। আরো যদি বাড়ে, ফসলের সর্বনাশ করে দেবে একেবারে।

—হাজীগঞ্জের বাঁধটা নাকি টলমল করছে।—বাবার গলা: আমার কনেস্টবল গিয়েছিল, খবর নিয়ে এসেছে।

—কী হবে বড়বাবু?—বৃষ্টি আর বাতাসের মধ্যেও রঞ্জু শুনতে পাচ্ছে আশঙ্কায় বক্তার স্বর কাঁপছে: যদি বান ডাকে কী হবে? তিরিশ বছরের ভেতরেও নদীর এমন চেহারা দেখিনি আমি।

বাবা সান্ত্বনা দিচ্ছেন: ভেবে আর কী করবে। মানুষের তো কোনো হাত নেই ভগবানের ওপর। বরং খবর নাও—হাজীগঞ্জের বাঁধটার অবস্থা কেমন। দরকার হলে ওখানে পাহারা বসাতে হবে।

কথাগুলো রঞ্জুর কানে আসে, কিন্তু মনে দোলা দেয়না। সমস্ত চেতনা যেন চলে গেছে এই পৃথিবীর যা কিছু ধরাছোঁয়ার একেবারে বাইরে। বান ডাকবে—ডাকুক। 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর—নদী এল বান'—

ওই কৈবর্ত ছেলেগুলো কিন্তু আছে বেশ। বাইরের পৃথিবীতে ওইটুকুই রঞ্জুর কাছে সব চেয়ে বড় সত্য।

তবু সত্যিই বান ডাকবে নাকি? যদি ডাকে—কেমন হবে দেখতে? ওইটুকু ছোট নদীটার কূল থাকবে না, কিনারাও না। শাদা জল ছুটে চলবে প্রবল স্রোতে, মাঠ ডুববে, ডুবে যাবে বকুল বন, একাকার হয়ে যাবে আলেয়াদীঘি আর কবিরাজের বাগানের নীচে বিশ্‌লার মাঠ। বেশ লাগবে—সত্যি চমৎকার লাগবে দেখতে।

আর তাই তো—এতক্ষণ যে খেয়ালই হয় নি!

গোঁ—গোঁ—গোঁ—গোঁ। একটানা একটা তীব্র ধ্বনি। বাতাসের শব্দ? না—তা তো নয়। বৃষ্টি? তাও নয়। ঠিক কথা—নদী গর্জাচ্ছে। গোঁ—গোঁ—গোঁ। অনেক দূর থেকে গুমরে গুমরে কেঁদে ওঠবার মতো একটা অদ্ভুত বিশ্রী আওয়াজ।

নদী গর্জাচ্ছে—রঞ্জুদের ছোট্ট নদী আত্রাই। যার জল ঝিলমিলে নীল, যার স্রোতে ভেসে যায় পলাশের রাঙা টুকটুকে ফুল, সেই নদী এমন করে গজরাতে পারে একি কল্পনা করতে পারে কেউ? বিশ্বাসই হতে চায় না যেন।

'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর—নদী এল বান'—

নদীতে বান আসুক—বাঁধ-ভাঙা, মাঠ-ভাসানো বান।

এই খোলা জানালাটার বাইরে বানের জলের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে চলুক রঞ্জুর মন।

শেষ পর্যন্ত সেই বান এল।

সারা দিনরাত সমানে বৃষ্টি চলেছিল। সন্ধ্যার একটু পরেই খিচুড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েছিল সবাই। বৃষ্টির শব্দে কী অদ্ভুত নেশা ভরা ঘুম আসে। মনে হয় চেনা জগৎটাকে আড়াল করে দিয়ে আর একটা নতুন পৃথিবী দেখা দিয়েছে। মায়ের কোলে বসে চিকের পর্দার আড়াল থেকে যাত্রা দেখে যেমন করে, এই বৃষ্টির ধারাও যেন সেই চিকের পর্দার মতো একটা রূপকথার দেশকে রাখে একটা অপরূপ আবরণের আড়ালে ঢেকে।

কিন্তু সকলে জেগে উঠল ঠাকুরমার চেঁচামেচিতে।

তখন মাঝরাত্তির। কালির মতো কালো অন্ধকারে জল আর ঝোড়ো বাতাসের মাতামাতি। এমন সময় জেগে উঠল ঠাকুরমার আকাশ-ফাটানো আর্তনাদ: ওরে খোকা, সব যে গেল!

খোকা অর্থাৎ বাবা দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন, পেছনে পেছনে আর সকলে। আর চার পাঁচটা লণ্ঠনের আলোয় যে দৃশ্য রঞ্জু দেখল জীবনে তা ভুলবার নয়।

জল—জল। আর কিছু নেই জল ছাড়া। রঞ্জুদের দালানের আধ হাত নীচেই থই থই করছে ঘোলা জল—এত বড় উঠোনটা কার মন্ত্রবলে যেন টইটম্বুর পুকুর হয়ে গেছে। উঠোনের ওদিকে ঠাকুরমার ঘরখানা, তার ভিতরটা মাটির—মাটি-ধ্বসে পড়েছে একদিকের বেড়া—আর উঠোনের সেই পুকুরে পরমানন্দে ভাসছে ঠাকুরমার আচারের হাঁড়ি, ঠাকুরের কাঠের সিংহাসন, থালা, ঘটি, বোকনো। দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছে ঠাকুরমার খাটখানা। জলের দোলায় দোলায় সেগুলো নেচে উঠছে, যেন এতদিনের বন্দিত্বের পরেও তারাও শুনেছে মুক্তির ডাক—বেরিয়ে পড়েছে বন্যার আহ্বানে, ঠিক রঞ্জুর চঞ্চল ব্যাকুল মনটার মতোই।

আর সব চাইতে চমৎকার ঠাকুরমার অবস্থাটা। এক গলা জলের ভেতরে দাঁড়িয়ে পরিত্রাহি চীৎকার করছেন তিনি। বুড়ো মানুষ—একটা কিছু টের পেয়ে উঠে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করেই উঠোনে সমুদ্রদর্শন করে ফেলেছেন।

—খোকা রে, আমি গেলাম, সব গেল, হায় হায়—

কারো মুখে আর কোনো কথাই নেই।

হতভম্ব ভাবটা ভাঙল মায়ের চীৎকারে।

—ওগো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কী! মা-যে গেলেন!

ঝপ্ ঝপ্ করে জলে পড়ল সবাই। নামলেন বাবা, বড়দা, বাড়ির চাকর মহেশ, জ্যাঠতুত ভাই নীপুদা।

ধরাধরি করে ঠাকুরমাকে তুলে আনা হল।

বুড়ির তখন কাঁপুনি উঠেছে। দাঁতে দাঁতে একটা অদ্ভুত শব্দ উঠছে ঠাকুরমার—প্রবল জ্বরে ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি উঠলে যেমন হয় অনেকটা সেই রকম। কিন্তু সে কাঁপুনির ভেতরেই চীৎকারের বিরাম নেই তাঁর। একটা বিশ্রী অস্বাভাবিক স্বর, যেন ঠাকুরমার নয়, আর কারুর।

—ওরে, আমার আতপ-চালের হাঁড়ি ভাসছে। ওরে, ওই যে, আমার বাড়ির হাঁড়ি ভাসছে। ওরে, আমার ঠাকুরের সিংহাসন যাচ্ছে—ধর্ ধর্—

অল্প অল্প স্রোতে সেগুলো সব তখন খিড়কির দিকে চলেছে—আর একটু এগিয়ে গেলেই পাবে আত্রাইয়ের প্রবল টান। সুতরাং অবিলম্বে উদ্ধার করা দরকার।

আবার ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্—

ঠাকুরমা সমান ভাবে চেঁচিয়ে চলেছেন: ওরে, আগে ঠাকুরের আসনটা ধর্, ওরে বোক্‌নোটা ওখানে ডুবেছে, ডুব দিয়ে তোল ওটাকে, ওরে, খাট্‌খানাকে যেতে দিসনি! ওরে সব গেল, বাসন গেল, চাল গেল, গুড় গেল, কাপড়চোপড় গেল, তোষক গেল, জাজিম গেল—

চীৎকারটা একটানা চলছিল, হঠাৎ দশগুণ জোরে আর একটা আর্তনাদ উঠল: আরে, আরে, ওটা কী চিক্‌চিক্ করছে রে? আমার মিশির গুঁড়োর কৌটোটা না? ওরে সর্বনাশ, ওটাকে আন—ধর ওটাকে—

উঠোনের জল তোলপাড় হচ্ছে—আট দশটা লণ্ঠনের আলো সেই জলের ওপর পড়ে একটা অপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে এটা ওটা ধরা হচ্ছে, আর এনে তোলা হচ্ছে বড় দালানের দাওয়ায়। ওদিকে ঠাকুরমার ঘরের একখানা বেড়া খসে পড়েই জলের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল। খাটটা দুলতে দুলতে সেই পথে বেরুবার চেষ্টা করছে—আর সব চাইতে মজার, জলের ওপরে ভাসছে শূন্য একখানা টাঙানো মশারি। নিচে খাট নেই, মশারিটা সেটা টেরই পায় নি।

চীৎকার, কোলাহল, আর্তনাদ। কী বুঝেছে কে জানে, ছোট বোনটা

গলা ছেড়ে কাঁদছে প্রাণপণে। সব মিলিয়ে ভারী মজা লাগছে রঞ্জুর। হঠাৎ খিল্ খিল্ করে সজোরে হেসে উঠল সে।

আর সঙ্গে সঙ্গেই কুড়ি জোড়া চোখ ফিরে গেল সেই দিকে।

বাবা, থানার বড়বাবু, তখন ডুব দিয়ে দিয়ে ঠাকুরমার মালিশের কৌটোটা খোঁজ করছিলেন বোধহয়। হাঁপানির রোগী, জলে ভিজে আর উত্তেজনায় এর মধ্যেই হাঁপানির টান ধরেছে ঠাকুরমার। কী অদ্ভুত লাগছে বাবাকে দেখতে! জলে-কাদায় মানুষটিকে চেনাই যায় না আর।

বাবা বোধ করি মালিসের কৌটোটা তখনো খুঁজে পান নি। আর তখন মেজাজটাও কোনো দিক থেকেই খুশি না থাকবার কথা। রঞ্জুর হাসির শব্দে বাঘের মতন গর্জে উঠলেন বাবা।

—অ্যাই—হাসে কে—হাসে কে রে?

রঞ্জু চুপ।

কিন্তু জবাবটা গৃহশত্রু দাদার মুখে তৈরীই ছিল: রঞ্জু হাসছে বাবা।

রঞ্জু কাঠ।

বাবা হুঙ্কার করে বললেন, এদিকে সর্বনাশ হয়ে গেল, আর মজা পেয়েছে ছেলে। ধরে ধরে সব আত্রাইয়ের জলে ফেলে দেব, হাসি টের পাবে তখন।

হাঁপানির শ্বাস টানতে টানতেই ঠাকুরমা বললেন, আহা ছেলেমানুষ, বুঝতে পারে নি—

—নাঃ, বুঝতে পারে নি! আচ্ছা, এসে বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি। খড়ম পিটিয়ে বের করে দিচ্ছি হাসি

কিন্তু ফাঁড়া কেটে গেল। উঠে খড়ম-পেটা করবার মতো সময় এখন বাবার নেই। ঠাকুরমার মালিশের কৌটোটা এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি!

চুপ করে ভাবতে লাগল রঞ্জু। তার মনটা কিন্তু এই দৃশ্যের মধ্যে নেই—ছাড়িয়ে চলে গেছে এই সব, এই কোলাহল, এই আর্তনাদ।

বাবা বলছেন, আত্রাইয়ের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন ওকে। আত্রাই! ওই তো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে আত্রাইয়ের গর্জন—সন্ধ্যাবেলায় শোনা সেই গুমরে কান্নার মতো গোঁ গোঁ শব্দ। কিন্তু কত স্পষ্ট এখন, কত প্রবল। রঞ্জু সাঁতার জানে না, কিন্তু কেমন যেন মনে হচ্ছে আত্রাইয়ের জলে ওকে ফেলে দিলে সেটা নেহাৎ মন্দ হয় না একেবারে। কেমন হয়েছে এখন নদীর চেহারা, কেমন ভয়ঙ্কর তীব্র তার গতি? তার স্রোতের টানে ও চমৎকার ভেসে যেতে পারবে, সাঁতার জানবার দরকারই হবে না। কোথা থেকে কোথায় চলে

যাবে রঞ্জু, দেশের পর দেশ ছাড়িয়ে, গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে, জানা থেকে কতদূরে কোন অজানা অচেনার আশ্চর্য জগতে। গল্প শুনেছে, ভেলায় চড়ে লোকে সাত সমুদ্রের নোনা জল পেরিয়ে যায়, আচ্ছা, ঠাকুরমার খাটটায় চড়ে ও কি তেমনি অনেক নদী, অনেক সাগর পাড়ি দিয়ে চলে যেতে পারেনা কোনো শঙ্খমালার দেশে ?

কিন্তু শঙ্খমালার দেশ নয়, সকালের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে যে দেশ ওর চোখে পড়ল তা রূপকথার গল্পের চেয়েও আশ্চর্য।

বাড়ির বাইরে কি মাঠ ছিল কখনো ? ওদের বৈঠকখানা ঘরটা—রোজ সকালে টাট্টু ঘোড়ায় চেপে নবদ্বীপ মাস্টার মশাই এসে যে ঘরে বসে ওদের হস্তলিপি লেখাতেন, তারই সামনে রঞ্জুর নিজের হাতে পোঁতা দো-পাটী ফুল গাছগুলোর অস্তিত্ব ছিল কি কোনো দিন ? না, কেউ বলতে পারে তারই কাছাকাছি একটু ছোট খুঁটি ছিল, যাতে নবদ্বীপ মাস্টার তাঁর বুড়ো ঘোড়াটাকে বেঁধে রাখতেন ? আরো একটু দূরে ছিল বন্দরে যাবার রাস্তাটা, তার দুপাশে নুয়ে নুয়ে ছিল বুনো দ্রোণ ফুলের ঝাড়—কিন্তু কোথায় গেল সে সব ?

কোথায় গেল সে সব ? পরিচিত পৃথিবীটাই বা হারিয়ে গেল কোন্‌খানে ? রঞ্জু কাল বসে বসে যে বানের কথা ভাবছিল, এ মূর্তি তার সে কল্পনাকেও ছাড়িয়ে চলে গেছে। ওই বকুল বনের নিচে যেখানে শাদা জল চিকচিক করছিল ঘাসের মধ্যে, কানে হেঁটে হেঁটে চলেছিল উজান-দেওয়া কই মাছের ঝাঁক, আর কৈবর্ত ছেলেরা পরমোল্লাসে যেখানে হুটোপুটি করছিল— যেন চেনাই যায় না সে জায়গাটাকে। জলের ওপর বুকল গাছগুলোর আধখানা করে জেগে আছে, তাদের মাথার ওপরে অশ্রান্তভাবে চেঁচামিচি করছে শালিকের দল। বোধনতলায় দিকটায় শুধু খানিক উঁচু জমিতে সবুজ ঘাস মাথা তুলে রয়েছে, তা ছাড়া জল, সব জল। থানাটা জলের ওপরে ভাসছে মস্ত একটা লাল রঙের নৌকোর মতো, ইস্কুলে যাওয়ার মস্ত মাঠটার ওপর সমুদ্রের ঢেউ খেলছে। কাল পর্যন্ত পৃথিবীর মাটি ছিল সবুজ, আজ সব শাদা, সব ঘোলাটে, যেন মাত্র একটি রাত্রির মধ্যে ওরা একটা নতুন কোনো দেশে এসে পৌঁছেছে।

জল আর জল। তিন দিন ধরে মেঘলা ছিল আকাশ, বাতাস বইছিল দমকা, বৃষ্টি পড়ছিল কখনো তীরের মতো, আবার কখনো ফুলঝুরির মতো ঝুর ঝুর করে। কিন্তু কী আশ্চর্য, সে মেঘ সে বৃষ্টি আজ যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে। মাথার ওপরে ধরা দিয়েছে নীলাঞ্জন আকাশ, তার কোণায় শাদা

শাদা হালকা মেঘের ছেঁড়া টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে। আর উঠেছে রোদ, গলানো সোনার মতো তাজা মিষ্টি রোদে, অপর্যাপ্তভাবে ঝরে পড়েছে নিচে শাদা জলের ওপরে, যেন ছোট্ট খোকার কান্নাভরা চোখের ওপর মায়ের হাসিভরা চুমু পড়েছে এসে।

—তিন—

জল দুলছে, জল নাচছে, জল খেলা করছে। মাঠ নেই, পথ নেই, আলেয়া দীঘিটার চিহ্নই নেই। কৃষ্ণচূড়া গাছটার গুঁড়িটাকে ঘিরে ঘিরে জল পাক খাচ্ছে, সেই মরা কাকের ছানাদুটো যে এতক্ষণে কোথায় ভেসে গেছে কে বলবে! শুধু নতুন-রোদ-ওঠা আকাশে পাখা মেলে দিয়ে ঘুরে ঘুরে একদল কাক কান্নাকাটি করছে এখনো।

রোদ উঠেছে আকাশে, চারদিন পরে নতুন রোদ। একটা নতুন অপরূপ আর অচেনা পৃথিবীর ওপরে। বেশ খুশি হয়ে দেখছিল রঞ্জু, হঠাৎ তার খেয়াল হল সে যতটা খুশি হয়েছে, আর কারো ততটা খুশি হবার মতো কারণ ঘটেনি।

সকালের আলোয় এ জলের খেলা তো সুন্দর নয়—এ যে একটা ভয়ঙ্কর সর্বনাশের রূপ! আস্তে আস্তে রঞ্জু এও শুনতে পেলো যে শুধু তার ঠাকুরমার ঘরই নয়, আরো অনেকের ঘর গেছে, গেছে ঘরের সঙ্গে সঙ্গে যথাসর্বস্ব। বন্দরের যে দিকটায় মালোপাড়া ছিল, সেখানে দাঁড়িয়েছে দু বাঁশ জল। নদীর ধারে মশানীর পুরানো মন্দিরটা ধ্বসে নেমে গেছে নদীর গর্ভে। ওপারে চণ্ডীপুরের দিকে যে কী হয়েছে, সে কথা কেউ বলতেই পারল না। বন্দরের ঘাটে ঘাটে যে সব নৌকো বাঁধা ছিল, বন্যার টানে কাছি-নোঙর উপড়ে তারা অদৃশ্য হয়েছে, কোথায় কোন্ পথে দরিয়ায় ভেসে চলে গেছে একমাত্র ভগবানই সে সন্ধান দিতে পারেন।

আর সেই সঙ্গে মানুষের আর্তনাদ—মানুষের হাহাকার।

—হায় ভগবান! তোমার মনে এই ছিল!

—ওগো, তোমরা কেউ আমার ছোট ভাইটাকে দেখছে, জহিরুদ্দিকে? কাল বানের টানে সে ভেসে গেছে, কোথাও উঠেছে বলতে পারো?

—হায় হায়, আমার তিনটে গোরু গেল, ছটা ছাগল—

—বাবু গো, ঘরের ধান গেল, চাল গেল, জিনিসপত্তর সব গেল, আমাদের উপায় কী হবে?

কে কাকে উপায় বলে দেবে। নিজের উপায়ই কেউ জানেনা। থানায় গিজ গিজ করছে লোক, দলে দলে লোক হাঁড়ি-কুঁড়ি বাক্সো-প্যাটরা যা পেয়েছে নিয়ে এসে উঠেছে রঞ্জুদের দালানে। তাদের অবস্থা দেখে ঠাকুরমা পর্যন্ত আচারের বোয়ামের কথা ভুলে গেছেন।

বারান্দায় পাতা হয়েছে মস্ত বড় একটা উনুন। তাতে হাঁড়ি-বোঝাই করে খিচুড়ি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সারাদিন সমানে চলেছে সেই খিচুড়ি রান্না, লোকগুলোকে খাওয়ানো হচ্ছে। তাদের বিলাপে-আলাপে রঞ্জুর যা কিছু ভাবনা কল্পনা—সব ছায়াবাজীর মতো মিলিয়ে গেছে মন থেকে। ভয়—একটা অস্বাভাবিক ভয়ে বুকের ভেতরটা অবধি শুকিয়ে উঠেছে তার। বাইরের শাদা খল্‌খলে জলে যেন একটা নিষ্ঠুর হাসি ; দূর থেকে নদীর গোঙ্‌রানি যেন একটা বন্যজন্তুর আর্তনাদ—শীতের রাত্রে ফেউয়ের ডাক শুনে বাঘের কল্পনায় যেমন ভয় পেয়েছিল, ঠিক সেইরকম।

—হে আল্লা, জল নামাও, জল নামাও—

—মুন্সীহাটের ওদিকটার আর কোনো চিহ্নই নেই, সব সাফ হয়ে গেছে।

—ঢের ঢের মানুষ মরেছে, আমার সামনেই তো হোসেন হাজীর বউ ব্যাটা বানের টানে ভেসে চলে গেল দেখলাম—

—হায় ভগবান, আমাদের উপায় কী হবে ?

উপায় কী হবে ? তার জবাব দিলেন অবিনাশবাবু।

আখের চাষ আর গুড়ের জন্যে গঞ্জটা বিখ্যাত। বন্দরের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে কতদিন রঞ্জু দেখেছে উঠোন-জোড়া এক একটা মস্ত কড়াইতে জ্বাল দেওয়া হচ্ছে আখের রস। পাতা পুড়ছে, লাকড়ি পুড়ছে, আর মস্ত মস্ত কাঠের হাতা দিয়ে নাড়া দেওয়া চলছে প্রথম-দানা-ধরে-আসা তরল গুড়কে। বাতাসে ভাসছে গুড়ের উগ্র মধুর একটা গন্ধ। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যারা ভিড় করেছে সেখানে শাল পাতায় তাদের একটু একটু গরম গুড় দেওয়া হচ্ছে, পরমানন্দে চেটে চেটে খাচ্ছে তারা।

রঞ্জুর ওই গুড় খাওয়ার জন্যে যে খুব লোভ জেগেছে তা নয়। তবু ওই বিচিত্র উগ্র গন্ধটা, লালচে হয়ে আসা ফুটন্ত ওই ঘন রসের গন্ধ ভারী ভালো লেগেছে তার। ইচ্ছে করেছে তাকেও যদি পাতায় করে ওই রকম একটুখানি গুড় দেয়, সে খেয়ে দেখতে পারে কেমন লাগে। কিন্তু উপায় নেই। সে বড়বাবুর ছেলে, ওসব ছোট লোকের খেয়াল মনের কোনে তার স্থান দেওয়াও চলবে না।

—আর আশ্চর্য, কত বড় ওই কড়াইগুলো। অত বড় কড়াই যে কী করে তৈরী করল, সেটা যেন ভেবেই পাওয়া যায় না। ওই রকম একটা কড়াইতে চুপচাপ শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে রঞ্জু, ঘুমুতে পারে স্বচ্ছন্দ আরামে।

আজ বান ডেকেছে। বাঁধ-ভাঙা, উপছে-পড়া ভয়ঙ্কর বান। ক্ষেপে উঠেছে, নাগিনীর মতো, গজ্‌রে উঠছে ঘুমন্ত নদী আত্রাই। এই সময় রঞ্জু দেখতে পেল, শুড় জাল দেওয়ার চাইতেও আরো ঢের ঢের বেশী কাজ করতে পারে ওই কড়াইগুলো!

চোখকে বিশ্বাস কি করা যায়? না—যায় না। তবু এ সত্যি—বাইরের ঝকঝকে শাদা জলের ওপর সকালের মিষ্টি নরম রোদটার মতোই সত্যি।

বন্দরের ওদিক থেকে জলের ওপর দিয়ে দুলতে দুলতে আসছে মস্ত একটা কড়াই। সেই কড়াইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অবিনাশবাবু। একটা লম্বা বাঁশ তাঁর হাতে। লোক যেমন করে লাগি দিয়ে নৌকা ঠেলে নিয়ে যায়, তেমনি করে বাঁশের খোঁচায় কড়াই বাইতে বাইতে অবিনাশবাবু ওদেরই বাড়ির দিকে আসছেন!

এই অপূর্ব নৌকায় আরোহণ করে ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন একেবারে কৃষ্ণচূড়া গাছটার সামনে। তারপর কড়াইয়ের আংটার ভেতর দিয়ে লাগিটা মাটিতে পুঁতে দিয়ে এক লাফে রঞ্জুদের সিঁড়িটার উপর নেমে পড়লেন।

শশব্যস্তে বেরিয়ে এলেন বাবা: অবিনাশবাবু যে! ব্যাপার কী!

অবিনাশবাবুর সারা গা বেয়ে টপটপ করে ঘাম গড়িয়ে পড়ছিল। অতখানি রাস্তা কড়াইয়ের নৌকাটা ঠেলে আনতে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে। একটু দম নিয়ে তিনি বললেন, চাটুয্যে মশাই, সর্বনাশ যে।

—আপনার আশ্রমের খবর কী? ঠিক আছে তো?

—তা আছে। ওদিকটাতে জল ওঠেনি। কিন্তু মালোপাড়ার খবর শুনেছেন বোধ হয়।

বাবা বিষণ্ণস্বরে বললেন, শুনেছি।

—কী করা যায় বলুন দেখি?

বাবা হতাশার ভঙ্গি করলেন: কোন উপায়ই তো দেখছি না। একেবারে নদীর গায়ে, শুনেছি বারো হাত জল দাঁড়িয়ে গেছে সেখানে।

—আর মানুষগুলো?

বাবা তেমনি ব্যথিত গলায় বললেন, ভগবান জানেন।

—না, না ভগবান নয়।—অত্যন্ত চঞ্চল শোনালো অবিনাশবাবুর কণ্ঠ:

আমাদেরও কিছু করবার আছে। শুনেছি বড় বটগাছটায় এখনো কিছু কিছু লোক ঝুলে-ঝাপ্‌টে রয়েছে কোন রকমে। ওদের উদ্ধার করা দরকার। একটুও দেরী নয়—স্রোতের টানে গাছ উপ্‌ড়ে যেতে পারে!

বাবা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, তা তো বুঝলাম, কিন্তু ওখানে যাওয়া যায় কী করে? নৌকো তো একখানাও পাওয়া যাবে না, স্রোতের তোড়ে সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

অবিনাশবাবু চোখ দপদপ করে উঠল; শান্ত নম্র চোখদুটিতে এমন জোয়ালো আগুন থাকতে পারে, এমন করে যে কোন মানুষের চোখ জ্বলে উঠতে পারে, রঞ্জুর জীবনে এ অভিজ্ঞতা এই প্রথম।

অবিনাশবাবু স্বর তীব্র: তাই বলে এতগুলো মানুষ এমনভাবে মরতে পারে না। এ কখনোই হতে দেওয়া যাবে না, কোনমতেই নয়।

বাবা যেন এবার একটুখানি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, আপনি কী করতে চান?

সতেজ গলায় জবাব এল: ওদের উদ্ধার করব।

—কেমন করে?

অবিনাশবাবু আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলেন কড়াইটা: ওই ওটায় করে।

—পাগল আপনি!—বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন: ওই কড়াইতে করে! ওটায় আপনি ক'জন মানুষকে তুলে নিয়ে আসতে পারবেন?

—যে কজন পারি। একজন-দুজন। বারে বারে গিয়ে নিয়ে আসব।

বাবার মুখের চেহারা ক্রমে গম্ভীর হয়ে উঠতে লাগল: অবিনাশবাবু, পাগলামি করবেন না। ওখানে নদীর ভয়ঙ্কর টান, ও কড়াই আপনি কিছুতেই সামাল দিতে পারবেন না। শেষকালে আপনি শুদ্ধ—

এক মুহূর্তের জন্যে মাথা নিচু করে রইলেন অবিনাশবাবু। পরক্ষণেই যখন তিনি মাথা তুললেন, তখন তাঁর চোখে আবার ঝক ঝক করে উঠেছে সেই আশ্চর্য আগুনটা। কাচের জানালায় পেছনে দুটো আলো জ্বেলে দিলে সামনে থেকে যেমন দেখায়, তেম্নি দেখতে লাগল অবিনাশবাবুর চোখ দুটোও—যেন তাদের আড়ালে কেউ দুটো প্রদীপ জ্বেলে রেখেছে।

শান্তগলায় অবিনাশবাবু বললেন, জানি!

বাবা বোঝাবার ভঙ্গি করে বললেন, তবে? জেনে শুনে ও বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছেন কেন?

এবারে অবিনাশবাবু হাসলেন, অত্যন্ত মিষ্টি করে হাসলেন? রঞ্জুর মনে

পড়ল তাঁর আর একদিনের এমনি সুন্দর হাসির কথা, সেদিন সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি 'নিহিলিস্ট' কিনা।

বললেন, আমি সত্যাগ্রহী চাটুয্যে মশাই। মরাটা আমার কাছে বড় কথা নয়, তার চাইতে ঢের বড় সত্যপালন। সেই চেষ্টাই আমি করব। একজন মানুষকেও যদি বাঁচিয়ে যেতে পারি, তা হলে মরতে আমার এতটুকু দুঃখ নেই।

বাবা হাল ছাড়েননি তখনো। বললেন, থামুন, পাগলামি করবেন না। যা সম্ভব, তারই চেষ্টা করা ভাল, অসম্ভবের ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপদ ডেকে আনবার কোনো মানে হয় না। তা ছাড়া দেশ আপনাদের কাছে অনেক কিছু আশা করে, এত সহজে আপনারা মরলে চলবে কী করে?

দেশ। কথাটায় বাবা ইচ্ছার বিরুদ্ধেও একটুখানি খোঁচা দিয়েছিলেন হয়তো—অথবা হয়তো বলেছিলেন, নিতান্ত সহজ আর নিরীহভাবেই। কিন্তু অবিনাশবাবু আর বসলেন না, সঙ্গে সঙ্গে পিঠের মেরুদণ্ডটাকে একেবারে সোজা করে খাড়া করে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

অবিনাশবাবু বললেন, চাটুয্যে মশাই, দেশ বলতে আমি ঝাপ্‌সা বা আবছায়া কিছু বুঝি না, একটা মানচিত্রও আমার দেশ নয়। দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে যদি কোনো একটা আলাদা দেশের অস্তিত্ব থেকে থাকে, তার সম্বন্ধেও আমার কোনো কৌতূহল নেই। আপাতত এই মানুষগুলোকে বাঁচানো ছাড়া দেশের প্রতি কোনো বড় কর্তব্যও আমি দেখতে পাচ্ছি না।

বাবা বললেন, কিন্তু আপনি পারবেন না।

—অন্ততঃ চেষ্টা করতে পারি, সেইটাই আমার সান্ত্বনা।

বাবা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সময় দিলেন না অবিনাশবাবু। বাইরে এসে তিনি একলাফে আবার তাঁর কড়াইয়ের নৌকোতে উঠে বসলেন। তারপরেই বাঁশের খোঁচায় তেমনি ভাবে কড়াই দুলতে দুলতে বন্দরের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাবা সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, লোকটার সত্যিই মাথা খারাপ, বেঘোরে প্রাণটা দেবে মনে হচ্ছে।

অবিনাশবাবুর সত্যিই মাথা খারাপ ছিল কিনা এ প্রশ্নের উত্তর আজো রঞ্জু পায়নি। বাবার শেষ অনুমানটা কিন্তু ভুল হয়নি। সেই যে কড়াইতে বাঁশের খোঁচা দিয়ে বানের জলের ওপর দিয়ে তিনি ভাসতে ভাসতে চলে গিয়েছিলেন, তারপরে রঞ্জু আর কোনোদিন তাঁকে দেখতে পায়নি—।

রূপ নেই, কোন আকার নেই তাঁর। কালো হয়ে আসা আব্‌ছা দিনের আলোর পটভূমিকায় ধূপছায়া রং দিয়ে কে যেন এঁকে রেখেছে তাঁকে—পৃথিবীকে অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা পরিবেশের সঙ্গে একাকার হয়ে তিনি মিশে আছেন। তাঁকে দেখা যাচ্ছে না, অথচ তিনি আছেন, তাঁর গলার কোনো স্বর নেই—অথচ স্বরের একটা মূর্ছনা কাঁপছে বাতাসে বাতাসে ; রঞ্জুর কানের কাছে দীর্ঘনিশ্বাসের মতো শব্দ করে কে বলছে, রঞ্জু, রঞ্জু, রঞ্জন –

পাথরের মূর্তির মতো থেমে দাঁড়িয়েছে রঞ্জু। বুকের ভেতর পাথর হয়ে গেছে হৃৎপিণ্ডটা। তার চোখদুটোয় কোনো পলক পড়ছে না, যেন সে দুটোও পাথরের চোখ।

তারপরেই সেই আকারহীন দেহটা চলতে শুরু করলে অবিনাশবাবু। শব্দহীন কণ্ঠস্বরটা অশ্রান্ত বেজে উঠতে লাগল : রঞ্জু, রঞ্জন, রঞ্জু—

রঞ্জু চলতে লাগল। খিড়কি দরজার দিকে নয়, বাড়ির দিকেও নয়। চলে গেল সে বাদুড়ের পাখা-ঝাপ্‌টানো পেয়ারাগাছটার তলা দিয়ে, চলে গেল ভাহুকের কান্না-ওঠা ঘন অন্ধকার বাসকবনটার পাশ দিয়ে। কোনো কিছু তার মনে পড়ল না, কোনো কিছু সে ভাবতে পারল না ; মনে পড়ল না বাইরের বৈঠকখানা ঘরে লণ্ঠনের আলো জ্বলে উঠেছে এতক্ষণে, ভাইবোনেরা সবাই সুর তুলে পড়তে শুরু করেছে বিকট গলায় এবং সে এখনো বই নিয়ে এসে বসে নি বলে তার কান দুটো মলে দেবার জন্যে জ্যাঠ্‌তুতো ভাই নীতুদার হাত নিস্‌পিস্‌ করে উঠেছে।

রঞ্জু চলতে লাগল। পায়ে চলা পথ দিয়ে ক্রমশ এল আত্রাইয়ের নির্জন ঘাটে, তারপর ঘাট ছাড়িয়ে এগিয়ে চলতে লাগল। আরো, আরো, আরো, আরো—

আকারহীন মূর্তিটা চলে যাচ্ছে সম্মুখে। তার পায়ে পায়ে কোনো শব্দ উঠছে না, অথচ শুনতে পাচ্ছে রঞ্জু ; তাঁর গলায় কোনো স্বর নেই অথচ সে স্বর স্পষ্ট কানে আসছে ; এই কালীসন্ধ্যেয় অশরীরীরা জেগেছে, অবিনাশবাবুও জেগে উঠেছেন তাঁর মরণ-ঘুম থেকে, আত্রাইয়ের নীল জলের নীচে ঝুরঝুরে মিহি বালির ওপরের ঠাণ্ডা বিশ্রাম থেকে। আর সেই সঙ্গে সন্ধ্যাটাও স্বরূপ হয়ে উঠেছে। যা দেখা যায় না, তাই দৃষ্টির সামনে প্রত্যক্ষ রূপ ধরেছে, যা নেই তাই নিয়েছে নির্ভুল সত্যের মূর্তি।

কানের কাছে হুহু করে আত্রাইয়ের বাতাস : রঞ্জু, রঞ্জু, রঞ্জু—

রঞ্জু চলেছে—কতক্ষণ ধরে চলেছে খেয়াল নেই। ধূপছায়া রঙের সন্ধ্যাটা ক্রমে নিবিড় কালো হয়ে গেল, আলেয়া দীঘির ধারে নাচানাচি করে উঠল

অসংখ্য—অগণিত আলেয়া। অবিনাশবাবুর নিরবয়ব মূর্তিটা তেমনি কালো হয়ে উঠতে লাগল জমাট অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে।

চ্যাঁ—চ্যাঁ · চ্যাঁ—

মাথার ওপরে প্যাঁচার বীভৎস একটা তীব্র চীৎকার শোনা গেল।

এতক্ষণে রঞ্জুর চমক ভাঙল। এতক্ষণে যেন ঘুম ভেঙে গেল তার।

এ সে কোথায় এসে পড়েছে! করছেই বা কী! চারদিকে থম্‌থমে অন্ধকার—জনপ্রাণীর চিহ্ন মাত্র নেই। একটু দূরে কবিরাজের বড় আম-বাগানটার মাথাগুলো আত্রাইয়ের বাতাসে শোঁ শোঁ করে দুলছে, যেন অতিকায় কতকগুলো ভূত-প্রেত মাথা নেড়ে নেড়ে ডাকছে রঞ্জুকে।

আর রঞ্জু একমনে ঘুরে ঘুরে প্রদক্ষিণ করছে একটা টিনের চালার ধ্বংসস্তূপ—অবিনাশবাবুর আশ্রমটা! কতকগুলো ভাঙা খুঁটি মড়ার হাড়ের মতো অন্ধকারে এদিক ওদিকে ছড়িয়ে, তাদের ওপর চাপা দেওয়া নানা আকারের কতকগুলো টিনের টুকরো। রঞ্জু তারই চারদিকে বারবার ঘুরছে, ঘুরছে বিছুটির জঙ্গল মাড়িয়ে, ভাঁট্ ফুলের ঝোপ ভেঙে, জানা-অজানা ছোট ছোট গাছ-গাছালি পায়ের তলায় দলে দলে। চারদিকের বনে জঙ্গলে কালিঢালা রাত্রি, জন-মানুষের চিহ্ন-হীন ঘন অন্ধকারে আমবাগানটার ভৌতিক আহ্বান!

—চ্যাঁ—চ্যাঁ—চ্যাঁ—

মাথার ওপরে আবার প্যাঁচার চীৎকার। যে মুহূর্তে রঞ্জু থেমে দাঁড়ালো, সেই মুহূর্তে অসীম ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার চেতনা। দ্রোণ ফুলের কষায় গন্ধভরা ঝোপটার ওপরে যখন সে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল তখন শেষবারের মতো তার চোখে পড়ল আকাশের কালো শ্লেটটার গায়ে কতগুলো আলোর অক্ষর দিয়ে কে যেন একটা দুর্বোধ্য লিপি লিখে চলেছে!

—চার—

তিরিশ সালের বন্যা। রঞ্জু ভোলেনি—রঞ্জু ভুলবে না। সেদিনকার আত্রাইয়ের সেই কূলভাঙা ক্ষ্যাপা স্রোতে অবিনাশবাবু হারিয়ে গিয়েছিলেন, হারিয়ে গিয়েছিলেন চিরদিনের মতো। সেদিন বকুলবনের নিচে ঘোলা জল খল খল করে খেলা করে গিয়েছিল, সেদিন কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচে থই থই করা জল ভাসিয়ে নিয়েছিল মরা কাকের ছানাটা, সেদিন কবিরাজের বাগানের

ওপারে বিশ্‌লার মাঠ সমুদ্রের রূপ ধরেছিল—সেই সমুদ্র—যা রঞ্জু স্বপ্নে দেখেছে, যার দুধের মতো জলে সোনার কমল ভোরের রাঙা আলোয় একটার পর একটা ঝলমলে পাপড়ি মেলে দেয়।

কিন্তু সব কিছু স্বপ্ন—সব কিছু ছায়াবাজীর ওপর সেদিন প্রথম রূঢ় বাস্তবের কালো ছায়া পড়েছিল এসে। সে মৃত্যু—রঞ্জুর জীবনে মৃত্যু সম্পর্কে প্রথম অভিজ্ঞতা। যখন শুনেছিল অবিনাশবাবু মারা গেছেন, তখনকার অনুভূতি আজকে আর মনে পড়ে না। হয়তো মনে হয়েছিল রূপকথার রাজপুত্র যেমন করে গজমোতি আনবার জন্যে ক্ষীরের সায়রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, আর রূপবতী রাজকন্যা তার গলায় লক্ষেশ্বরী হার পরিয়ে তাকে বরণ করে নেবার জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকে—বন্যার ঘোলাজলের স্রোতে অবিনাশবাবু তেমনি করেই কোনো সাত রাজার ধন মাণিকের সন্ধানে যাত্রা করেছেন। তখন মৃত্যু কী সে জানত না—জীবন-মরনের মাঝখানে যে অপরিচয়ের কালো অন্ধকার থা-থা করছে—নিরালোক দুর্লক্ষ্য সেই রহস্যময়তা সম্পর্কে এতটুকু ধারণা ছিল না তার।

তারপর সেই সন্ধ্যা। অবিনাশবাবু সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, অথচ তাঁকে দেখা যাচ্ছিল না; তিনি রঞ্জুকে ডেকেছিলেন, অথচ কোনো স্বর ছিল না সে ডাকের। আসন্ন অন্ধকারে আত্রাইয়ের ধারে ধারে পায়ে-চলা পথ দিয়ে সে হেঁটে গিয়েছিল, ছাড়িয়ে গিয়েছিল মশানীর মন্দিরের ভাঙা-চুরো ইটের জাঙ্গাল—যেখানে মশানীর ডাকিনী-যোগিনীরা গোখরো সাপের মতো রুক্ষ কিলবিলে চুলের রাশ শুকিয়ে নেয় নদীর উদ্দাম বাতাসে ; পেরিয়ে গিয়েছিল লাখে লাখে জোনাক-জ্বালা বৈঁচির জঙ্গল, তার পর—

তারপর রঞ্জু প্রথম অনুভব করছিল মৃত্যুকে। টের পেয়েছিল কেমন করে চোখের সামনে পৃথিবীটা সংকীর্ণ হতে হতে ক্রমে একটা আবছা আলোর বিন্দুর মতো মিলিয়ে আসে ; কেমন করে একটা অবশ ঠাণ্ডা অনুভূতি সাপের মতো পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরতে থাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত। একটা অদ্ভুত—অব্যক্ত ভয়ে সমস্ত বোধ-শক্তি অসাড় হয়ে যায়, চিৎকার করে উঠলেও মুখ দিয়ে এতটুকু শব্দ বেরুতে চায় না। আর আচ্ছন্ন হয়ে আসা দৃষ্টির সামনে হাজার হাজার ছায়ামূর্তি যেন ঘুরে ঘুরে নাচে, তাদের অসংখ্য চোখ অজস্র সবুজ আলোর মতো চারদিকে জ্বল জ্বল করে জ্বলতে থাকে, তারা ডাকে, হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে। অবিনাশবাবু যেমন করে তাকে ডেকেছিলেন, সেই নিঃশব্দ স্বরে তারা ডাকে—হু হু করা বাতাসে তাদের সেই ডাক দিক থেকে দিগন্তে ভেসে চলে যায়।

কোথায় ডাকে তারা, কেন ডাকে? সেই কন্যা কেশবতীর দেশে? যাদের ডাক শুনে অবিনাশবাবু বন্যার প্রবল স্রোতে ভেসে চলে গেলেন—সেই সেখানে?

কিন্তু সে তো মৃত্যুর ডাক। অবিনাশবাবু কি মৃত্যু চেয়েছিলেন? না, মৃত্যুর ভেতর দিয়ে আনতে চেয়েছিলেন নতুন জীবনের অঙ্কুরকে? তিনি কি রঞ্জুকে ওই ঘন-কালো অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে যেতে বলেছিলেন, না আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন ওই অন্ধকার ছাড়িয়ে সূর্যোদয়ের দিগন্তে গিয়ে পৌঁছুতে হবে তাকে? বাদুড়ের ডানার আর কালপ্যাঁচার আর্তনাদের শব্দে মুখরিত কালীসন্ধ্যায় তাকে ভাঙা আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিলেন কি শ্মশানের রূপ দেখাবার জন্য, না ওই শ্মশানের ওপর নতুন জীবন প্রতিষ্ঠার জন্যে?

এ প্রশ্নের জবাব সে পেয়েছিল অনেকদিন পরে।

এই সময়ে রঞ্জুর বিয়ে হল।

হাসির কথা নয়—সত্যিই বিয়ে। সাত বছরের ছেলের সঙ্গে ছ বছরের কনের। বিয়েটা জমেছিল ভালো, আয়োজন অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয়নি কোথাও। এমন কি ভূরিভোজনের ব্যবস্থা হয়েছিল পর্যন্ত।

আর শুধু বিয়ে নয়—রীতিমত বিপ্লবাত্মক ব্যাপার। সাত বছরের ছেলে—বাপ মার মত নিলে না, বীরের মতো অসবর্ণ বিবাহ করে ফেলল। কিন্তু আশ্চর্য—সমাজে চাঞ্চল্য ঘটল না, খবরের কাগজে লেখালেখি হল না, বাপ মা বর কনেকে বাড়ি থেকে দিলেন না দূর করে। উল্লেখযোগ্য ঘটনা যেটুকু ঘটেছিল সেটুকু অশ্বিনীর কাঁধ থেকে কনের পতন, সবেগে ক্রন্দন এবং অশ্বিনীর খুড়ো রাইকিশোরবাবুর পথ দিয়ে যেতে যেতে ঘটনাটা দেখে সজোরে অশ্বিনীর কর্ণমর্দন।

—ফেলেই যদি দিবি, তা হলে কাঁধে করতে গেলি কেন হতভাগা?

—অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—ধেড়ে ছেলে অশ্বিনী ভ্যাঁক্ করে কেঁদে ফেলল। ছাত্রমহলে বীর বলে যার অসাধারণ খ্যাতি, 'নিহিলিস্টদের বীরত্ব কাহিনী বর্ণনা করতে করতে যার চোখ দুটো উৎসাহে দপ দপ করে উঠত—এ হেন অশ্বিনী কিনা কাকার চড় খেয়ে কেঁদে ফেলল!

—অ্যাঁ—অ্যাঁ—আমি কী করব! ও যা ছটফট করছিল—

—ছটফট করছিল তো কাঁধে তুললি কী বলে? লেখাপড়ায় একেবারে ধনুর্ধর—অথচ সবটাতে মাতব্বরী করা চাই। গাধা কোথাকার!

সশব্দে অশ্বিনীর গালে আর একটি চপেটাঘাত করে রাইকিশোরবাবু চলে গেলেন। কিন্তু বিপর্যয়ও ঘটিয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গেই। শুভ-বিবাহের শোভা-

যাত্রাটা ভেঙে গেল। অবশ্য সেটা বড় কথা নয়—বৃহৎ ব্যাপারে অমন দু'চারটে অঘটন ঘটেই থাকে।

কিন্তু বিয়েটা হয়েছিল— বেশ ঘটা করেই হয়েছিল।

অবশ্য বিয়ের পেছনে একটুখানি ইতিহাস আছে। দিন কয়েক আগে নাম-করা মহাজন মঞ্জুনাথ কুণ্ডুর মেয়ের বিয়ে দেখেছিল ওরা। মস্ত বড় শোভাযাত্রা হয়েছিল, পিতলের গিল্‌টি করা বিশাল খোলা পাল্‌কীতে গিয়েছিল টোপর পরা বর—চেলির ঘোমটা-টানা কনে। আগে আগে চলেছিল বিরাট বাজনার দল, অভ্রের তৈরী হাজার ডালের ঝাড়-লণ্ঠন আলো করেছিল চারদিক। এত বড় বিয়ে—এমন আয়োজন এদিককার লোক কেউ কখনো দেখেনি। সেই থেকেই প্রেরণাটা এসেছিল অশ্বিনীর মাথায়। কোত্থেকে চুরি করে আনা একখানা মস্ত পাটালী গুড় চাটতে চাটতে অশ্বিনী বলে বসল, এই, বিয়ে দিতে হবে।

সমস্বরে প্রশ্ন হল: কার?

তাই তো। অশ্বিনী সেটা ভাবেনি। অসহায়ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে অশ্বিনীর চোখ পড়ল রঞ্জুর দিকে, সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহভরে লাফিয়ে উঠল সে। হাত থেকে পাটালী গুড়খানা পর্যন্ত পড়ে গেল তার।

—রঞ্জুর।

—আমার?

—হ্যাঁ, তোর। তোরই চমৎকার হবে।

রঞ্জু রাজী হয়ে গেল। বিয়ে করতে হবে—এতে আর আপত্তিটা কোথায়। বেশ উৎসাহজনক প্রস্তাব।

—কিন্তু আমাকে পাল্‌কী করে নিয়ে যাবে তো?

—নিশ্চয়।

—আলো জ্বলবে—বাজনা বাজবে?

—আলবাৎ।

—মাথায় টোপর দেবে তো?

—ঠিক দেব।

ব্যাস, সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। অশ্বিনী তখনি বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলেছিল, কিন্তু আর একটা মুস্কিল দেখা দিল। একজন জিজ্ঞাসা করে বসল, তবে বউ কই?

—এই তো—এ কথাটাও তো এতক্ষণ মনে হয়নি! নাঃ, নিশ্চিন্তে

পাটালী-গুড় চাটা, আর অশ্বিনীর কপালে নেই দেখা যাচ্ছে। অশ্বিনী বললে, ঠিক—বউ কই ?

রঞ্জু বললে, বউ না থাকলে আমি বিয়ে করব না।

—তাই তো, বিপদে পড়া গেল !—অশ্বিনী মাথা চুলকোতে লাগল। কিন্তু যাদের জীবনে রূপকথার সঙ্গে বাস্তবের ব্যবধান অত্যন্ত সংকীর্ণ—রূপকথার মতোই অতি সহজে তারা যা কিছু সংকট অতিক্রম করে চলে যায়। অতএব ঘটনাস্থলে কনের আবির্ভাব হল।

কনের খালি গা—ছোট একটি ইজের পরণে। একহাতে একটি সেলুলয়েডের পুতুল—অন্যমনস্কভাবে মাঝে মাঝে সেটি চর্বণ করায় তার নাকমুখগুলো সব চ্যাপ্টা মেরে গেছে। আর একহাতের আঙুলে একটুখানি আচার, কনে সেটা একটু একটু করে খাচ্ছিল—আর মুখ চোখাচ্ছিল উস্ উস্ শব্দে।

—বাঃ, বাঃ—ঠিক হয়েছে। এই তো বউ।—অশ্বিনীই একাধারে বরকর্তা আর কন্যাকর্তা। মেয়েটার হাতের আচারের দিকে একটা লোলুপ দৃষ্টি ফেলে অশ্বিনী বললে, এই উষি, বউ হবে ?

উষি অর্থাৎ উষা অশ্বিনীর দৃষ্টি লক্ষ্য করে ততক্ষণে পেছনে লুকিয়ে ফেলেছে আচারশুদ্ধ হাতটা। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, আমার আচার খেয়ে নেবে নাতো ?

—না, কক্ষণো না। খানিকটা লালা গিলে নিয়ে অশ্বিনী বললে, বয়েই গেল তোর আচার খেতে। আমার কত বড় পাটালী রয়েছে দেখছিস না ? বউ হবি ?

—হব। কিন্তু একটুখানি পাটালী দেবে তো আমাকে ?

শেষ কথাটায় কান দিলে না অশ্বিনী। ও সব কথা অশ্বিনী শুনতে পায় না, অন্তত সব দিক থেকে না শোনাটাই নিরাপদ। বললে, বউ হলে তোকে কাঁধে করব।

—আগে একটু পাটালী দাও তবে ?

—আঃ—পাটালী পাটালী করছিস কেন ? আগে বউ হয়েই ছাখ না—তার পর—

তারপর কনে আর বিশেষ আপত্তি করলে না। পাটালীর প্রতিশ্রুতি তো আছেই, তা ছাড়া কাঁধে চড়বার ব্যাপারটাও একেবারে কম প্রলোভনের জিনিস নয়। সুতরাং শুভ-বিবাহটা হয়েই গেল।

অশ্বিনীর মৌলিকতা আছে। বললে, বিয়ের ছাত্নাতলা চাই। নইলে বিয়েই হয় না যে।

ছাত্‌নাতলা! ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কিন্তু বর কনে যখন জোগাড় হয়ে গেছে, তখন ছাত্‌নাতলার ব্যবস্থা হতেও দেরী হল না।

সত্যিই আদর্শ ছাত্‌নাতলা। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার পাশ থেকে কে যেন কবে মাটি কেটে নিয়ে গিয়েছিল, একটা মস্ত গর্ত সেখানে হা হা করছে। বর্ষার সময় জল জমে সেটাতে, মাসছয়েক ছোটখাটো একটা ডোবার মতো হয়ে থাকে গর্তটা। তারপর জলকাদা শুকিয়ে গেলে ভিজে-ভিজে নরম মাটির ওপর এলোমেলো আগাছার সঙ্গে গজায় কচুর বন। তাজা পরিপুষ্ট কচু—কালচে বেগুনীরঙের ডাঁটার ওপরে প্রসারিত নধর পাতাগুলি বুকে শিশিরের মুক্তো খেলা করে বেড়ায়, তার তলায় বাড়তে থাকে কট্‌কটে ব্যাং আর কেঁচোর সংসার। মাঝে মাঝে ঘুঁটে-কুড়ুনিরা শাক খাওয়ার জন্যে দুটো চারটে কচুর ডাঁটা কেটে নিয়ে যায়, কিন্তু নিবিড় ঘনবিন্যস্ত কচুর জঙ্গল তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

অশ্বিনী বললে, ওই কচুর বনেই ছাত্‌নাতলা হবে।

হলও। চারদিকে কচুগাছ ভেঙে মাঝখানে একটুখানি জায়গা করা হল। বর কনে দাঁড়াল মুখোমুখি।

পৌরোহিত্যটাও করলে অশ্বিনীই। রঞ্জুর হাতে তুলে দিলে কনের আচার ও লালাসিক্ত হাতখানা। বললে, এইবার মন্তর পড়্‌।

—মন্তর!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ মন্তর! নইলে বিয়ে হবে কী করে! আমি যা বলছি তাই বলে যা।

একজন আইনঘটিত প্রশ্ন তুললে, কিন্তু তুমি তো বামুন নও।

—আরে ধ্যাৎ—রেখে দে বামুন—অবজ্ঞাব্যঞ্জক একটা মুখবিকৃতি করলে অশ্বিনী: কেউ একজন পড়ালেই হল। আচ্ছা বল্‌ রঞ্জু—ওং বিবাহং নমঃ—

—ওং বিবাহং নম—

—ওং উষিং নম—

এতক্ষণে রঞ্জু প্রতিবাদ করলে। বললে, দূর, তা বলব কেন? বউকে বুঝি কেউ পেন্নাম করে?

—থাম্‌না, তুই ভারী তো বুঝিস!—যেন সব বোঝে এমন সবজান্তার মতো দরাজ গলায় অশ্বিনী বললে, যা বলছি তাই চুপটি করে আউড়ে যা—বুঝলি? বল্‌ উষিং নম—

অগত্যা বলতে হল। বিয়ে করতে বসে পুরুতের আদেশ অবহেলা করা যায়

না। সুতরাং অশ্বিনীর নির্দেশে যথাযথ মন্ত্রপাঠ চলল কিছুক্ষণ। কিন্তু কচুর রসে সর্বাঙ্গ চিড়বিড় করে জ্বলতে সুরু করেছে। রঞ্জু বললে, আর নয় ভাই, গা জ্বলছে ভয়ঙ্কর।

অশ্বিনী একটা উঁচু দরের হাসি হাসল।

—আরে, বিয়ে করতে গেলে অমন এক আধটু গা জ্বালা করেই। জ্বলুনির এখনি কী হয়েছে!

আজ বড় হয়ে বিস্মিত রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ভাবে—অশ্বিনীর কণ্ঠে দৈববাণী আশ্রয় করেছিল নাকি সেদিন! নইলে অমন একটা নিদারুণ প্রত্যক্ষ সত্য সেদিন অমন অবলীলাক্রমে অশ্বিনী উচ্চারণ করেছিল কী করে!

বিয়ে মিটল, তারপরে শোভাযাত্রা।

দু তিনজন ছেলে মিলে রঞ্জুকে চ্যাং দোলা করে নিয়েছে, আর অশ্বিনী উষিকে তুলেছে কাঁধের উপরে। সগৌরবে শোভাযাত্রা চলেছে। একজন মুখে মুখে ঢোলের বোল্ বাজাচ্ছে: টাক ডুম্ টাক ডুম টাক ডুম্ ডুমাডুম্। আর একজন একটা আমের আঁটির ভেঁপুতে প্যাঁ-প্যাঁ-প্যাঁ-প্যাঁ করে সানাইয়ের আওয়াজ তুলছে! ঝাড়লণ্ঠন নেই, তার অভাব পূরণ করতে একজন আগে আগে নিয়ে চলেছে একটা পাকুড় গাছের ঝাঁকড়া ডাল। দৃশ্যটি একাধারে মনোরম এবং রোমাঞ্চকর!

এমন সময় বাগড়া দিলে নববধূ। কাঁধের ওপর সে উস্‌খুস্ করতে লাগল: আমার গুড় কই, গুড়?

অশ্বিনী অস্থির হয়ে বললে, দাঁড়া না, দাঁড়া। আগে বিয়েটা হয়ে যাক, তারপরে তো? জানিসনে, বিয়ের দিনে বরকনেকে কিছু খেতে নেই?

কিন্তু উষা ভোলবার পাত্রী নয়।

—না, গুড় দাও আমাকে, পাটালী গুড়—

—আঃ, খেলে যা!—অশ্বিনী আরো বিব্রত হয়ে উঠল: কোথাকার কনে রে এটা! খালি খাই খাই। বলছি বিয়েটা মিটে গেলেই দেব এখন—

—নাঃ এখুনি দিতে হবে—

অশ্বিনীর ধৈর্য অসীম নয়। তা ছাড়া পাটালী গুড়ের প্রশ্নটা একেবারে তার মর্মস্থলে আঘাত করছিল। আশা ছিল বিয়ের নানা আয়োজন-আড়ম্বরের ভেতরে পাটালীর কথাটা উষা বেমালুম ভুলে যাবে, কিন্তু তার স্মৃতিশক্তির ওপরে অবিচার করেছিল সে। কাঁধের ওপর অস্থিরভাবে দুলতে দুলতে উষা তালে তালে বলতে লাগল: গুড় দাও—গুড় দাও—গুড় দাও—

—গুড দাও—গুড দাও। এইবারে অশ্বিনী খেঁকিয়ে উঠল: ফের যদি ওরকম চ্যাঁচাবি তো একটা থাপ্পড় কষিয়ে একেবারে ড্রেনের ভেতরে ফেলে দেব।

এইবারে উষি বিদ্রোহ করে উঠল। অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ। মিথ্যে কথা বলে বিয়ে দিলে, এখন দেবে থাবড়া। নামিয়ে দাও—নামিয়ে দাও আমাকে। উষার ধারালো নোখের আঁচড়ে অশ্বিনীর গালের কপালের এক পর্দা চামড়া উঠে গেল। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল অশ্বিনী।

পরে যা ঘটল সেটুকু বিয়োগান্তক। অশ্বিনী ইচ্ছে করেই ছেড়ে দিয়েছিল কিনা কে জানে, তার কাঁধের ওপর থেকে একটা পাকা কাঁঠালের মতো ধপাৎ করে মাটিতে পড়ে গেল উষা। তারপরের কাহিনীটা আগেই বলে নেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে রাইকিশোরবাবুর প্রবেশ, অশ্বিনীকে কর্ণমর্দন এবং চপেটাঘাত, অতঃপর যবনিকা-পতন।

সজল অগ্নিময় চোখে অশ্বিনী আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাইকিশোরবাবু ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছেন, উষা কাঁদতে কাঁদতে ছুটেছে নিজেদের বাড়ির দিকে। শোভাযাত্রীর দল শবযাত্রীদের মতো শোকে এবং বেদনায় মুহ্যমান। ঢোল বাজছে না, শানাইয়ের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে। পাকুড় গাছের ঝাড়লণ্ঠন অনাদৃত এবং অবজ্ঞাত হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সবাই বিমূঢ় আর বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, কারো মুখ দিয়ে একটা কথা ফুটছে না।

তারপর প্রথম কথা বললে অশ্বিনীই। বললে, শালা।

একজন জিজ্ঞাসা করলে কে?

এতক্ষণ নিস্তব্ধ থাকবার পরে ক্ষিপ্ত ধূর্জটির মতো অশ্বিনী হঠাৎ নেচে উঠল। ভৈরব গর্জনে বললে, কাকা শালা। উষি শালা। তোরা সবাই শালা—

তারপরে দ্রুতবেগে প্রস্থান করলে সে।

আজ অশ্বিনীর কথা মনে পড়লে সহানুভূতি জাগে রঞ্জুর। সত্যিই সেদিন তার ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ ছিল। নিঃস্বার্থভাবে যারা পরের উপকার করবার মহৎ সংকল্প করে, ওই চপেটা-বর্ষণ এবং কর্ণ-তাড়নই তাদের চিরকালের পুরস্কার। বিয়ে হল রঞ্জু আর উষির—তাতে অশ্বিনীর কী লাভ? নিজে এত পরিশ্রম করে উদ্যোগ আয়োজন করলে, এতখানি পথ কাঁধে করে কনেকে টেনে নিয়ে বেড়াল, তার বিনিময়ে সে পেল এই! পৃথিবীটা এমনি অকৃতজ্ঞই বটে। অশ্বিনীর উত্তেজনার অর্থ রঞ্জু বুঝতে পারে।

আর সেই কনে—সেই উষা?

তার স্মৃতি রঞ্জুর মন থেকে প্রায় মুছে গেছে—মুছে গেছে শ্লেটের লেখার মতো। তার জীবনের প্রথম নায়িকার ছবিটা অলস-কল্পনাকে স্বপ্নময় করে তোলবার মতো নয়। একটুখানি ছোট্ট মেয়ে—ময়লা রং, পরণে ইজের, খালি গা, হাতে নাসিকামুখবিবর্জিত একটা সেলুলয়েডের পুতুল, আঙুলে আচারের লালাসিক্ত অবশেষ। সেদিনকার সেই রূপকথার রূপালি রং মেশানো আকাশে বাতাসে নদীর জলে যে নায়িকা রঞ্জুর জীবনে নেমে আসতে পারত—ভরা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মতো তার বর্ণ, চৈতালি আকাশে ঘনিয়ে-আসা নিবিড় নীল মেঘের মতো তার চুল, সূর্য ডুবে-আসা পশ্চিম আকাশের ময়ূরকণ্ঠী-রঙা তার শাড়ীর আঁচল, সূর্যোদয়ের মতো তার কপালে সিঁদুরের টীপ ; তার গলার মণিমালায় চুনি-পান্নার দীপ্তি, তার হাতে বিদ্যুতের কনক-কঙ্কন, তার স্থল-পদ্মের মতো দুটি রাঙা-পায়ে হীরা বসানো রতনচক্র। ফড়িংয়ের পাখায় ভর দিয়ে নেমে আসতে পারত তার নায়িকা, তাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারত হালকা হাল্‌কা মেঘের জগৎ ছাড়িয়ে, আকাশ-গঙ্গা পেরিয়ে সাত ভাই চম্পার নিদ্মহলের পাশ দিয়ে—কোথায় কত দূরে—অত কি ভাবতে পারে রঞ্জু ?

কিন্তু সে এল না—দেখা দিলে না আকাশচারিণী পরীর দেশের রাজকন্যা। তার জায়গায় এল পৃথিবীর মেয়ে—মাটির মেয়ে ! সে উন্মনা কল্পনার স্বপ্ন-কমল নয়, মাটিতে ফোটা ছোট একটি ভুঁই চাঁপা। কিন্তু আকাশচারী মন যার মাটির দিকে তাকাতে জানেনা, শূন্যের সন্ধানে যার মন সত্যসীমা ছাড়িয়ে উড়ে চলেছে, পৃথিবীতে অনেক ঘাসের ফুল, অনেক ভুঁইচাঁপাকেই সে পায়ের নিচে দলে চলে যায়। আজ তেমনি করেই কল্প-জগতের ছায়া সঙ্গিনীরা উর্মিকে দৃষ্টির নিভৃত আড়ালে, স্মৃতির আড়ালে সরিয়ে নিয়ে গেছে রঞ্জুর। ভালোই হয়েছে—ছেলেবেলায় অমন করে স্বপ্ন গড়ে উঠেছিল বলেই তো এত তাড়াতাড়ি ঘটেছে মোহমোচন। কাচের রঙিন চশমাটা ভেঙে টুকরো হয়ে যেতে দেরী হল না। তবু কোথায়, কোন্ মাটিতে সেই ছোট কুঁড়িটি আজ তার মধুকোষ মেলে দিয়েছে—নতুন করে তাই ভাবতে ইচ্ছে করে। তার গান্ধর্ব বিবাহের সেই প্রথম নায়িকা কার ঘর করছে আজ ?

কার ঘর ? ভাবতে ইচ্ছে করে, কল্পনা করতে ভালো লাগে। একটি সাধারণ গৃহস্থের বাড়ি। মাটির দেওয়াল, মাটির দাওয়া, দেওয়ালের গায়ে বসুধারা আঁকা, আঁকা পদ্মলতা। এক পাশে লক্ষ্মীশ্রীলাগা ধানের পালা সাজানো, উঠোনে ঢেঁকি। আর একদিকে একটি ছোট মাচায় সীমের লতায় অজস্র ফলন হয়েছে—ঝিঙে ফুলে সোনার রেণু ছিটোনো। গোয়ালে টসটসে

দুধে বাঁটভরা শ্যামলী ধবলী। হেনার ঝাড়ের মধ্য দিয়ে একটি ফালি পথ আম জামের ছায়ায় ঢাকা খিড়কীর পুকুরে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেই ঘরের ঘরণী হয়েছে উষা। ছেলে-পুলের মা হয়েছে—স্বামী সোহাগিনী হয়েছে—সংসারের চারদিক উথলে উথলে পড়ছে যেন।

আর রঞ্জু? সেই গান্ধর্ব-বিবাহ যদি উষার জীবনে সত্যি হয়ে উঠত, তাহলে কী হত আজকে?

কিন্তু পরের কথা আগে বলে লাভ নেই।

অতীতের দিকে তাকিয়ে রঞ্জনের মনে হয়—তার জীবনে দুটো দিক কী আশ্চর্যভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিল সেই শৈশব-বয়সে, চেতনার সেই প্রথম উন্মেষ পর্বে। অবিনাশবাবুর আর উষা। আগামী আকাশের প্রথম অরুণোদয়। পৃথিবীর দাবীর সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয় তার!

—পাঁচ—

সত্যিই স্মৃতির পাতার হিসেবটা এলোমেলো। কত বড় বড় ঘটনা, কত বিস্ময়কর ব্যাপার সে অবলীলাক্রমে জলের লেখার মতো মুছে ফেলে—সাধারণ চোখে যাকে পৃথিবীর একটা অসাধারণ অঘটন বলে মনে হয়, তার কাছে তার এতটুকু দাম থাকে না হয়তো। একটা অতি তুচ্ছ মুহূর্ত, রাশীকৃত ঘটনার আকার অবয়বহীন কালো পটভূমির ওপরে শীতল কঠিন একটি নক্ষত্রের মতো দীপ্তি পায়।

রঞ্জুর মনে পড়ে পদ্মার ভাঙনের একটা দৃশ্য দেখেছিল একবার। রাক্ষসী নদী পদ্মা—রাক্ষসীর মতো তার ক্ষুধা। তার কুটিল হিংসার অশ্রান্ত আঘাতে মুহূর্তে গ্রাস করে নেয় নগর, অরণ্য, জনপদ। লক্ষ কোটি কীর্তিকে বিনাশ করেই কীর্তিনাশার আনন্দ।

সেই ভাঙনের আনন্দে মেতে ওঠা নদীর একটা বিচিত্র খেয়াল চোখে পড়েছিল তার। ভরা বর্ষায় মাতাল নদী তার মাতলামি সুরু করেছে, পাক-খাওয়া ঘোলা জলের আঘাতে এদিকের প্রায় আধখানা পাড়ি নেমে গেছে নদীর অতল গর্ভে। অথচ কী আশ্চর্য—প্রায় নদীর মাঝামাঝি জায়গায় যেন কী একটা অদ্ভুত মন্ত্রবলে একফালি ডাঙা ছোট্ট একটা গোলাকার দ্বীপের মতো মাথা তুলে রয়েছে। চারদিক থেকে নদী ভেঙে নিয়েছে, ওই দ্বীপখণ্ডটুকুকে

ঘিরে ঘিরে ক্ষ্যাপা জল নেচে বেড়াচ্ছে ফেনায়িত উদ্বেল আনন্দে—অথচ একটু-খানি সবুজ মাটির বুকে তিন চারটি কলাগাছ আর একখানা মেটে ঘর আছে অবিচলিত গৌরবে দাঁড়িয়ে। পদ্মার অকারণ খুশির খেয়াল।

মনের মধ্যে সেই খেয়ালী প্রখর পদ্মার স্রোত বইছে অবিরাম ছন্দে। ভাঙছে উঁচু পাড়ি, ঝরে পড়ছে, গলে যাচ্ছে, ঢেউ জাগিয়ে, একরাশ বুদ্বুদের দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে নিশ্চিহ্নতায়। কিন্তু একটি আশ্চর্য মুহূর্ত, একটি অতি তুচ্ছ ঘটনা, সেই প্রবল ভয়ঙ্কর কীর্তিনাশা স্রোতকে উপেক্ষা করে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। আজ রঞ্জুর মনে হয়, জীবনের বাঁধা উঁচু ডাঙাগুলোর চাইতে স্মৃতির ওই দ্বীপখণ্ড সমষ্টির মধ্যে কোথায় যেন অনেক বড় সত্য, অনেক গভীর কোনো তাৎপর্য নিহিত রয়ে গেছে।

এমনি একটা ব্যাপার।

ইস্কুলের কথা মনে পড়ে। পাড়াগাঁয়ের এম-ই স্কুল—প্রাগৈতিহাসিক যুগের রীতিনীতিতে শিক্ষাদীক্ষার বন্দোবস্ত। সাড়ে সাত থেকে সাড়ে বত্রিশ টাকা পর্যন্ত শিক্ষকদের বেতনের পরিধি! তাই মাইনে আদায় করতে না পারলে তাঁরা ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি কলাটা মূলোটা যা পারেন সংগ্রহ করেন। তাতেও যখন পেট ভরে না, তখন বঞ্চিত জীবন সম্পর্কে তাঁদের যা কিছু অভিযোগ এবং বিদ্বেষ, তার পুরোপুরি শোধ তোলবার চেষ্টা করে থাকেন ততোধিক দুর্ভাগ্য ছাত্রদের ওপর দিয়ে!

"না ঠ্যাঙালে ছেলে বয়ে যাবে"—এই মহান মূলমন্ত্রটি কোন্ ইংরেজ শিক্ষক কবে আবিষ্কার করে অমরত্ব লাভ করেছেন কে জানে। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করবার সদুপদেশ দিয়ে গেছেন ভারতীয় মনীষীরা। নাজীপুর এম-ই ইস্কুলের মাস্টার মশাইদের কাছে সুবল মিত্রের বাংলা অভিধান আর অক্সফোর্ডের ইংরেজী ডিক্সনারীর মতো এই মন্ত্র দুটিও অবিস্মরণীয় এবং অঙ্গাঙ্গী।

পাঠশালার পণ্ডিতদের ঐতিহ্য তাঁরা অখণ্ড বিশ্বাসে ইস্কুলেও বজায় রেখে-ছিলেন। দু-খানা থান ইঁট হাতে করিয়ে ঠাটা-পড়া রোদ্দুরে সাত আট বছরের ছেলেদের দিয়ে সূর্য-সাধনা করানো, গাধার টুপি মাথায় চড়িয়ে এক পায়ে দাঁড়ো করিয়ে রাখা, পরস্পরের কান ধরিয়ে শোভাযাত্রা করানো, দু-আঙুলের ফাঁকে পেন্‌সিল পুরে দিয়ে চাপ দেওয়া, বিছুটির চাবুক মারা, হাফ-ডাউন করানো এবং তৈলপক্ক জোড়া বেতের ঘায়ে হাত ফাটিয়ে একেবারে রক্তারক্তি করে দেওয়া—এ তাঁদের নিত্য কর্মপদ্ধতি ছিল।

রঞ্জুর মনে আছে কতগুলি বাঁধা-ধরা ছেলের বরাতেই এ শাস্তিগুলো বিশেষ

ভাবে মুলতুবি ছিল। তাদের মধ্যে বেশির ভাগেরই ময়লা ছেঁড়া কাপড়, ঘোলা ঘষা কাচের মতো চোখ, রুক্ষ লালচে ধুলোভরা চুল, ছেঁড়া বই আর ছেঁড়া খাতা তাদের সম্বল। তারা পড়া পারত না, বছর বছর একই ক্লাসে তারা ফেল করত, তারপর একদিন মা সরস্বতীর গঙ্গাজলী করে কেউবা গঞ্জের হাটে বসত তামাক কিংবা মরিচ নিয়ে, কেউবা সোজাসুজি ক্ষেতে নামত হালবলদ নিয়ে চাষ-বাস করতে। তারা গরীবের ছেলে, চাষার ছেলে।

তারা পড়া পারত না। আজ রঞ্জু জানে, কেন তারা পড়তে পারত না, কেন বছর বছর একই ক্লাসে ফেল করে বসত অমন ভাবে। যখন পেটের ভাত জোগাড় করবার জন্যে তাদের ক্ষেতে ক্ষেতে তামাক আর মরিচ তুলতে হত, কিংবা চাষা বাপের নাস্তা দিয়ে আসবার জন্যে ছুটতে হত মাঠে—তখন পড়া-শুনোর বিলাসিতাকে তার চাইতে বেশি প্রয়োজন বলে তারা মনে করতে পারত না। তবুও গরীব বাপ আধপেটা খেয়ে, চেয়ে চিন্তে তাদের ইস্কুলের মাইনে জুগিয়ে যেতো বছরের পর বছর। লেখাপড়া শিখবে ছেলে, মানুষ হবে, হাকিম অথবা দারোগা হবে, নিবারণ করবে গরীব বাপমায়ের পেটের জ্বালা।

কিন্তু আকাশ-স্বপ্ন চিরকাল আকাশেই থাকে, মাটিতে নেমে আসে না কখনো। তাদের ক্ষেত্রেও এই চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটোনি কোনোদিন।

আর, ছেলেগুলো ঠ্যাঙানি খেত। শুধু ঠ্যাঙানি নয়, যাকে গো-বেড়েন বলে, তাই ছিল তাদের দৈনন্দিন প্রাপ্তি। এখন রঞ্জু বুঝতে পারে কী কারণে ইস্কুলের মাস্টারেরা তাকে এত সমাদর করতেন, হেডমাস্টার আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলতেন প্রাইজের বই বেছে নিতে। আর ধেড়ে ছেলে মশিনী হাজার অপরাধ করলেও কেন দু চারটে কানমলার ওপর দিয়েই সমস্ত অপরাধ থেকে নিষ্কৃতি পেতো।

দুর্ভাগাদের মধ্যে যে সব চেয়ে দুর্ভাগা ছিল তার নাম নিশিকান্ত। অদ্ভুত রকমের নিবোধ ছিল নিশিকান্তের চেহারা। গোরুর মত বড় বড় চোখ দুটোয় না ছিল ভাষা, না ছিল সুখ-দুঃখ বোধের বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত। পড়া জিজ্ঞাসা করলে অনিচ্ছুকভাবে উঠে দাঁড়াত, মনে হত শরীর নয়, যেন গুরুভার একটা কিছুকে সে ওপরে টেনে তুলছে। তারপর স্থির, নিরাসক্ত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকত।

পড়ার জবাব? হ্যাঁ—জবাব একটা দিতো নিশ্চয়ই। কিন্তু সে জবাব কেউ শুনতে পেতো না। মনে হত যেন বিড় বিড় করে সাপের মন্ত্র পড়ছে—ঠোঁট দুটো অল্প নড়তে থাকত সেই ভাবে। আর হালটানা বলদের মতো

বড় বড় শান্ত চোখ মেলে তাকিয়ে থাকত—দৃষ্টিতে পলক পড়ত না ; যেন সমাধিস্থ হয়ে গেছে, তার দৃষ্টি বাইরের জগৎ ছাড়িয়ে অন্তরের গভীরে কী একটা পরমার্থের সন্ধান করে ফিরছে যেন।

তারপরেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। গাধার টুপি, নীল ডাউন, বেত, বিছুটি, কানমলা। একটু প্রতিবাদ করত না নিশিকান্ত, কেঁদে ককিয়ে উঠত না, সমাধিস্থ যোগী ঋষির মতো হজম করে যেত নির্বিকল্প মুখে। মার খাওয়া তার প্রতিদিনের নিশ্বাস প্রশ্বাসের মতোই সহজ হয়ে গিয়েছিল।

আর রাগটা ছিল ধনঞ্জয় পণ্ডিতেরই সব চাইতে বেশি।

কোল্‌কুঁজো তামাটে রঙের লোক—প্রকাণ্ড একখানা মুখ থেকে শূয়োরের দাঁতের মতো পানেরঙানো দুটো গজদন্ত বেরিয়ে থাকত। কপালে বিরাজ করত চন্দনের ফোঁটা, টিকিতে বিজয়-পতাকার মতো শোভা পেতো টকটকে রাঙা একটা জবাফুল। একটা মোটা তেল-চিটচিটে ছাল্‌টি কাপড় আর ময়লা নিমা গায়ে চড়িয়ে খড়ম পায়ে তিনি ইস্কুলে আসতেন, বারান্দায় তাঁর খড়মের শব্দ ক্লাসে যেন মৃত্যুদূতের পরোয়ানা বহন করে আনত।

পড়াতেন ব্যাকরণ, কিন্তু তদ্ধিত-প্রকরণের চাইতে প্রহার-প্রকরণেই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যটা ছিল বেশি। তিনি বিশ্বাস করতেন শুধু পেটালেই গাধাকে ঘোড়া তৈরী করা যায়, পড়ানোটা অবান্তর। এ হেন সর্বংসহ নিশিকান্তও ধনঞ্জয় পণ্ডিতের ক্লাসে স্পষ্ট অস্বস্তি বোধ করত একটা।

মুখ ভেংচে ধনঞ্জয় বলতেন, বাছার আমার নাম কী? না—নিশিকান্ত একেবারে প্রাণকান্ত !

রসিকতার তাৎপর্যটা ছেলেরা ধরতে পারত না, নিশিকান্ত তো নয়ই। পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য-রসবোধ আরো উগ্র হয়ে উঠত, গজদন্তদুটোকে মাড়ি অবধি উদ্ঘাটিত করে দিয়ে ধনঞ্জয় বিকট বীভৎস মুখে ছড়া কাটতেন :

নিশিকান্ত, প্রাণকান্ত,

পরাণ আমার করহ শান্ত !—নামের তো বাহার আছে দুরন্ত, কিন্তু পড়া জিজ্ঞেস করলেই বেরিয়ে যায় আক্কেলদন্ত ! আর আমি ভাবছি, কবে তোমায় নেবে কৃতান্ত !

ধনঞ্জয় পণ্ডিত নাকি জারিগানের ছড়া রচনা করতেন।

কিন্তু এমন অনুপ্রাস-সমৃদ্ধ কাব্যচর্চাও যখন অরসিকদের কাছে মাঠে মারা পড়ত, তখন একেবারে ক্ষেপে যেতেন ধনঞ্জয় পণ্ডিত। বলতেন, বল্ হারামজাদা, বল্ নিশিকান্ত মানে কী ?

একমণী পাথরের মতো শরীরটাকে টেনে তুলে নির্ভুল নিয়মে দাঁড়িয়ে যেতো নিশিকান্ত। তারপরে তেম্নি চিরাচরিত মন্ত্রপাঠ, আর চিরন্তন নির্বিকল্প সমাধির ব্যাপার।

—ওরে, ছু চোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চোদ্দসিকে! নিস্-শি-খান্ত-!—ধনঞ্জয় পণ্ডিতের গজদন্তদুটো যেন কামড়াবার জন্যে তেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইত: কান্ত না তোর বাপ-বাপান্ত! ওরে হারামজাদা, তুই নিশিকান্ত নোস্, একেবারে নিশি, বুঝলি অমাবস্যার নিশি!

নিশিকান্ত মন্ত্রপাঠ করে যেত। যেন এ কথাটাতেও তার কিছু বক্তব্য আছে এবং স্মৃতির অতল সাগর মন্থন করে সেই বক্তব্যটাকে সে উদ্ধার করবার চেষ্টা করছে।

এইবার প্রহারের জন্যে তৈরী হতেন ধনঞ্জয় পণ্ডিত। হাতের মধ্যে আঁকড়ে ধরতেন তেল-পাকানো বাদামী রঙের লিক্‌লিকে বেতজোড়া। তারপর মেঘমন্দ্র স্বরে বলতেন, হুঁ। বল্, পীতাম্বর কোন্ সমাস?

যথাপূর্বং যথাপরম্। বজ্রগর্ভ মেঘের মতন ধনঞ্জয় পণ্ডিত আধভাঙা চেয়ারটাকে ঠেলে উঠে দাঁড়াতেন। টিকিতে জবাফুলটা দুলে উঠত, দুটো ক্ষুদে ক্ষুদে চোখে দেখা দিত অমানুষিক হিংসা। গজদন্তে আর ঠোঁটের পাশে পানের রঙ যেন রক্ত বলে সন্দেহ হত।

তারপর প্রহার। সাঁই সাঁই করে বেতের শব্দ উঠত, নিশিকান্তের হাতে পিঠে ঘাড়ে নির্মমভাবে বেত পড়ত। উন্মাদের মতো মারতেন ধনঞ্জয় পণ্ডিত—মনে হত সম্ভব হলে একদিন নিশিকান্তকে তিনি খুন করে ফেলবেন। রঞ্জু কখনো কাউকে নরহত্যা করতে দেখেনি, কিন্তু নরঘাতকের মুখের ভঙ্গিও যে ধনঞ্জয়ের চাইতে বীভৎস হয়ে ওঠে না, এ কথা সে নিশ্চিতভাবেই বলতে পারে।

কেন অমন করে মারতেন ধনঞ্জয় পণ্ডিত? আজকে তার উত্তর পাওয়া কঠিন নয়। জীবনের যা কিছু বঞ্চনার বিরুদ্ধে, সমাজের কাছে, মানুষের কাছে, আর হয়তো ঈশ্বরের কাছেও এ ধনঞ্জয় পণ্ডিতের প্রতিবাদ। প্রতীকার-বিহীন নিরুপায়তায় আরো বেশি নিরুপায়ের ওপরে প্রতিশোধ নেওয়া—দুঃখ-দুর্গত জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস। ধনঞ্জয় পণ্ডিতের অপরাধ ছিল না। আর তাই পরিচয় পেয়েছিল রঞ্জু—দু বছর বাদে তাঁর মৃত্যুর পরে, যখন তাঁর স্ত্রী মহাজন যজ্ঞনাথ কুণ্ডুর বাড়িতে রাঁধুনির চাকরী নিয়েছিলেন!

নিশিকান্তকে মারতে মারতে শেষে ধনঞ্জয় ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। খোলা

কাছাটা গুঁজতে গুঁজতে আবার ফিরে আসতেন তাঁর তেপায়া চেয়ারটায়, হাঁপাতে হাঁপাতে বলতেন, তোকে মারা যা—একটা গোরুকে ঠ্যাঙানোও তাই। কোনো লাভ হবে না, অকারণ খানিকটা পরিশ্রম মাত্র।

সার সত্যটা বুঝেছিলেন ধনঞ্জয়—কিন্তু মনে রাখতে পারতেন না।

নির্বোধ, নির্বিকল্প নিশিকান্ত। কিন্তু তারও সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল একদিন। পাথরের ভেতর থেকে একটুখানি ফুল্‌কি ছিটকে বেরুল অকস্মাৎ। অগ্নিকাণ্ড ঘটল না—পাথরই গুঁড়ো হয়ে গেল।

পাড়াগাঁয়ের এম-ই ইস্কুল। দরজা জানালাগুলোর কব্জা-ভাঙা পাল্লা আছে বটে, কিন্তু প্রতিরোধের শক্তি নেই তাদের। একটু জোরে বাতাস বইলে পাল্লা খুলে যায়—ছাগল ঢুকে রাত্রিবাস করে, গোরু এসে রোমন্থন করে যায়। গোরুর মতো বুদ্ধি নিশিকান্তের, গোরুর পথই সে নিলে।

পরদিন ইস্কুলে একেবারে হুলুস্থুলু কাণ্ড!

দেওয়ালে দেওয়ালে চক-খড়ি দিয়ে কাঁচা কাঁচা অক্ষরে শিলালিপি: 'পণ্ডিতকে মারিব', 'পণ্ডিত আমার শা—', 'পণ্ডিত মরিলে হরির লুট দিব'—ইত্যাদি। সমস্ত ইস্কুল একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

'নিখিলিস্ট'দের বোমার মতো ফেটে পড়লেন হেড্‌মাস্টার বিপিনবিহারী সাহা। সন্দেহজনক ছেলেদের ধরে ধরে বোর্ডে কথাগুলো লেখানো হতে লাগল। এবং হস্তলিপি পরীক্ষার ফলাফলও আশাতীত কিছু হলনা, ধনঞ্জয় পণ্ডিত ক্ষ্যাপা শূয়োরের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে রায় দিলেন: এ ওই হারামজাদা নিশিকান্তের কাজ!

অনেকটা তাঁর কথাতেই কিনা কে জানে, শেষকালে নিশিকান্তই অপরাধী সাব্যস্ত হল।

তারপরের দৃশ্যটা ছবির মতো ভাসছে চোখের সম্মুখে। অপরাধের গুরুত্ব এত বেশি যে শুধু বেত্রাঘাতই যথেষ্ট বলে মনে হল না—হেড্‌মাস্টার বিপিনবিহারী সাহার কাছে। জোড়া বেতে আপাদমস্তক জর্জরিত করে ইস্কুলের মাঠে গাধার টুপি মাথায় পরিয়ে দাঁড়া করিয়ে দেওয়া হল নিশিকান্তকে। তারপর ধনঞ্জয় পণ্ডিত নিজেই গিয়ে ইস্কুলের সমস্ত ছেলেকে ডেকে আনলেন।

লাইন করে খাড়া করিয়ে দেওয়া হল ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত সমস্ত ছেলেকে। হেড্‌মাস্টার জলদ-গম্ভীর স্বরে বললেন, এক একজন করে এগিয়ে যাও, তারপর দু'হাতে আচ্ছা করে ওর কান মলে দাও! খুব জোরে, কেউ কোনো মায়া করবে না। এই হল ওর উচিত শাস্তি।

ছেলেদের আনন্দের সীমা নেই। পরমানন্দে এক একজন গিয়ে নিশিকান্তের কান মলতে লাগল। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল নিশিকান্ত—একটু নড়লে না, এক বিন্দু প্রতিবাদ করলে না। মুখের একটি রেখা পর্যন্ত কাঁপল না তার, মাটির দিকে দৃষ্টি নামিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল সে। লজ্জা, অপমান, বেদনাবোধ—সমস্ত কিছুই তার কাছে শূন্য, আর অর্থহীন হয়ে গেছে।

রঞ্জুর পালা এল। উল্লাসে এগিয়ে গেল রঞ্জু। লম্বায় অনেকটা উঁচু নিশিকান্ত, তার কান দুটোকে পাওয়ার জন্যে ওপরের দিকে হাত তুলে দাঁড়াতে হল তাকে।

আর ঠিক তখনই তার দৃষ্টি পড়ল নিশিকান্তের চোখের দিকে।

আশ্চর্য সেই চোখ। মানুষের চোখে এমন করে যে ভাষা ফুটতে পারে, এমন করে জেগে উঠতে পারে অপমানিত মনুষ্যত্বের মর্মান্তিক লাঞ্ছনাবোধ—এ সত্য বোধ হয় অর্থহীন একটা অস্বস্তির মতো রঞ্জুর কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল সেই প্রথম। নিশিকান্তের চোখে দুটো শুকনো, তাতে এক বিন্দু অশ্রুর আভাস পর্যন্ত নেই! সে চোখ টকটকে লাল, যেন শরীরের সমস্ত রক্ত ওর চোখে গিয়ে জমা হয়েছে। সে চোখ অস্বাভাবিক—সে চোখ মানুষের নয়!

আলগাভাবে নিশিকান্তের কানে হাত ছোঁয়াতেই রঞ্জু শিউরে উঠল, একটা অসহ্য উত্তাপে যেন আঙুলগুলো জ্বালা করে উঠল তার। নিশিকান্তের কান দিয়ে আগুন ছুটছে। ওর শরীরটা আর শরীর নয়—একটা মশালের মতো জ্বলে যাচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছে অতি তীব্র, অতি প্রখর অগ্নিশিখার মতো!

সরে গেল রঞ্জু, পালিয়ে এল সেখান থেকে।

ইস্কুলের ছুটি হয়ে গেল—মস্ত বড় মাঠটার ভেতর দিয়ে একা বাড়ি ফিরছিল সে। ফসল কাটা শেষ হয়ে গেছে, ছোট আল্‌পথের পাশে পাশে কাটা ধানের গোড়াগুলো ছড়িয়ে আছে, ছুটোছুটি করে ফিরছে মেঠো ইঁদুর, বসে বসে জাবর কাটছে গোটা তিনেক গোরু—আর একদল গো-বক ওদের গায়ে উঠে ঠুকরে ঠুকরে এঁটুলি খাচ্ছে। বকারি পাখির ঝাঁক উড়ে পড়ছে এদিকে ওদিকে, একটা বাব্‌লা গাছে বসে লেজ নাচাচ্ছে হলদে পাখি।

কোনোদিকে মন নেই রঞ্জুর, দৃষ্টি নেই কোনোদিক। ইঁদুরগুলোকে তাড়া দিতে ইচ্ছে করলে না, ঢিল মেরে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করলে না গো-বকগুলোকে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিহ্বল চোখ মেলে দেখতে ভালো লাগলো না ওই বকারির ঝাঁক আর হলদে পাখির নাচকে। রঞ্জু অন্যমনস্ক হয়ে গেছে।

কেন অমন করে তাকিয়েছিল নিশিকান্ত? কেন তার চোখ দুটো অমন

রক্তের মতো রাঙা হয়ে উঠেছিল? দিনের পর দিন যে নিশিকান্ত ক্লাসে পড়া বলতে পারে না, দাঁড়িয়ে থাকে নির্বোধ একটা অসহায় জানোয়ারের মতো, আর মার খায়—তার ঘোলা চোখ কেন অমন করে রক্তাক্ত হয়ে উঠল?

মনের কাছে অস্পষ্টভাবে উত্তর এল তার। প্রথম শৈশবের অনুভূতিরাজ্যে—প্রথম দেশাত্মবোধ, প্রথম প্রেম, প্রথম মৃত্যুচেতনার সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন চৈতন্য অঙ্কুরিত হল। এ অপমান—মানুষের অপমানের প্রথম উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। অভাব আর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে যারা প্রত্যেক দিন পৃথিবীতে হার মেনে যাচ্ছে, তাদের সেই পরাজয়কে নিষ্ঠুর নির্মম অপমান। নিশিকান্ত একক নয়, বিচ্ছিন্ন নয় নিশিকান্ত। তার চোখে আরো অনেকের কথা—আরো অনেকের পরাজিত মানুষের অসহায় অপমানের একটা রক্তাক্ত প্রতিবাদ।

সেই প্রথম বুঝতে পেরেছিল রঞ্জু, তারপর আরো বড় হয়ে সম্পূর্ণ করে বুঝতে পেরেছিল—নিশিকান্তের কান থেকে আগ্নের জ্বালাটার মর্মনিহিত তাৎপর্য। শুধু কান নয়—নিশিকান্তদের সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠেছে অগ্নিশিখায়, চারদিকের কোটি কোটি মানুষ আজ আর মানুষ নেই—তারা অগ্নিপুত্তলি। সেই অগ্নিপুত্তলিকার দল অপেক্ষা করে আছে, প্রতীক্ষা করে আছে—একদিন সমস্ত পৃথিবীতে তারা আগুন জ্বালিয়ে দেবে। সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে সমস্ত—কেউ বাঁচবে না, কিছুই না।...

তার পরদিন থেকে আর ইস্কুলে এলনা নিশিকান্ত। তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, রাস্টিকেট্ করা হয়েছে তাকে। কেউ তার জন্যে ক্ষুণ্ণ হল না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে না কেউ। অমন প্রচণ্ড শয়তান ছেলেকে যে বস্তায় পুরে পাথর বেঁধে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়নি, এই ওর সাতপুরুষের ভাগ্য। বহুব্রীহি সমাস পড়াতে পড়াতে আর কেরোসিন কাঠের টেবিলে জোড়া বেত আছড়াতে আছড়াতে ধনঞ্জয় পণ্ডিত বললেন, আইনে না আটকালে তাই করা হত।

এর কিছুদিন পরের কথা।

ঠিক কতদিন—রঞ্জুর ভালো মনে পড়ে না। সন-তারিখের পাট নেই স্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে। তার সই কিছু এলোমেলো, পরেরটা আগে, আগেরটা পরে এসে পড়ে। কিন্তু সময়টা মনে না থাকলেও ঘটনাকে ভোলবার উপায় নেই!

সকালে পড়াতে এসেছেন নবদ্বীপ মাস্টার, একটা গুণ অঙ্ক নিয়ে রঞ্জু হিমসিম খাচ্ছে। এমন সময় থানা থেকে কনেস্টবল প্রিয়নাথ এল। বললে, ছোটদাদা, বড়বাবু তোমায় ডাকছেন।

—বাবা ?

—হ্যাঁ—এক্ষুণি একবার থানায় আসতে বললেন।

ভয়ে গলা শুকিয়ে উঠল। বাবা ডেকে পাঠিয়েছেন। তার মানে, যম-রাজের পরোয়ানা। তবে ভরসা এই, থানায় যখন ডেকে পাঠিয়েছেন তখন আর যাই হোক, শাসন-সংক্রান্ত কোনো ব্যাপার নয়।

—কেন ?

—একটা খুব মজা হয়েছে। দেখবে এসো—

এবার রঞ্জু উল্লাসে লাফিয়ে উঠল : যাই মাস্টারমশাই ?

—যাবে বই কি, নিশ্চয় যাবে। বড়বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন, এর মধ্যে আবার বলবার কী আছে ?—বিগলিত বাধিত হাসিতে নবদ্বীপ মাস্টার বললেন, এক্ষুণি যাও—

প্রিয়নাথের সঙ্গে রওনা হল থানার দিকে। আগ্রহভরে প্রশ্ন করলে : কী হয়েছে থানাতে ? কিসের মজা প্রিয়নাথদাদা ?

প্রিয়নাথ বললেন, চলোই না, নিজেই দেখবে এখন।

থানার সামনে ভয়ানক ভিড়। বহু লোক জমেছে, চেঁচামেচি হচ্ছে। নিশ্চয় গুরুতর কাণ্ড কিছু ঘটেছে ওখানে।

বাবা ডাকলেন, রঞ্জু দেখবে এসো। তোমাদের বন্ধু নিশিকান্তের কীর্তি।

কীর্তি করেছে বটে নিশিকান্ত। সেদিন চোখ যে রঙ দেখেছিল, তার চাইতে অনেক ভয়ঙ্কর, অনেক বীভৎস তার আজকের চোখ। আজ রক্ত শুধু তার চোখে ছড়িয়ে নেই—ছড়িয়ে গেছে সর্বাঙ্গে, হাতে রক্ত, কাপড়ে রক্ত, জামায় চাপ চাপ রক্ত। নিশিকান্ত যেন মেখে এসেছে ফাগুয়ার রঙ।

বাবা বললেন, জমিতে ধান কাটা নিয়ে খুড়োর গলায় দায়ের কোপ বসিয়েছে—

বাকী কথাগুলো রঞ্জুর কানে গেল না। অত রক্ত—অমন অজস্র রক্ত! নিশিকান্তের চোখদুটো ছিঁড়ে যেন রক্তের ধারা নেমে আসবার উপক্রম করছে। রঞ্জুর মাথার মধ্যে সব এলোমেলো হয়ে গেল, কান ঝিঁ ঝিঁ করতে লাগল, মনে হল গলার ভেতর থেকে বমির মতো কী একটা ঠেলে উঠছে। দম আটকে আসছে তার, মাথা ঘুরছে। দৃষ্টির সামনে শুধু রক্ত দুলছে, রাশি রাশি রক্ত, চাপ চাপ রক্ত—পৃথিবীময় রক্ত, দুটো জ্বলন্ত চোখে রক্তের আগুন—

বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন : প্রিয়নাথ, ওকে বাইরে নিয়ে যাও, এখুনি বাইরে নিয়ে যাও। আমারি ভুল হয়েছিল—এত রক্ত ও সইতে পারবে কেন ?

খুড়োর গলায় দায়ের কোপ বসিয়েছে নিশিকান্ত, হয়তো খুন করেছে তাকে। সেই নিশিকান্ত—যে হাজার বেত খেয়েও এখনও টুঁ শব্দ করেনি—দেড়শো ছেলের হাতে কানমলা খাওয়ার মতো অপমানও যে নির্বিবাদে সহ্য করে যেতে পেরেছে, এমন ক্ষিপ্ত, এমন ভয়ঙ্কর সে হয়ে উঠল কেমন করে ?

রঞ্জুর মন বলে, মানুষের ঘৃণা আর অসহ্য অপমানই সেদিন মানুষকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছিল তাকে, শিখিয়েছিল মানুষকে আঘাত করবার হিংসামন্ত্র। কিন্তু আঘাত করা আর আত্মহত্যা করা, এ দুটোর পার্থক্য তার কাছে স্পষ্ট ছিলনা বলেই বোধহয় শেষেরটা বেছে নিয়েছিল নিশিকান্ত।

রক্ত—রক্ত—সমস্ত পৃথিবীময় চাপ চাপ রক্ত। কিন্তু শত্রুহত্যার রক্তে নয়। —আত্মহত্যা খুন-খারাপী রঙেই রক্তাক্ত হয়ে গেছে পৃথিবীর ধুলোমাটি।

—ছয়—

নাজীপুর থানা থেকে রঞ্জুর বাবা বদলি হলেন।

চাকরীতে তাঁর পদোন্নতি হয়েছে। মফঃস্বলের একটি ছোট থানা থেকে একেবারে সদরের অফিসার-ইন্-চার্জ হলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হয়ে গেল বাঁধাছাঁদার পালা। নীলাঞ্চলা আত্রাই, ফুলে ফুলে ভরা কৃষ্ণচূড়ার গাছটা, স্কন্ধকাটার হাইতোলা, মজে-আসা আলেয়াদীঘি, রবিশস্যে ভরা ইস্কুলে যাওয়ার মাঠটা, মশানীর মন্দির, কবিরাজের বড় আমবাগানটা আর অবিনাশবাবুর ভাঙা আশ্রম, বাদল, অশ্বিনী, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, উষা, নিশিকান্ত আর অবিনাশবাবুর ওপর দিয়ে চিরদিনের মতো যবনিকা নেমে এল।

ছেড়ে আসতে খুব কি দুঃখ হয়েছিল রঞ্জুর ? না। এই ছোট গ্রাম, এই থানা, এই গঞ্জ। এর বাইরে আর একটা বিশাল, এত বিশাল, যে রঞ্জু কল্পনাও করতে পারে না—একটা দেশ আছে। তার উত্তর-পূর্বে কারাকোরাম, হিন্দুকুশ, হিমালয় আর খাসিয়া জয়ন্তীয়ার অলঙ্ঘ্য বিস্তার, তার দক্ষিণে গাঢ় নীল ঢেউ নিয়ে নেচে নেচে খেলা করছে বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর। কলকাতা, কাশী, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ। সে এক আশ্চর্য দেশ, সে দেশের নাম ভারতবর্ষ। মানচিত্রের ওপরে নানা রঙের ছাপ আর নানা বিচিত্র নামের ভেতরে রঞ্জু তাদের নাজীপুরের নাম কোথাও খুঁজে পায়নি। এই বিপুল দেশের কাছে তাদের নাজীপুর কত ছোটো, কত নগণ্য !

মনে আছে রঞ্জুও এই ভারতবর্ষের ডাক শুনতে পেয়েছিল। ক্লাসে ভূগোল

পড়ার সময় তাই সে কতবার অন্যমনস্ক হয়ে গেছে, কতবার ম্যাপের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেয়েছে, দেখতে চেয়েছে আকুল আগ্রহে। হিমালয়, হিন্দুকুশ, কারাকোরাম, আরব সাগর আর বঙ্গোপসাগর। এতদিনে যেন সেই বহুবাঞ্ছিত যাত্রা সুরু হল তার। ধুলো-ভরা যে মেটে পথটা উঁচু উঁচু তালগাছের চাতছানিতে তার মনটাকে বারে বারে নিয়ে গেছে সেইসব দেশে, একদিন সন্ধ্যাবেলা গোরুর গাড়িতে করে সেই পথ দিয়ে রঞ্জু বেরিয়ে পড়ল মানচিত্রের রেখা জটিল পথে—সরীসৃপ রহস্যময়তায়।

গোরুর গাড়ির পেছনে ছইয়ের ভেতরকার ছোট কাটা জানালাটা দিয়ে সে দেখছিল ঘুমঘুম বিহ্বল চোখ মেলে। দেখছিল একটু একটু করে কেমনভাবে নাজীপুরের দুটো-চারটে মিটমিটে আলো ক্রমশ পেছনে সরে যাচ্ছে। শুধু অন্ধকারে কবিরাজের আমবাগানটাকে আবছা আবছা বোঝা যাচ্ছে এখনো, যেন শেষবারের মতো মাথা নেড়ে নেড়ে কারা কী একটা কথা বলতে চাইছে রঞ্জুকে। গা ছম ছম করে উঠল, ভয় করতে লাগল তার। মুহূর্তে সে ছইয়ের ভেতরে মাথাটা টেনে নিলে, তার পর মার কোলে মুখ বুজে শুয়ে পড়ল। আর অনুভব করতে লাগল অসমতল এলোমেলো রাস্তার গাড়িটা কেমন মাতালের মতো টলতে টলতে অন্ধকার আর অনির্দেশ পৃথিবীর দিকে এগিয়ে চালছে।

অন্ধকার আর অনির্দেশ পৃথিবী। কন্যাকুমারী থেকে হিমালয়ের তুষার তীর্থের পথে।

শহর। যেখানে ঘোড়ার গাড়ি আছে, মোটর আছে, রেলের ইষ্টিশন আছে। যেখানে দোতলা-তেতলা মস্ত মস্ত দালান, যেখানে পাথর দিয়ে রাস্তা বাঁধানো, যেখানে রাস্তার পাশে পাশে রাত্তিরে আলো জেলে দিয়ে যায়। যেখানে সাবধানে চোখ চেয়ে পথ না চললে তুমি গাড়ি চাপা পড়তে পারো, অন্ত মানুষের সঙ্গে তোমার গায়ে ধাক্কা লাগতে পারে। রঞ্জুর জীবনে সেই প্রথম শহর। নাম—ধরা যাক মুকুন্দপুর।

নিতান্তই মফঃস্বল শহর। শ্রী নেই, রূপ নেই, স্বাস্থ্যতো নেইই। বর্তমানের চাইতে অতীতের জীর্ণ একটা সোঁদা গন্ধই যেন চারদিকে পাক খেয়ে বেড়ায়। ধুলো আর অপরিচ্ছন্নতা। কাঁচা ড্রেনে দুর্গন্ধ সবুজ কাদা। পচা পুকুর আর জংলা আমের বাগান। পাড়াগুলো অনাবশ্যক ভাবে দূরবিচ্ছিন্ন আর বিশ্লিষ্ট—যেন একটা দেহকে টুকরো টুকরো করে কেটে খামখেয়ালের বশে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে এদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু রঞ্জুর কাছে সেই প্রথম শহর। এর জীর্ণ নিরানন্দ রূপ প্রথম দৃষ্টিতেই যেন তাকে জয় করে নিলে। নাজীপুরের তুলনায় কত বিরাট, কত বিচিত্র! তার মুকুন্দপুরের চাইতে বহু দূরের শহর কলকাতা অনেক বড়, অনেক আশ্চর্য—এ কথা তার বিশ্বাস হত না, এ কথা ভাবতেও তার কষ্ট হত।

শহরের সঙ্গে পরিচয়টা স্পষ্ট হয়ে উঠতে না উঠতে একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। একটা বিপ্লব দেখা দিলে সংসারে। এতদিনের নিশ্চিন্ত সহজ জীবনে জটিলতার গ্রন্থি-বন্ধন অনুভব করলে রঞ্জু।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় থানা থেকে বাবা যখন কোয়ার্টারে ফিরলেন তখন তাঁর সমস্ত মুখ যেন একটা মুখোস-টানা। শুভ্র বিস্তীর্ণ ললাটে কতগুলো কালো কালো রেখা ফুটে উঠেছে, একদিনের মধ্যে যেন কুড়ি বছর বয়েস বেড়ে গেছে বাবার। সেদিন বাড়ির ছোট বোনগুলো পর্যন্ত চেঁচিয়ে কাঁদতে সাহস পেল না, আস্তাবল থেকে ঘোড়ার সহিসটার সিদ্ধি খাওয়া গলায় রামায়ণের সুর শোনা গেল না, বড়দার ঘরে সন্ধেবেলায় নিয়মিত গানের মজলিশ বসল না, ঠাকুরমা গলা খুলে চেঁচিয়ে উঠলেন না একবারও। একটা অশুভ আর অনিশ্চিত আশঙ্কায় সমস্ত বাড়ীটা ডুবে রইল স্তব্ধতার মধ্যে।

কয়েকটা মাসের ভেতরেই যেন অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে সূর্য-পরিক্রমা করল পৃথিবীটা। সেই সব দিনগুলো ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবির মতো (রঞ্জু তখনো সিনেমা দেখেনি) পর পর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অপসারিত হয়ে গেছে, একটার পর আর একটা জড়ানো—সবগুলো মিলে এইটে মনে পড়ে—বাবার চাকরী গেল।

আঠারো বছর সুখ্যাতি আর সুনামের সঙ্গে কাজ করে তাঁর চাকরী গেল। যতদূর মনে আছে এস-পির সঙ্গে কী একটা খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছিল। বাঙালি পুলিশ সাহেবের আত্মমর্যাদায় ঘা লাগল এবং তার ফলে যা হওয়ার তাই হয়ে গেল।

লজ্জায়, অপমানে এবং অবিচারের ক্ষোভে বাড়িতে মৃত্যুশোকের ছায়া নেমে এল। কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হল, বন্দুক রিভলবার রইল না, বিক্রী করে দিতে হল ঘোড়াটাও। তারপর আশ্রয় নিতে হল শহরের প্রান্তে একটা ভাঙা বাড়িতে।

মা বললেন, এখানে থেকে কী হবে? চলো, দেশে চলে যাই।

বাবা কঠিনভাবে বললেন, না।

—কিন্তু এখানে থাকা কত বড় অপমান সে কি বুঝতে পারছ না?

বাবা বললেন, না। অপমান এতদিন ছিল, এবার সে অপমানের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি।

সেইদিন রাত্রে রঞ্জুর জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল একটা।

সন্ধ্যার পরেই বাড়ির যত বিলিতী কাপড়, পুলিশী ইউনিফর্মের অবশেষ, একগাদা টুপি, দু-তিনখানা রাজভক্তির সার্টিফিকেট স্তূপাকার করে উঠোনে জড়ো করা হল।

ঠাকুরমা আর্তনাদ করে উঠলেন: খোকা, এ তুই করছিস কী। এত দামী দামী সব কাপড় জামা—

বাবার গলার স্বর পাথরের মত শক্ত শোনাল: তুমি চুপ করো মা।

—কিন্তু দু তিনশো টাকার জিনিস-পত্তোর—

—অপমানের শেষ চিহ্নটুকুও রাখব না। অনেক আবর্জনা জমেছিল, আজ পুড়িয়ে পরিষ্কার করে দেব।

বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলেন ঠাকুরমা। তারপর জোরে শ্বাস টানতে টানতে উঠে চলে গেলেন ঘরের মধ্যে। তাঁর আবার হাঁপানির টান উঠেছে। তবু সে অবস্থাতেও ঘরের ভেতর থেকে তাঁর একটা অব্যক্ত আর অস্পষ্ট কান্না-ভরা বিলাপ শোনা যেতে লাগল।

বাবা কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। নিজের হাতে আধ টিন কেরোসিন এনে ঢেলে দিলেন কাপড়ের স্তূপের ওপর, জ্বেলে দিলেন দেশলাইয়ের কাঠি। আগুন নেচে উঠল।

অন্ধকার উঠোনটা উল্লসিত হয়ে উঠল অতি তীব্র খানিকটা আলোর দীপ্তিতে। উঠোনের বেঁটে পেয়ারা গাছটার মাথা ছাপিয়ে শিখাগুলোর সরীসৃপরেখা আকাশের দিকে প্রসারিত হয়ে গেল। কাপড়, আলপাকা, পট্টু, তুলো আর পোড়া কেরোসিনের দুর্গন্ধে বিস্বাদ হয়ে হয়ে উঠল বাতাস। অনেক অপমান, অনেক পাপ—এক সঙ্গে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

বাবা স্থির হয়ে বসে রইলেন নিশ্চল একটা মূর্তির মতো। আগুনের একটা লাল আভা এক একবার তাঁর মুখের ওপরে পড়ে সরে সরে যেতে লাগল, কেমন আশ্চর্য আর ভয়ঙ্কর মনে হতে লাগল তাঁকে। আর মাঝে মাঝে তাঁর চোখ সম্মুখের ওই আগুনটার চাইতেও শাণিত হয়ে জলে জ্বলে উঠতে লাগল। সেই চোখ, ঠিক সেই চোখ—যে চোখ সে দেখেছিল অবিনাশবাবুর—সেই তিরিশ সালের বন্যার সময়। রঞ্জুর কেমন ভয় ধরেছিল, কেমন একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে, যেন অকারণে মনে হয়েছিল বাবা যেন আজ প্রকৃতিস্থ নেই। তাঁকে আজ ছুতে

ধরেছে, একটা প্রেতাত্মা এসে ভর করেছে। সেকি অবিনাশবাবুরই প্রেতাত্মা।

যতক্ষণ আগুনটা জ্বলল ততক্ষণ বাবা তেমনি নিশ্চল হয়ে বারান্দায় বসে রইলেন। তারপর একটা উত্তপ্ত অন্ধকারে উঠোনটা গেল আচ্ছন্ন হয়ে। রক্তাক্ত খানিক ক্ষতের মতো কিছুক্ষণ ধরে দপ দপ করতে লাগল বিস্তীর্ণ অগ্নিশয্যা, বাতাসে পোড়া ছাইগুলো উড়তে লাগল এলোমেলোভাবে।

সেই রাত্রেই বাবা ওদের তিন ভাইকে ডেকে পাঠালেন।

লণ্ঠনের আলোয় বাবার আর এক মূর্তি সেই যেন প্রথম চোখে পড়ল রঞ্জুর। মেজেতে একখানা হরিণের চামড়ার আসন পেতে তিনি বসেছেন। উজ্জ্বল গৌরাঙ্গে শুভ্র যজ্ঞোপবীত ধপ ধপ করছে, একটা অপূর্ব শুচিতায় প্রশস্ত কপাল জ্বল্ জ্বল্ করছে তাঁর। আঠারো বছরের গ্লানি থেকে সত্যি সত্যিই আজ মুক্তিস্নান হয়েছে। আঠারো বছর ধরে বাবার এই রূপ, এই ব্রাহ্মণোত্তম মূর্তি কোথায় লুকিয়েছিল ?

সামনে বসে মা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব পড়ছিলেন। ছেলেদের পায়ের শব্দে বিষণ্ন চোখ তুলে তাকালেন। তারপর মহাভারত বন্ধ করে নিঃশব্দ পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

বাবা বললেন, বোসো তোমরা।

তিন ভাই এ ওর মুখের দিকে তাকালে সভয়ে। কেমন অভিভূত হয়ে গেছে তারা। ঘরে ধূপ জ্বলছে, কোথা থেকে চন্দনের সুগন্ধ আসছে। যেন ঠাকুর ঘরের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে একটা। তিন ভাই কুণ্ঠাভরে দাঁড়িয়ে রইল।

অন্যদিন হলে হয়তো বাবা একটা প্রচণ্ড ধমক দিতেন। কিন্তু ওই হরিণের চামড়ার আসন, ওই ধবধবে পৈতেটা, চন্দন আর ধূপের গন্ধ—সব মিলিয়ে সব কিছুর একটা রূপান্তর হয়ে গেছে আজ। প্রশান্ত স্বরে বাবা আবার বললেন, দাঁড়িয়ে রইল কেন ? বোসো সব ওখানে।

সসঙ্কোচে তিনজনে বসল। বসল মাটিতে চোখ নামিয়েই। বাবার দিকে চোখ তুলে তাকাবার মতো শিক্ষা অথবা সৎসাহস ওরা এ পর্যন্ত আয়ত্ত করতে পারে নি।

—তোমাদের একটা কথা বলবার জন্যে ডেকে আনিয়েছি।

তিন জোড়া কাণ উৎকর্ণ হয়ে রইল।

আস্তে আস্তে বাবা বললেন, আজ তোমাদের একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

তিন জোড়া চোখ একবারের জন্যে একটুখানি উঠেই আবার মাটির দিকে

নেমে গেল। বিস্ময়ে ওদের মন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, একটা বিশ্রী অস্বস্তি ওদের পীড়ন করছে।

প্রতিজ্ঞা করতে হবে জীবনে কখনো ইংরেজের চাকরী করবে না। আর মনে রাখতে হবে তাদের কাছে ন্যায় নেই, তাঁদের কোনদিন ক্ষমা করবে না।

যন্ত্রচালিতের মতো তিন ভাই উচ্চারণ করলে, প্রতিজ্ঞা করলাম।

প্রতিজ্ঞা! রঞ্জু জানে, সবচেয়ে সার্থক প্রতিজ্ঞা, সব চেয়ে বড় সংকল্প সেদিন সে উচ্চারণ করেছিল। এর গুরুত্ব সেদিন সে বুঝতে পারে নি, সেদিন এর বিন্দুমাত্রও অনুমান করা সহজ ছিল না তার পক্ষে। কিন্তু প্রতিজ্ঞাটা ভুলতে পারে নি। ঠাকুর ঘরে ঢুকে দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে যেমন মিথ্যা বলতে পারা যায় না, তেমনি ধূপ-চন্দনের গন্ধে ভরা শুচিতায় আবিষ্ট সেই ঘরটিতে, হরিণের চামড়ার আসনে বসে থাকা সেই জলন্ত মূর্তিটির সম্মুখে দাঁড়িয়ে যে সঙ্কল্প সে নিয়েছিল, তার অনিবার্য শাসনের লৌহ-তর্জনী প্রসারিত হয়ে রইল তার আগামী ভবিষ্যতের দিকে।

শিলালিপিতে আর একটি আঁচড় পড়ল।

এইবারে সত্যি সত্যিই পৃথিবীর মাটিতে পা দিল রঞ্জু।

এতদিন একটা গণ্ডি ছিল তার—নিষেধের একটা বেড়া টানা ছিল চারদিকে। এইবার খোলা পৃথিবী থেকে দমকা বাতাসের ঝাপ্‌টা এল একটা, সে বেড়ার আর চিহ্নমাত্র রইল না। প্রকাণ্ড জগৎটাকে দেখতে চেয়েছিল রঞ্জু, তাই সে প্রকাণ্ড জগতের মানুষগুলো তার চারপাশে এসে ভিড় করে দাঁড়ালো।

স্রোতের মতো চলে গেছে সময়, দুবছর বয়েস বেড়েছে রঞ্জুর। নতুন পরিবেষ্টনী সঙ্গে অভ্যস্ততা পুরোণো হতে হতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে গেছে। বাবা একটা জমিদারী কাছারীতে ম্যানেজার হয়ে বসেছেন—মধ্যবিত্ত জীবনের অপ্রাচুর্য এখন আর কষ্ট দেয় না। ভাতের সঙ্গে গাওয়া ঘি না হলেও এখন রঞ্জুর খাওয়া হয়, ক্ষীরের মতো দুধ না হলে এখন আর কান্না পায় না, মাসে মাসে নতুন জামা জুতো এল কিনা সে সম্পর্কে এখন আর সজাগ থাকবার দরকার আছে মনে হয় না। ছেঁড়া প্যাণ্ট্, হাঁটু পর্যন্ত ধুলো—পাড়ার মধ্যবিত্ত ছেলেদের সঙ্গে সে একেবারে মিশে গেছে।

পাড়ার নাম মনসাতলা। নামটা হওয়ার কারণ আছে একটা। এই পাড়ার চৌমাথায় তিনকোণা একটা দ্বীপের মতো একফালি জমি ছিল। কতদিন আছে কে জানে—কোনো এক পুণ্যবান ব্যক্তি এখানে বট-অশ্বত্থের বিয়ে

দিয়েছিলেন। সেই দুটি গাছ এক সঙ্গে জড়াজড়ি করে বড় হয়েছে, রচনা করেছে বিস্তীর্ণ একটা বিশাল ছায়াচ্ছন্নতা। এই জোড় গাছের তলায় প্রায় প্রতি বছর ঘটা করে মনসা পুজা করা হয়, বিষহরির গান হয়। তাই পাড়ার নাম হয়েছে মনসাতলা।

এই মনসাতলার শান্ত ছায়ার নিচে কী মনে করে মিউনিসিপ্যালিটি লম্বা একটা সিমেন্টের বেঞ্চি তৈরী করে দিয়েছে। ফলে এটা হয়েছে সকাল দুপুর সন্ধ্যায় পাড়ার সকলের একটা চমৎকার আড্ডা দেবার জায়গা। কিন্তু দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই জায়গাটা ছেলেদের দখলে। বেঞ্চিটা যখন প্রথম তৈরী করা হয়, তখন কাঁচা সিমেন্টের ওপর কোনো এক ভবিষ্যৎদ্রষ্টা (ছেলেরা তাঁর কাছে অসীম কৃতজ্ঞ) ষোলো ঘুঁটি বাঘবন্দীর গোটা কয়েক ছক তৈরী করে রেখেছিলেন। ছেলেরা মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা থেকে খোয়া কুড়িয়ে এনে সেখানে দলে দলে খেলতে বসে যায়, ছাগলের চক্রব্যূহে বাঘকে বন্দী করে ফেলে আনন্দে জয়ধ্বনি করে। বেঞ্চিটার নিচে সারি সারি ছোট ছোট গর্ত —বেশ যত্নসহকারে গর্তগুলোকে নিখুঁত গোলাকার করবার চেষ্টা হয়েছে। সকালে বিকালে এবং রবিবারের সমস্তটা দিন ধরে সেখানে মার্বেল খেলা চলে।

মার্বেল খেলার সে সব সাংকেতিক বাক্যগুলো আজও দুটো চারটে মনে পড়ে। ইংরেজি ভাষার অমন অপূর্ব সদ্ব্যবহার বোধ হয় আর কোনো ক্ষেত্রে কোনো দিন হয় নি। রবীন্দ্রনাথের 'সিংগিল্ মেলাসিং' এও না।

"উড্ড্ কিপ্"—(মার্বেল মাটি উঁচু করে বসিয়ে দাও।)

"হাত ইস্টেট"—(হাত উঁচ করে ইচ্ছেমতো মারো।)

"ঠ্যাকাউন্স্ বাই ফর্টি ফিপ্টি হ্যাণ্ড"—(আটকে দিলেই মার্বেল চল্লিশ পঞ্চাশ হাত দূরে ছুঁড়ে দেওয়া হবে।) এই বিচিত্র ধ্বনি-তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে উঠত মার্বেলের ঠকাঠক শব্দ। কে কতটা মার্বেল ফাটাতে পারত এই ছিল কৃতিত্বের সব চাইতে বড় পরীক্ষা।

সন্ধ্যার পরে যখন ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, বাঘবন্দীর 'কোর্ট' আর মার্বেলের গর্ত ছেড়ে ছেলেদের বাড়ি ফিরে পড়তে বসতে হত, তখন এই মনসতলায় এসে বসতেন পাড়ার অভিভাবকেরা। সাধারণ মফঃস্বল শহরের সাধারণ মধ্যবিত্তদের মতোই তাঁরা আদালত আর কাছারি নিয়ে আলোচনা করতেন, রাজনীতির শ্রাদ্ধ করতেন, সুযোগমতো ফিস্‌ফাস করে পরে হাঁড়ির খবরাখবর নিয়ে গবেষণা করতেন, মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের অবিবেচনা পর্যালোচনা করে আগামী নির্বাচনে সব ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করবার পরিকল্পনা

নিতেন। আর মাঝে মাঝে মার্বেল খেলায় গর্তে পা পড়ে কেউ কেউ যখন হোঁচট খেতেন তখন তাঁদের উত্তেজনা আরো বেশি বেড়ে উঠত। জাতির এই সব অপোগণ্ড বংশধরদের ভবিষ্যৎ দুর্গতি সম্বন্ধে তাঁরা দৈববাণী করতেন, এবং স্থির করতেন, পরের দিন মার্বেল খেলতে এলেই হতভাগাগুলোকে ঠেঙিয়ে হাড় ভেঙে দেবেন।

কিন্তু আগের রাত্রির কথা পরের দিন তাঁদের মনে থাকত না। আর বেলা সাড়ে আটটা না বাজতেই হৈ হৈ করে মার্বেল নিয়ে এসে পড়ত ছেলেদের দল।

এই দলের যে পাণ্ডা তার নাম ভোনা।

বেঁটে চেহারার ছেলে, শরীরের ওপারের দিকটার চাইতে নিচের দিকটা বেশি মোটা। পায়ের পাড়াদুটো এত বেশি বড় যে সেই বারো তেরো বছর বয়সেই ভোনা তার বাবার একটা পুরোণো ছেঁড়া চটি পরে আসত। খেলার সময় যখন দৌড়োত, তখন হাতীর চলার মতো শব্দ উঠত থপ থপ করে। গালের ডানদিক দিয়ে সব সময়ে বেরিয়ে থাকত জিভের ডগাটা—মনে হত সারাক্ষণ যেন কাউকে ভেংচে চলেছে সে।

আর মুখখানা। ওরকম পাকামিভরা মুখ হাজারে একটি মেলে কিনা সন্দেহ। নিচের ঠোঁটে কয়েকটা কালো কালো দাগ পড়েছিল তার—ছেলেরা বলত ভোনা লুকিয়ে বিড়ি টানে। আর হিন্দুস্থানীরা খৈনি খেয়ে যেমন করে থুথু ফেলে, তেমনি করে দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচ্ পিচ্ করে থুথু ফেলত সে। অভ্যেসটা কোত্থেকে আয়ত্ত করেছিল সেই জানে।

মার্বেল খেলায় ভোনার হাত ছিল পরিষ্কার। দৈনিক অত্যন্ত দুগণ্ডা করে সে মার্বেল জিতত, ষোলো ঘুঁটি বাঘবন্দী খেলায় তাকে কেউ এঁটে উঠতে পারত না। তাছাড়া অজস্র কথাবার্তা বলতে পারত চোখেমুখে, আর কোমর দুলিয়ে অপূর্ব ভঙ্গিতে নেচে নেচে আলিবাবার গান গাইত :

"ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল
এত্ত বড়া উঠানমে এত্তা জঞ্জাল—"

বলা বাহুল্য, ছেলেদের মধ্যে নেতা হওয়ার পক্ষে এই গুণগুলোই যথেষ্ট। বাপের জুতোজোড়া পায়ে দিয়ে বাপের মতোই জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল ভোনা। কিন্তু সে গুণাবলী ক্রমশ প্রকাশ্য।

রঞ্জুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়টা যেভাবে হওয়া উচিত সেই ভাবেই হল। একটা প্রকাণ্ড লাট্টু নিয়ে বন বন করে ঘোরাচ্ছিল ভোনা, আর মাঝে মাঝে সেটাকে হাতের তেলোতে তুলে নিয়ে সকলকে গুণমুগ্ধ করে তুলছিল।

তারপর হঠাৎ রঞ্জুর দিকে চোখ পড়তেই প্রশ্ন এল: এই গঙ্গাফড়িং, তোর নাম কিরে।

অপমানে কান লাল করে রঞ্জু ফিরে যাচ্ছিল, ভোনা এসে তার কাঁধে হাত রাখল।

—আরে চট্‌ছিস কেন? তোকে গঙ্গাফড়িং বললাম, তুই না হয় আমাকে ভোঁদড় বলবি। চটাচটির কী আছে ভাই? এই নে—কামরাঙা খাবি?

এরকম লোকের ওপরে রাগ করা শক্ত। রঞ্জু হেসে ফেলল।

—হাসি ফুটেছে? আঃ—বাঁচালি। কারো গোমড়া মুখ দেখলে বড্ড বিশ্রী লাগে আমার। নে—খা এই কামরাঙাটা। ভয় নেই, টক নয়, পিটার সাহেবের বাগান থেকে চুরি করা, একেবারে চিনির মতো মিষ্টি।

ভাব হয়ে গেল।

কিন্তু কোথায় যেন বাধে রঞ্জুর। মনসাতলার অন্যান্য ছেলেদের মতো—ভোনাকে তার ভালো লাগে, একধরণের শ্রদ্ধাও আছে তার সর্বাঙ্গীন দক্ষতায় ওপরে। তবু কোথায় যেন মনের দিক থেকে মস্ত একটা বাধা আছে, ভোনাকে ঠিক গ্রহণ করতে পারে না সে।

বৈশাখের দুপুর। ইস্কুলে গরমের ছুটি—বাড়ি থেকে পালাবার সুযোগ এবং অবকাশের অভাব হয় না। আমবাগানে ছেলেদের আড্ডা জমেছিল।

একরাশ কাঁচা আম জড়ো করা হয়েছে। ছুরি দিয়ে কেটে লঙ্কার গুঁড়ো আর লবণের সাহায্যে সেগুলোর সদ্গতি চলছে। টকে আর আরামে একধরণের মুখভঙ্গি করে ভোনা বললে, এই খাঁদু, রায় বাড়ির বিমলি কি করছে জানিস?

খাঁদু ভোনার প্রধান সহচর। আগ্রহভরা গলায় জিজ্ঞাসা করলে, কী করছে রে?

তারপর তেমনি চোখ আর মুখের ভঙ্গি করে, জিভটাকে বিচিত্র ধরণে বের করে কতগুলো কথা বলে গেল ভোনা। সে কথাগুলো রঞ্জুর কাছে অপরিচিত, সে সব কথা মনে করতে গেলে আজও সর্বাঙ্গ যেন কুঁকড়ে ওঠে আর অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা ভাবে কী একটা ইঙ্গিত তার চেতনার ভেতরে নাড়া দিয়েছিল সেদিন। রঞ্জুর কান গরম হয়ে উঠেছিল, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছিল, হৃৎপিণ্ডটা যেন আচমকা ভয় পেয়ে ধক্‌ধক্ করে উঠেছিল বার কয়েক। তারপর রঞ্জু আর সেখানে বসতে পারে নি, সোজা এক ছুটে পালিয়ে এসেছিল বাড়িতে।

বহুদিন পরে মনে হয়েছিল, আজ যেন আবার পেছনে পেছনে সেই হাড়গিলা পাখিটা কক্ কক্ করে তেড়ে আসছে।

পেছন থেকে ভোনা, খাঁদু এবং অন্যান্য ছেলেদের অট্টহাসি ভেসে আসছিল। ওরা কৌতুক বোধ করছে। বিদ্রূপ করে বলছে : কাপুরুষ!

কাপুরুষ! তা হোক। ও কথাটায় তখন লজ্জা হয়নি তার।

বাড়ি ফিরে এল রঞ্জু। খিড়কি দরজার পেছনে যেখানে ছাইয়ের মস্ত একটা গাদা জমেছে; রান্না ঘরটার দেওয়াল ঘেঁষে চাল থেকে ঝরা বৃষ্টির রেখায় সবুজ ছ্যাতলা ধরা জমিতে যেখানে গজিয়েছে ছোট বড় কতগুলো ব্যাঙের ছাতা; এলোমেলো কচু গাছের সঙ্গে ডোরা কাটা সাপের মতো লম্বা লম্বা বুনো ওলের ডাঁটা উঠেছে আর সবটা মিলে ছায়া ছড়িয়ে রেখেছে নতুন ফুলে ভরা বড় বাতাবী লেবুর গাছটা—সেখানে, সেই নির্জনতা ঘেরা আবর্জনার মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে বসে রইল রঞ্জু।

কান দুটো তখনো ঝাঁঝাঁ করছে, তখনো কপাল বেয়ে তার টপ টপ করে ঘাম পড়ছে। মাটির পৃথিবী থেকে সেই প্রথম একরাশ কাদা ছিটকে লাগল মালঞ্চমালা, কঙ্কাবতী আর পাশাবতীর সাত রঙে আঁকা কল্পনার অপরূপ ছবিতে। কিশোরের অপরিচ্ছন্ন অকালপক্কতার ধোঁয়াটে চিন্তা, ঘোলাটে কুশ্রীতা। একটা কদর্য রূপ নিয়ে তার চোখের সামনে সেটা বীভৎস দুঃস্বপ্নের মতো ভাসতে লাগল।

মনে হল আজ সে পাপ করেছে। মিথ্যে কথা বলা নয়, পড়ার বইয়ের আড়ালে গল্পের বই লুকিয়ে মা-কে ফাঁকি দেওয়াও নয়। তার চাইতে এ অনেক বড় অন্যায়, ঢের বেশি অপরাধ। এ অপরাধের জন্যে তার ক্ষমা নেই—কারো চোখের দিকে সে আর চোখ তুলেও তাকাতে পারবে না। রঞ্জুর কান্না পেতে লাগল, হাত জোড় করে বলতে ইচ্ছে করল, ঠাকুর আমায় মাপ করো, আর কোনোদিন আমি ভোনার সঙ্গে মিশব না।

নিজের অপরাধের ভারে আচ্ছন্ন হয়ে অনেকক্ষণ সেই ছাইগাদার ওপরে বসে রইল রঞ্জু। তারপরে যখন খেয়াল হল তখন বাতাবী লেবু গাছটার হাল্কা ছায়া ঘন হয়ে এসেছে, ফুলের গন্ধে বাতাস যেন থেমে দাঁড়িয়েছে, তিন চারটে শালিক পাখি নেচে নেচে ব্যাঙের ছাতার তলায় তলায় কেঁচো খুঁজছে, আর একটু দূরের রেল লাইন দিয়ে বিকেল পাঁচটার প্যাসেঞ্জার গাড়িটা ঝরাং ঝরাং করে চলেছে কাটিহারের দিকে।

উঠোনে ঢুকতেই প্রথমে নজর পড়ল মায়ের।

এগিয়ে এসে কপালে হাত দিলেন: কি রে, তোর হয়েছে কী? চোখ ছল ছল করছে কেন? জ্বর আসছে নাকি?

—না।

মার তবু সংশয় যায় না।—না বললেই শুনব? যা বাঁদর ছেলে হয়েছে! সারা দুপুর খালি টো টো করে বেড়ানো, আর যত ছোটলোকের ছেলের সঙ্গে কাঁচা আম খাওয়া। আজ রাত্রে আর ভাত পাবে না।

রঞ্জু আস্তে আস্তে বললে, না মা, আমি দুপুরে বেরুব না, ওদের সঙ্গেও মিশব না।

মা হেসে ফেললেন: খুব সুবুদ্ধি হয়েছে দেখছি। ভাত বন্ধ করার নামেই বুঝি? আচ্ছা সে পরে দেখা যাবে, এখন হাত পা ধুয়ে পড়তে বোসো গে।

না:—রঞ্জু সত্যিই আর ওদের দলে নয়। ওরা সত্যই বদ ছেলে, খারাপ ছেলে।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখে মনসাতলায় মার্বেল খেলা চলছে। শব্দ উঠছে ঠকাস্ ঠকাস্। তেমনি উল্লসিত চিৎকার কানে আসে: উড্ড কিপ্, হাত ইস্টেট—অল্—ফিপ্‌টিন—টুয়েন্টি—

ভোনা ডাকে, রঞ্জু—রঞ্জু—উ—উ—

মন ছল ছল করে ওঠে—প্রতিজ্ঞা বুঝি আর টেঁকে না। কিন্তু নিজেকে সাম্‌লে নেয় রঞ্জু। তারপর দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিয়ে চলে আসে বাড়ির ভেতরে, খিড়কি দুয়োর পেরিয়ে এসে বসে নির্জন ছাইগাদাটার পাশে। নিজের নিঃসঙ্গতাটাকে কেমন ভালো লাগতে সুরু করেছে আজকাল। বাতাবী গাছের ছায়ায় বসে হলদে পাখির ডাক শোনে, নিজের মনে ব্যাঙের ছাতাগুলোকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে একটুকরো বাঁকারি কুড়িয়ে নিয়ে ওগুলোর তলায় খুঁড়ে খুঁড়ে খুঁজে দেখে রাজছত্রের নিচে সত্যি সত্যিই কোনো ব্যাঙ ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে কিনা!

তারপর আস্তে আস্তে এই নিঃসঙ্গতার ভেতর দিয়ে নিজের একটা নতুন রূপ আবিষ্কার করল। রঞ্জু দুপুরের রৌদ্রে আমবাগানের আড্ডাটা তাকে ডাকল না, ওই রৌদ্রটাই তাকে ইসারা পাঠালো। ঝয়াং ঝয়াং শব্দ করে যেদিকে কাটিহারের গাড়িগুলো চলে যায়, সন্ধ্যেবেলায় গাঁয়ের লোক শহরের কাজকর্ম শেষ করে জুতো হাতে করে যেদিকে জঙ্গলে ঘেরা মেঠো পথটা দিয়ে অদৃশ্য হয়, আশ্চর্য স্বরে ডাক দিয়ে যেদিকে উড়ে যায় হলদে পাখি—শহর ছাড়িয়ে সেই বুনো বিশৃঙ্খল অজানা রাস্তাটা রঞ্জুর নাড়ীতে একটা দুর্বার আকর্ষণ

জাগিয়ে তুলল।

রঞ্জু শুনেছে, ওই পথের শেষে, অনেক দূরে আছে কাঞ্চন নদী। বৃষ্টিধোয়া ভিজে আকাশের মতো ছলছলে নীল তার জলের রঙ, তার পাঁচ হাত নিচে নুড়িগুলোকে পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তার দুধারে অনেক দূর অবধি শাদা বালি ঝক ঝক করছে, সেই মিহি মখমলের মতো নরম বালির ওপরে বক আর কাদাখোঁচার পায়ের ছাপে যেন আল্‌পনা আঁকা। অজস্র বইচির বন সেখানে ফলে ফলে একেবারে ভেঙে পড়তে চায়। তার ওপর দিয়ে রেলের মস্ত বড় পুল—কেউ বলে এক মাইল, কেউ বলে আধ মাইল লম্বা।

ছোট নদী কাঞ্চন—নামটির মতোই মিষ্টি। তবু ওই নদীটাকে কেন্দ্র করে একটা অদ্ভুত ভয়ের সংস্কার আছে লোকের মনে। তার আশে পাশে বহুদূর জুড়ে একটা নির্জনতা থম থম করে। লোকে বলে কালী বাস করেন নদীর জলে। লোহার পুলটার ঠিক মাঝখানে—যেখানে বড় বড় থামগুলোকে পাক খেয়ে খেয়ে তীব্র বেগে পাহাড়ী নদীর জল গর্জন জাগিয়ে চলে যাচ্ছে, ওখানে নদীর মস্ত একটা দহ আছে। আর সময়ে-অসময়ে সেই দহ থেকে নাকি বিশালকায় একখানা কালীমূর্তি ভেসে ওঠে জলের ওপরে। লক লক করছে তার রক্তাক্ত দীর্ঘ জিহ্বা, তার হাতের খড়্গ থেকে তাজা রক্ত পড়ছে গড়িয়ে। অমন শান্ত নিস্তেজ নদী তাই প্রতি বছর দুটি একটি করে নরবলি দেয় দেবীর তৃপ্তির জন্যে, অতি সতর্ক সাঁতারুও কেমন করে যে নদীর জলে ডুবে মরে এ একটা আশ্চর্য রহস্য।

লোকে আরো বলে, এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে।

সে ইতিহাস পুরোনো—যখন এদিকে প্রথম রেলের লাইন হয় সেই তখনকার কাহিনী। তখন কাঞ্চন নদী এমন করে মরে যায় নি। তার স্রোত ছিল প্রচণ্ড, তার গর্জন ছিল ভয়ঙ্কর। হাজার হাজার মণ পাথর ঢেলেও কোম্পানি নদীকে কাবু করতে পারল না। স্রোতের মুখে কুটো পড়লে যেমন করে উড়ে যায়, ঠিক তেম্‌নিভাবেই রাশি রাশি পাথর কোথায় যে ভেসে যেতে লাগল তার আর ঠিক ঠিকানাই নেই।

তখনকার দিনে ইংরেজ এমন ম্লেচ্ছ ছিলনা, তাদের দেব-দ্বিজে ভক্তি ছিল বলে শোনা যায়। তাই সাহেব এঞ্জিনিয়ার স্বপ্ন দেখলেন, রাত্রির কালো জলের ওপর অতিকায় একটা কালীমূর্তি পোভা পাচ্ছে। সে মূর্তি সাহেবকে ডাক দিয়ে বললে, আমার পূজো দাও, তাহলে পুল বাঁধতে পারবে। সাহেব প্রণাম করে বললে, আচ্ছা মা তাই হবে, তোমার পূজো দেব।

পূজোর আয়োজন হল। পুরুত এলেন, পাঁঠা বলি হল। কিন্তু অমন জাগ্রৎ দেবতা, তিনি মেটে আর মেঠোকালীর মতো শুধু পাঁঠার মুড়ো চিবিয়েই খুশি থাকলেন না। নিজের প্রাপ্যটা নিজের হাতেই যথাসময়ে আদায় করে নিলেন তিনি।

ঘটনাটা ঘটল এরই দিনকয়েক পরে। জলের ভেতরে কুলিরা মস্ত বড় একটা লোহার ফাঁপা চোঙ্ বসাচ্ছিল, ওই চোঙ্টার ভেতর দিয়ে তারা পিলারের গাঁথ্নি তুলবে। সব ঠিক আছে, দিব্যি সাফসুফ কাজ চলছে—এমন সময় কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল, অতএব চোঙটা দেখতে দেখতে ঠিক দুমিনিটের মধ্যে যেন চোরাবালির টানে নিশ্চিহ্ন হয়ে অতলে মিলিয়ে গেল, আর সেই সঙ্গে পনেরো ষোলজন কুলিরও কেউ সন্ধান পেলনা। সার্থক হল রক্তলোলুপা দেবীর পূজো।

তার পরে বিনা বাধায় পুল গড়ে উঠল। মস্ত বড় লোহার পুল। কেউ বলে আধমাইল, কেউ বলে, তার বেশি আবার কেউ বলে পুরো এক মাইলের কম নয়। ঝম ঝম করে ওর ওপর দিয়ে রেলগাড়ি বেরিয়ে যায়, যাত্রীরা নিশ্চিন্তে গলা বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখে, কেউ ঘুমোয়, কেউ তাস-পাশা খেলে। এ পুলের ইতিহাস তারা জানেনা।

কিন্তু সেই যে শুরু—সেই থেকেই ধারাটা চলে আসছে। প্রতি বছর কালী তার নিয়মিত বলি আদায় করে নেন। দলবল না থাকলে লোক নদীতে স্নান করতে নামে না, একা একা দুপুরে সন্ধ্যায় নদীর কাছে যেতে ভয় পায় তারা। নির্জন বালির চর আর বৈঁচিবন নিয়ে কলচঞ্চলা ধারায় বয়ে যায় রহস্যময়ী কাঞ্চন।

ছেলেবেলায় আত্রাইকে দেখেছে রঞ্জু, দেখেছে তিরিশ সালে ক্ষ্যাপা নদীর সেই বানের দৃশ্য। তার রক্তের ভেতরে আমের জামের ছায়ায় ঘেরা সেই নদীর সুর আছে, সেই জলের গান বাজে উল্লসিত ছন্দে। রঞ্জু জলকে ভালোবাসে, নদীকে ভালোবাসে। তাই ভয়ের জাল দিয়ে ঘেরা এই বিচিত্রস্রোতা কাঞ্চনও তাকে ডাক দিলে।

একদিন দুপুরে যখন আবার তেম্নি করে ডাক দিয়ে গেল একটা হলদে পাখি, উড়ে গেল পশ্চিমের দিকে, তখন রঞ্জু আর থাকতে পারলনা। অবিনাশবাবু সেই নিশির ডাকের মতো কেমন বিহ্বল হয়ে গেল সে—ছায়ায় ঘেরা বাতাবী লেবু গাছের নিচেকার আসনটি ছেড়ে সে উঠে দাঁড়ালো।

ধুলোয় ভরা পথটা দিয়ে খানিকটা যখন এগিয়েছে, এমন সময় পেছন থেকে শোনা গেল খাঁদুর ডাক।

—রঞ্জু, এই রঞ্জু ?

রঞ্জু থেমে দাঁড়ালো।

—ও'দিকে কোথায় যাচ্ছিস ?

রঞ্জু আর জবাব দিলে না, নীরবে এগিয়ে চলল।

পেছন থেকে ঠাট্টা করে উঠল খাঁদু: ইস, বড্ড ভালো ছেলে হয়েছেন। আমাদের সঙ্গে আর কথাই বলবেন না!

রঞ্জু চলতে লাগল। এ ধরণের পথ তার অচেনা নয়, এর সঙ্গে তার শৈশবের নাঙ্গীপুর একাকার হয়ে গেছে। এ শহর মুকুন্দপুর নয়, এখানে দোতলা-তেতলা বাড়ি নেই, এখানে বাঁধানো রাস্তা নেই, এখানে পথের পাশে পাশে সরকারী আলো জ্বলেনা। এখানে বন-জঙ্গল, আমের বাগান, খড়ের চাল দেওয়া ছোট ছোট কুটির। রঞ্জুর মনে হারানো দিনগুলোর নেশা লাগল, বহুদিনের ভুলে যাওয়া মাটির ছোঁয়া লেগে সর্বাঙ্গ যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তার।

রেল লাইন পাশে রেখে রঞ্জু চলল। বেশ লাগে অজানা পথ দিয়ে চলতে, অদ্ভুত মোহ জাগে একটা। মনের ভেতর হারিয়ে যাওয়ার কেমন একটা নেশা আছে লুকিয়ে। যা চেনা সে তো চিরদিনই চেনা। তার ভেতরে বিস্ময় নেই, তার মধ্যে এমন কিছু নেই যাকে দেখে তুমি বলতে পারো এ আমার— এ একান্তই আমার। এই শহর, এই বাড়ি ঘর, ওই ল্যাম্পপোস্টগুলো, আমের বাগান, ভূপাল রায়ের প্রকাণ্ড পোড়ো বাড়ির পেছনে মজা পুকুর আর আদ্যিকালের সেই অতিকায় জাম গাছটা—এদের ওপরে নিজস্ব কোন দাবী নেই রঞ্জুর। এ ভোনার, এ খাঁদুর—এ আর সকলের। কিন্তু এই পথটা— যা শহরের সীমা ছাড়িয়ে জংলা বাগান, বিলাতী পাকুড়ের বন আর উঁচু নিচু অসমতলের মধ্য দিয়ে হারিয়ে গেছে, এ পথে আফ্রিকার দুর্গমের ভেতর দিয়ে অভিযানের মতো বিচিত্র আস্বাদন আছে একটা। হয়তো কোনো নতুন ফুল চোখে পড়বে, যা পৃথিবীর আর কেউ কোনোদিন দেখেনি; কোনো নতুন পাখি—যে পাখি দূর মেঘলোকের ওপারে মেঘমালার পুরীর রূপোর দাঁড় আর সোনার শেকল কেটে বেরিয়ে এসেছে। এখানে যা দেখবে সব একান্তভাবে তোমার—যা পাবে সব তোমার নিজস্ব। এ পথচলা নয়, এ আবিষ্কার।

চলতে চলতে—বাঃ এই কি কাঞ্চন! এই কি সেই ভয়ে থম্‌থম্‌ করা আশ্চর্য নদী!

কিন্তু রঞ্জুর ভয় করল না, ছমছম করে উঠল না শরীর। আবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। দুপুরের রোদে অনেকটা জুড়ে ধবধবে মিহি বালি রুপোর মতো ঝিকমিক করছে, তার ওপরে দেখা যায় এক ফালি নীল জল। এত শান্ত, এত মৃদু যে স্রোত বইছে কিনা সন্দেহ। একটু দূরে রেলের পুলটা টানা রয়েছে, তার বারো আনিই শুকনো বালিডাঙার ওপর দিয়ে। সব স্বাভাবিক, সব সহজ। অল্প অল্প বাতাস দিচ্ছে, দুটি চারটি করে বালি উড়ছে, ছোটো-খাটো দু একটা বালির ঘূর্ণি ঘুরপাক খাচ্ছে। ডেকে ডেকে জলের ওপরে ঘুরছে মাছরাঙা। এ নদী ভয় জাগায় না, নেশা ধরায়।

গরম বালির ওপর দিয়ে জলের দিকে চলল রঞ্জু। পায়ের নিচে যেন ফোশ্‌কা পড়ে যাচ্ছে এম্‌নি মনে হয়। কিন্তু তবু খারাপ লাগছে না। এগিয়ে এসে জলের কাছে বসল। বসল ভিজে ভিজে নরম বালির ওপরে, জলের ভেতরে পা ডুবিয়ে। পায়ের ওপর দিয়ে তির্‌ তির্‌ করে স্রোত বয়ে যেতে লাগল, শির শির করতে লাগল শরীর। কী চমৎকার ঠাণ্ডা জলটা! বসে বসে রঞ্জু দেখতে লাগল কেমন করে এক একটা ছোটো রুপোলি মাছ জলের ওপরে অকারণ আনন্দে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে, আর কেমন করে মাছরাঙারা মাথা নিচু করে তাদের ওপরে তীরের মতো পড়ছে ছোঁ দিয়ে।

হঠাৎ ভয়ঙ্কর চমক লাগল একটা। পেছন থেকে মৃদু গলায় কে ডেকেছে,

রঞ্জুর মুখ দিয়ে ভয়-বিহ্বল একটা স্বর বেরুল আপনা থেকেই: মা কালী! কিন্তু পেছন ফিরে তাকাতে আর সাহস হল না—ভয়ে হাত পা পাথর হয়ে আসতে চাইছে।

যে পিছন থেকে ডাক দিয়েছিল, ডেকেছিল সে এবার মিষ্টি গলায় খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে উঠল।

—মা কালী কি রে! এখানে বসে তুই কালী-সাধনা করছিস নাকি?

স্বরটা চেনা। লজ্জিত হয়ে চোখ ফেরাতেই দেখা গেল তাদের পাড়ারই ছেলে। পরিমল।

—পরিমল—তুই!

—হ্যাঁ আমি। ভূত নই

—তুই এখানে কেন?

—সে কথা পরে হবে। কিন্তু তার আগে তোকেই ওই কথাটা জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম।

—আমি—রঞ্জু ঢোঁক গিলল একবার: আমি এখানে বেড়াতে এসেছিলাম।

পরিমল আবার হেসে উঠল। তার পর রঞ্জুর পাশেই বালির ওপরে বসে পড়ে বললে, তাই বলে এই দুপুর রোদে! বেড়াবার আর সময় পেলি না নাকি।

রঞ্জু জবাব দিলে না।

তরল গলায় পরিমল বলে চলল, এখানে ভয় আছে, তুই জানিস?

—জানি।

—তবু আসতে ভয় করল না?

—না।

—না কেন?

—এখানে তো ভূত নেই, মা কালী আছে। দেবতাকে কেন ভয় করব?

পরিমল আরো জোরে হেসে উঠল। স্বচ্ছ উজ্জ্বল হাসি—এত সহজে ছেলেটা এমন করে হাসতে পারে—আশ্চর্য! বললে, সব গাঁজা, ও সব বিশ্বাস করিস কেন?

—বাঃ, দেবতা বিশ্বাস করব না?

—কচু! দেবতা থাকলে তো?

—কী যা তা বলছ সব। এই নদীতে মা কালী আছে।

—তোমার মুণ্ডু আছেন!—পরিমল একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলে: আমি তো সময়ে অসময়ে প্রায়ই আসি এখানে। কোনোদিন কোনো কালী-ফালীর টিকির ডগাটিও দেখতে পাইনি। কালী যদি কোথাও থাকে তবে মন্দিরে আছে, এখানে নদীতে ডুবে মরতে আসবে কোন্ দুঃখে?

কী ভয়ঙ্কর কথা! এমন কথা মুখ দিয়েও উচ্চারণ করতে আছে নাকি! অবাক বিস্ময়ে রঞ্জু তাকিয়ে রইল পরিমলের দিকে। পরিমল হাসছে, কিন্তু জোরে নয়। মুচ্‌কি মুচ্‌কি দুষ্টুমির হাসি।

—তুই তো সাংঘাতিক ছেলে পরিমল।

—সেই জন্যেই তো তোদের ভোনা অ্যাণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে আমার বনিবনা হয় না।

কথাটা ঠিক। মনসাতলার ছেলে হয়েও পাড়ার কারো সঙ্গে খুব সম্প্রীতি

নেই পরিমলের। মাঝে মাঝে আগে মার্বেল খেলতে আসত, কিন্তু এত খারাপ খেলত যে পাঁচ মিনিট পরেই ভোনা তার সব মার্বেলগুলো পকেটস্থ করে ফেলত। সেজন্তে কোনোদিন ক্ষোভ করেনি, মুখ কালো করেনি একটুও। তা ছাড়া পাড়ার দলবলের সঙ্গে মেশামেশি একেবারেই নেই তার। তার বাবা শহরের বড় উকিল। মস্ত বাগান-বাড়ি তাদের। সে বাগানে হরিণ আছে, ময়ূর চরে। বিকেলে দেখা যায় পরিমল আর তার বোন সেই বাগানে হরিণের পেছনে ছুটো-ছুটি করে বেড়ায়।

ভোনা মুখ ভেংচে তার অভ্যস্ত রীতিতে বলেছে, ওরা বড়লোক, অহঙ্কারে একেবারে চারখানা হয়ে ফেটে পড়েছে। আমাদের সঙ্গে মিশবে কেন?

রঞ্জুরও তাই ধারণা ছিল। সত্যিই কোথায় যেন একটা বৈশিষ্ট্য আছে পরিমলের, আছে স্বাতন্ত্র্যের একটা সীমারেখা—যে রেখা ওরা কখনো অতিক্রম করতে পারে না। বয়সের তুলনায় পরিমল একটু বেশি লম্বা—সুন্দর সুগঠিত শরীর, ভোনার একেবারে বিপরীত। টকটকে ফর্সা রঙ, আর রঙটা অত ফর্সা বলেই মাথার চুলগুলো কেমন লালচে, চোখের তার দুটো কপিশবর্ণ। কথা বলার চাইতে হাসে বেশি, আর যখন হাসেনা তখনও চোখ দুটো যেন হাসিতে জ্বল জ্বল করতে থাকে তার। সে বড়লোক—এই অপরাধে ভোনা অবশ্য সুযোগ পেলেই তাকে বাঁকা বাঁকা কথা শুনিয়া দেয়। কিন্তু পরিমল ভ্রূক্ষেপ করে না—যেন এই সব তুচ্ছতাকে অবহেলা করবার কতো সহজাত কবচকুণ্ডল নিয়েই সে জন্মেছে। তাই পরিমল পাড়ার ছেলে হয়েও পাড়ার সকলের থেকে আলাদা।

এই সময়টুকুর ভেতরে এক সঙ্গে এতোগুলো কথা ভেবে নিলে রঞ্জু।

—কিন্তু তুই এখন এখানে কেন পরিমল?

পরিমল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, সে কথা আজ বলব না।

—কেন?

—সময় হয়নি।

—কিসের সময়?

—সব কথা বলবার।

—কী এমন কথা? রঞ্জুর যেমন বিস্ময়, তেম্‌নি কৌতূহল বোধ হল।

প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেল পরিমল। বললে, আর এখানে বসে রোদে চাঁদি পুড়িয়ে লাভ নেই রঞ্জু। বাড়ির দিকে যাবি তো চল।

নীরবে রঞ্জুও উঠে দাঁড়ালো। পরিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে নতুন কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করল না। শুধু তখন মনে হল, পরিমল এমন একটা জগতে বাস করেছে যা তার পরিচিত পরিবেশের চাইতে বহুদূরে— যে জগতের দরজা আজও তার কাছে অবরুদ্ধ…

কিন্তু ভোনাকে এড়াবার ইচ্ছে থাকলেও বেশিদিন তাকে এড়ানো গেল না।

গোষ্ঠাষ্টমী তিথি। এই দিনে শ্রীকৃষ্ণ প্রথম গোচরণে গিয়েছিলেন, তাই একে উপলক্ষ করে ইস্কুলের হেড্ মাস্টারেরা গোচারণ বন্ধ করে দিলেন। একটার সময় ঢন্ ঢন্ করে ছুটির ঘণ্টা বাজাতেই ছেলের দল হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়ল।

অন্যমনস্কভাবে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে সে, কোত্থেকে ভোনা এসে পাকড়াও করলে।

—কি রে, খুব মাতব্বর হয়ে গেছিস যে। আজকাল তো তোকে দেখতেই পাওয়া যায় না।

—ছাড়ো, বাড়ি যাব।

—বাড়ি যাবি! ওঃ—একেবারে গুড্ বয়—বাড়ি গিয়ে দুধ-ভাত খাবে। নেঃ—অত ভালো ছেলে হতে হবে না। চল, মেলায় চল।

—মেলায়?

—হ্যাঁ—গোষ্ঠের মেলায়! অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কি রে? আমরা সবাই যাচ্ছি, চল।

রঞ্জু বিব্রত হয়ে বললে, তা হলে বাড়ি থেকে মা-কে বলে আসি।

—কথা শোনো—এর জন্যে আবার মা-কে বলতে হবে। রাখ, রাখ—অত ভালো ছেলে না হলেও চলবে। চল, দল বেঁধে যাচ্ছি, সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসব।

গোষ্ঠের মেলা! মনটা প্রলুব্ধ হয়ে উঠল। গোষ্ঠের মেলার নাম শুনেছে সে, কিন্তু আজ পর্যন্ত যাবার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। শুনেছে, মস্ত বড় মেলা। নাগরদোলা আসে, টিনের বাক্সে বায়োস্কোপ আসে, নানা রঙের খেলনা আসে, আর আসে বড় বড় আড়াইসেরী কদমা। গত বছর মেলা-ফিরতি মানুষ দেখেছে রঞ্জু, মনে হয়েছে মস্ত বড় একটা উৎসবের আনন্দ থেকে ফাঁকি পড়ল সে— বাদ পড়ে গেল।

—খুব দেরী করবি না তো?

—না, না, তুই চল্ না। ভয় নেই, হারিয়ে যাবি না। আঁচল-চাপা ছেলেকে আবার মার কোলে ঠিক ফিরিয়ে এনে দেব—দেখে নিস।

কথাটা বলে গালের পাশ দিয়ে জিভ বার করে ভ্যাংচানোর ভঙ্গিতে অবজ্ঞার হাসি হাসলে ভোনা।

খাঁদু বাঁকা মন্তব্য করলে, কেন ওকে টানাটানি করছিস? বাড়িতে ওর দুধ-ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

আর একজন বললে, আমাদের সঙ্গে গেলে বাড়িতে ও পিট্টি খাবে!

হঠাৎ পৌরুষে ঘা লেগে গেল রঞ্জুর: বেশ তো, চল্ না। আমি কি কাউকে ভয় করি না কি? কণ্ঠস্বরটা এতক্ষণে বেশ তেজোদৃপ্ত শোনালো তার।

খুশি হয়ে ভোনা পিঠ চাপড়ে দিলে: সাবাস, এই তো চাই। এখন থেকেই মরদের মতো হয়ে উঠতে হবে, বুঝলি? অত পুতুপুতু করলে কি চলে?

পরমোৎসাহে পায়ের তালি মারা চটি জোড়া ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভোনা চলতে সুরু করে দিলে। চলার তালে তালে হাতীর পায়ের মতো শব্দ উঠতে লাগল। তারপর বিকট ভঙ্গিতে যাত্রার দলের জুড়িদের মতো কানে হাত দিয়ে তারস্বরে থিয়েটার গান ধরলে একটা:

"কালো পাখীটা মোরে
কেন করে এত জ্বালা—আ—তন—"

ট্রি-প্যারির মতো সেইটেই মার্চিং সং। নেতাকে নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করে ছেলের দলও অগ্রসর হল।

গোষ্ঠের মেলা ঠিক শহরের মাঝখানে বসে না। বসে শহর থেকে প্রায় মাইল দেড়েক দূরে—সাহানগর বলে একটা গ্রামে। ইস্কুলের ওপারে রেলের লাইন, সেই রেলের লাইন পেরুলে মাঠ সুরু। ধান হয় না, পোড়ো পতিত জমি। মাঠ ছাড়িয়ে একটা মজা নদী, তার পাশে ভাগাড়—শকুন, গিন্নী শকুন, আর টেলিগ্রামের তারে তারে শঙ্খচিল। তারপরে বড় রাস্তা, বাগান, পুরানো আমলের সাহেবদের ভাঙা-চুরো একটা জংলা কবরখানা! বেশির ভাগ কবরের জীর্ণ দশা, মার্বেল ফলকের ওপরে লেখাগুলো কালো আর ঝাপ্সা হয়ে গেছে। শুধু শ্লেট পাথরের গায়ে একটা স্মারকলিপি জ্বল জ্বল করছে: 'পিটার হপ্কিন্স—জন্মিলা ১৯৩২ সনে, লাভ করিলা যীশুর শান্তিময় ক্রোড় ১১ই মার্চ ১৮৮৫ সনে'। সেই সঙ্গে একটুকরা কবিতার লাইন: "পিতার অপার প্রেম সকল সংসারে।"

এই কবরখানার ওপারেই সাহানগর গ্রাম। আর এখানে এসে পৌঁছুতেই

যেন বহুদূরে সমুদ্রের ডাক শুনতে পাওয়া গেল—মেলার কলরোল। অতীত মৃত্যুর শুষ্ক বিষণ্ণ রূপগুলোর দিকে তাকিয়ে রঞ্জুর মনটা যখন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল, তখন দূর থেকে ওই মেলার কলধ্বনি যেন হঠাৎ তাকে খুশি করে তুলল।

সারাটা পথ অজস্র বখামি করতে করতে এসেছে ভোনা। নানা সুরে নানা রকম গান গেয়েছে, মুখভঙ্গি করেছে, আগে আগে যে সমস্ত লোক মেলায় চলেছিল তাদের ভেংচিয়েছে এবং পা থেকে চটিজোড়াকে সব সময়ে দশ হাত করে এগিয়ে রেখেছে। একবার তার এক পাটি আর একজনের গায়ে লেগেছিল, সে ক্ষীণ প্রতিবাদ করতেই ভোনা দলবল নিয়ে একেবারে তেড়ে গেল। লোকটা বিড় বিড় করে বললে, অসভ্য বানরের দল।

ভোনা জবাব দিলে, তাই তো তোমায় ডাকি দাদা হনুমান!

সঙ্গে সঙ্গে দলের অন্য ছেলেরা সুর ধরল, দাদা হনুমান ওগো, দাদা হনুমান!

নিজের সম্মান রাখবার জন্যে লোকটা বাক্যব্যয় করলে না আর। বেগে পা চালিয়ে দিলে। পেছন থেকে খাঁদু ডাক দিয়ে বললে, রাগ করে চললে দাদা, নিতান্তই চললে? তা বাড়ি গিয়ে চারটি বেশি করে ভাত খেয়ো—কেমন?

রঞ্জুর এতক্ষণে অনুতাপ হচ্ছিল। ভারী বিশ্রী লাগছে, অত্যন্ত আত্মগ্লানি বোধ হচ্ছে। ঝোঁকের মাথায় এদের সঙ্গে এমনভাবে বেরিয়ে পড়ে মস্ত বড় ভুল করেছে সে। ওদিকে খাঁদু আর একটা বিড়ি ধরিয়েছে, পরমানন্দে মুখটাকে বিকৃতি করে ধোঁয়া ছাড়ছে। রঞ্জু ভয় করতে লাগল। যদি চেনা জানা কেউ দেখতে পায়, যদি বাড়ি গিয়ে বলে দেয়—তাহলে তার পরের অবস্থাটা কল্পনাও করা চলে না।

অন্যান্য পথচারীরা বাঁকা দৃষ্টিতে বারেবারে তাকাচ্ছে এদের দিকে। এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে এই দলটির ওপরে কেউই বিশেষ প্রসন্ন নয়। একজন তো পরিষ্কার বললে, এই বয়সেই বিড়ি সিগারেট ধরেছে, কী চমৎকার ছেলে তৈরী হচ্ছে সব!

ঝাড়াং করে হাবুল জবাব দিলে, খাইতো খাই, কারুর বাপের পয়সায় খাই?

সঙ্গে সঙ্গে ভোনা সুর করে করে 'অঙ্গদের রায়বার' বলতে সুরু করলে:
"মোর বাপ কি তোর বাপকে বেঁধেছিল ল্যাজে?"

খাঁদু আরো একটু রসাল দিলে: "এতগুলি রাবণ মধ্যে কোন্‌টি তোমার পিতা?"

যে মন্তব্য করেছিল সে চুপ হয়ে গেল।

সমস্ত পথটা যেন যমযন্ত্রণার মতো মনে হচ্ছিল রঞ্জুর। এক একবার ভাবছিল ফিরে চলে যায়, কিন্তু তখন আর ফেরবার পথ নেই। এরই মধ্যে খাঁদু আবার জিজ্ঞাসা করেছিল, এই, বিড়ি খাবি ?

—না।

—না, না। কেউ টের পাবে না।

—না ভাই।

—ওঃ—একেবারে ভালো ছেলে !

ভোনা ইংরেজি করে ছড়া কাটলে :

Jim is a good dog
Everyday he catches a frog—

ছেলের দল হো হো করে হেসে উঠল।

কিন্তু কবরখানা ছাড়াতেই যখন মেলার কোলাহলটা কানে গেল তখন উৎকর্ণ হয়ে উঠল রঞ্জু। সমুদ্রের ডাক—অজানা, অপরিচয়ের দূরসমুদ্র। বিস্ময়ের আর অন্ত নেই সেখানে। সেখানে নাগরদোলা ঘুরছে, সেখানে টিনের বাক্সে বায়োস্কোপ, সেখানে চারপেয়ে মানুষ আর ছ'পেয়ে গোরু, সেখানে রঙীন বেলুন আর আড়াইসেরী কদমা। এতটা পথ ভাঙা এতক্ষণে সার্থক হয়েছে।

দলটা মেলায় এসে ঢুকল। সত্যিই মস্ত বড় মেলা। নতুন একটা শহর দেখেছে রঞ্জু—দেখেছে অনেক মানুষ, কিন্তু একসঙ্গে এত মানুষকে সে আর কোনোদিন দেখেনি। অবাক হয়ে রইল খানিকক্ষণ।

ভোনা হ্যাঁচ্‌কা টান দিলে একটা। বললে, অমন বাঙালের মতো হাঁ করে আছিস কী ? চলে আয়। মেলায় কেনাকাটা করতে হবে না ?

—কেনাকাটা ! কিন্তু বাড়ি থেকে তো পয়সা আনিনি।

—দূর গাধা !—ভোনা জিভ্‌ বের করে চোখ উল্‌টে ভঙ্গি করলে একটা : মেলায় জিনিস কিনতে এলে আবার পয়সা লাগে নাকি ?

—পয়সা লাগে না ?—এ একটা নতুন খবর শোনা গেল যা হোক। রঞ্জু আশ্চর্য হয়ে বললে, পয়সা লাগে না ? তা হলে বিনি-পয়সায় দেয় নাকি ?

—হুঁঃ—বিনি-পয়সায় দেবে ? তোর শ্বশুর কিনা সব। ভোনা এবার সত্যি সত্যি ভেংচে দিলে।

—তা হলে কিনবি কী করে ?

—হাতের জোরে।

—হাতের জোরে ? সে আবার কী ?

—আঃ—এই বাঙালকে নিয়ে তো ভারী জ্বালাতনে পড়লাম। চলে আয় না, দেখতেই পাবি সব—ভোনা টেনে নিয়ে চলল রঞ্জুকে।

বেশি দূর যেতে হল না—সামনেই একটা বড় মনিহারী দোকান। তালা চাবি, ছুরি কাঁচি থেকে সুরু করে সাবান তেল, স্প্রিংয়ের মোটর, চুলের রেশমি ফিতে, জাপানী পুতুল—সব কিছুর বিপুল সমারোহ। দোকানে ভয়ঙ্কর ভিড়। দু'তিনজন লোক একসঙ্গে জোগান দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

ভোনা বললে, চল, এইখানেই দেখা যাক।

দোকানের সামনে ভোনা বসল তার দলবল দিয়ে। এটা ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে আর দর জিজ্ঞাসা করে।

—এই সাবানটা কত?

—তিন আনা।

—ছয় পয়সায় হবে না?

—না।

—ওই রেলগাড়ির দাম কত?

—বারো আনা।

—ছয় আনায় দেবেন?

—না।

—সাড়ে ছ'আনা?

—কেন অকারণে বকাচ্ছ খোকা? নিতে হয় নাও, নইলে চলে যাও।

—খালি খালি খদ্দেরকে অপমান করলেন মশাই? চাই না আপনার দোকানে কিনতে। চল্ থাণ্ডু—একটা বীরত্বসূচক ভঙ্গি করে ভোনা উঠে দাঁড়ালো।

দোকানদার বললে, যত সব বখাটে ছোকরা!

ভোনা শাসিয়ে উঠল: শাট্ আপ্! আপনি আমাদের গার্জেন নন।

দোকানদার বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

পর পর পাঁচসাতখানা দোকান। একটা জিনিসও কিনল না ভোনা, খালি দরাদরি করলে, দোকানদারের সঙ্গে ঝগড়া করলে। রঞ্জুর একেবারেই ভালো লাগছিল না; লজ্জায় অপমানে তার মাথা যেন মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। এরা সবাই তো তাকে ওদের মতোই বখাটে ভাবছে! তবু

দলের সঙ্গে ঘুরছিল যন্ত্রের মতো। আর ভাবছিল বাড়ি গিয়ে মা-র কাছে কী কৈফিয়ৎ দেওয়া যায়?

খানিক পরে ভোনাও বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে উঠল। বললে, আর নয় খাঁদু, কী বলিস?

খাঁদু বললে, হ্যাঁ—মন্দ হয়নি।

মেলার ভিড়টা ছাড়িয়ে দলটা এবারে চলে এল একেবারে গো-হাটার কাছে। এখানে লোক পাতলা, কয়েকটা ছোট ছোট চালার নীচে জনকয়েক লোক গোরু নিয়ে দরাদরি করছে। দাঁত পরীক্ষা করছে, শিং দেখছে। গোবর আর ধুলোর একটা মিশ্রিত গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

এইখানে একটা বড় বট গাছের ছায়ার নিচে ওরা এসে বসল। ভোনা বললে, নে এবার বার কর সব।

সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল ওদের পকেট থেকে বেরিয়ে আসছে ছুরি, সাবান, স্নো, চুলের ফিতে, এমন কি একরাশ খেলনা পর্যন্ত। সব একসঙ্গে জড়ো করা হল। রঞ্জু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না—যেন স্বপ্ন দেখছে সে।

চোখ টিপে জিভ বার করে হাসল ভোনা।

—কেমন পরিষ্কার হাতের কাজ দেখলি তো? কোনো ব্যাটা টের পায়নি।

রঞ্জুর শরীর প্রবল একটা ঝাঁকানি দিয়ে থর থর করে কেঁপে উঠল, গায়ের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। গলা থেকে অবরুদ্ধ আর্তনাদের মতো একটা স্বর বেরুল: তোমরা চুরি করেছ?

—আঃ গাধা, এমন করে চেঁচাস না! এ চুরি নয়, এর নাম হাতসাফাই। তুই একটা হাঁদা গঙ্গারামের মতো দাঁড়িয়েছিলি বটে, কিন্তু তোরও ভাগ আছে। নে খাঁদু, হিসেব কর—

রঞ্জুর এবার বাক্‌শক্তি পর্যন্ত যেন লোপ পেয়ে গেছে। ক্রমাগত মনে হচ্ছে কে যেন প্রাণপণ বলে তার জিভটাকে টেনে ধরছে গলার ভেতর। একটা অপরিসীম ভয়ে চারদিকের পৃথিবীটা তার কাছে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে—যেন অসময়ে শীতের গাঢ় কুয়াশা এসেছে ঘনিয়ে।

—সাত—

গোষ্ঠের মেলা থেকে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

বাড়ির সামনে অনেকক্ষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইল রঞ্জু। ভেতরে ঢুকবে কিনা বুঝতে পারছে না। পা কাঁপছে তার, বুকের ভেতরে হাতুড়ি পড়বার মতো একটা অবিচ্ছিন্ন আর অস্বস্তিকর অনুভূতি। তীব্র তৃষ্ণায় তালুর শেষ পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে, ঢোঁক গিলতে গেলেও যেন গলার ভেতরে খচ খচ করে কাঁটার মতো বিঁধছে।

জামার পকেটে খস খস করছে একখানা সাবান আর একটা সুতোর গুটি। আজকের লুটের মাল, ভোনা ঠকায়নি, ভাগ দিয়েছে। পথে আসতে আসতে যতবার একটা চৌকিদার আর পাহারাওয়ালার মুখ চোখে পড়েছে তার, ততবার চমকে চমকে উঠেছে হৃৎপিণ্ডটা। চুরির অংশ নিয়েছে সে—সে চোর! আর সেই অপরাধের স্বাক্ষর আঁকা রয়েছে তার মুখে, জ্বল জ্বল করছে, ঝকমক করছে। যে দেখবে সেই মুহূর্তের মধ্যে চিনতে পারবে—সে চোর।

বাতাসে দুটো চুল মুখে এসে উড়ে পড়তেই অকারণে শিউরে উঠল রঞ্জু। মনে পড়ল একবার একটা অদ্ভুত আর বিশ্রী পোকা দেখেছিল সে। পোকাটা বারান্দার ওপর দিয়ে কিলবিল করে চলে যাচ্ছিল, আর চলার সঙ্গে সঙ্গে এঁকে যাচ্ছিল আলোর একটা নীলাভ উজ্জ্বল রেখা। মনে হল তার কপালের ওপরে ওই রকম একটা কুৎসিৎ পোকা যেন নড়ে বেড়াচ্ছে, আর ক্লেদাক্ত উজ্জ্বল হরফে সেখানে লেখা হয়ে যাচ্ছে: চোর—চোর—

পকেট থেকে সাবান আর গুলিসুতোর গুটিটা সে বের করে আনল, তারপর সোজা ছুঁড়ে ফেলে দিলে পাশের অন্ধকার বাগানটার ভেতরে। এইবারে সে নিশ্চিন্ত—এইবারে মনের ওপর থেকে ভারটা নেমে গেছে তার। শুধু চুরি করে আনা সাবানটার একটা উগ্র মিষ্টি গন্ধ অনেকক্ষণ ধরে জেগে রইল তার দুটি আঙুলে, জুড়ে রইল তার জামার পকেটটাতে।

জীবনে অনেক মিষ্টি গন্ধের পেছনেই ওই চুরি আর অপরাধের ইতিহাস—এ অভিজ্ঞতার সময় তখনো তার আসেনি।

খাতার পাতায় হিসেবটা আবার গোলমাল হয়ে যায়। ছিঁড়ে যাচ্ছে ধারাবাহিকতা—পেছনের কালো পর্দার ওপরে ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইডের

মতো এলোমেলো ছবি ফুটে উঠছে। কত চেনা পথ, কত ঘর-বাড়ি, কত আশ্চর্য ঘটনা, আজকে নিশ্চিন্তভাবে ভুলে গেছে রঞ্জু, কেউ মনে করিয়ে দিলেও মনে পড়ে না। কিন্তু করে—কোন ছেলেবেলায় নীল রঙের একটা ছোট পাখি এসে ওদের জানালার ওপরে বসেছিল; ছোট ঘাড়টি বাড়িয়ে কৌতূহলভরা উজ্জ্বল দৃষ্টিতে রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল এক মুহূর্ত, তারপর লাল ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করে একটা ছোট্ট মিষ্টি ডাক দিয়ে আবার উড়ে চলে গিয়েছিল—পরিষ্কার মনে আছে সেটা। পাখিটার স্বচ্ছন্দ বসবার ভঙ্গি, তার সবুজ চোখে দুষ্টুমি-ভরা জিজ্ঞাসা—এ ভোলবার নয়, কোনোদিন ভুলবে না রঞ্জু।

গোষ্ঠের মেলা ফেরবার কতদিন পরে? তিন মাস? দু মাস? দু সপ্তাহ? আরো কী ঘটেছিল এই সময়ের মধ্যে? এই চুরির প্রতিক্রিয়া কতদিন মনটাকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল? হিসেব মেলে না। সমস্ত হিসেব তলিয়ে যায় বজ্রের মতো আকাশ-ফাটানো উন্মত্ত গর্জনে।

—"বন্দে মাতরম্—"

—"মহাত্মা গান্ধী কী জয়—"

উনিশ শো তিরিশ সাল।

উত্তরাপথের গিরিদুর্গ আর দক্ষিণের নীল সমুদ্র উন্মথিত করে উচ্চারিত হল সংকল্প বাক্য:

"আজ আমরা সংকল্প লইতেছি, ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত আমরা নিরস্ত হইব না। কিন্তু এই স্বাধীনতা আনিতে হইবে সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়া, পরিপূর্ণ অহিংসার সহায়তায়। আমরা বিদেশী বয়কট করিব, আত্মঘাতী মাদকদ্রব্য বর্জন করিব, অন্যায় লবণ করকে অস্বীকার করিয়া স্বহস্তে লবণ তৈরী করিব—"

মহাত্মা গান্ধী! দিকে দিকে রুদ্রধ্বনিতে বাজতে লাগল ওই একটি নাম। যাত্রা করলেন বে-আইনি লবণ সত্যাগ্রহের নির্ভীক অভিযানে। সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ স্পর্ধার উত্তরে শান্ত কণ্ঠে তিনি জবাব দিলেন: "মেরা এক কদম্‌সে সারে হিন্দোস্তান উথাল্ পাথাল্ হো জায়গা—"

ওই একটি কথায় অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ চক্ষের পলকে ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে—দাবানল জ্বলল পাঞ্জাব-সিন্ধু থেকে উৎকল বঙ্গ পর্যন্ত, আগুন ধরল ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের বুকের পাঁজরে। হিন্দুস্থান উথাল্-পাথাল্ হয়ে উঠল।

উনিশ শো তিরিশ সাল।

সে কি ভোলবার দিন। ঘরে ঘরে উড়তে লাগল ত্রিবর্ণ পতাকা, পড়শীর ঘর ঘর মুখর হয়ে উঠল চরকার ঘর্ঘরে, হাতে হাতে ঘুরতে লাগল তকলি। স্বাবলম্বী হও—নিজেরে হাতে মিটিয়ে নাও নিজের প্রয়োজন, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় দেবতার প্রসাদী ফুলের মতো হাসিমুখে মাথায় তুলে নাও। কণ্ঠরোধ করে দাও ল্যাঙ্কাসায়ার আর ম্যাঞ্চেস্টারের, অবসান ঘটিয়ে দাও শৌখীন বিলাতী পরমুখা-পেক্ষিতার। অপমানের লজ্জায় জর্জরিত পরের সজ্জা দূর করে দিয়ে দেশমাতার দেওয়া উত্তরীয়-উষ্ণীষ পরে শুচি হও, কৃতার্থ হয়ে ওঠো।

রাস্তার মোড় থেকে বিলিতী কাপড়ের স্তূপ পুড়ছে। রঞ্জু একদিন বাবাকে দেখেছিল এমনি করে কাপড় পোড়াতে, কিন্তু সেদিন যা ছিল একান্ত ব্যক্তিগত একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, আজ সমস্ত ভারতবর্ষ তাকে একটা পরম সত্য হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। সিগারেটের প্যাকেট পর্বতের আকারে জড়ো করে আগুন ধরানো হয়েছে, তার ধোঁয়াতে এক মাইল দূর থেকে কাশতে কাশতে দম আটকে আসছে লোকের। দিশিবিলিতী মদের বোতল চুরমার হয়ে গড়াচ্ছে রাস্তায়।

কী আশ্চর্য দিন—কী অপূর্ব সেদিনকার উন্মাদনা।

আর একটা তিরিশ সালের কথা মনে আছে রঞ্জুর। তেরশো তিরিশ সাল। ফেঁপে উঠেছিল আত্রাই—ভাসিয়ে নিয়েছিল মাঠ-ঘাট, গ্রাম-গ্রামান্তর। আজ উনিশ শো তিরিশ সালে আর এক বন্যা দেখল রঞ্জু। প্রকৃতির কূল ভাঙা বান নয়—বাঁধভাঙা জীবন-বন্যা। সে বন্যা উত্তরবঙ্গকে ভাসিয়েছিল, এ ভাসিয়ে দিলে সমস্ত ভারতবর্ষকে। মাঠ-ঘাট গ্রাম-গ্রামান্ত—কোনো কিছু বাকী রইল না।

ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এল ইস্কুল কলেজ থেকে, উকিল মোক্তারেরা বেরিয়ে এলেন আদালতের মোহ কাটিয়ে। ভয় নেই, দ্বিধা নেই, সংশয় নেই। স্বাধীনতা হীনতায় কেউ বেঁচে থাকতে চায় না। এখন ঊর্ধ্ব গগনে মাদল বেজেছে, নিচে ডাক দিয়েছে উতলা ধরণী, অরুণ প্রাতের তরুণ দলকে আর অপেক্ষা করলে চলবে না, বেরিয়ে পড়তে হবে। ডাক দিয়ে বলতে হবে "ঝাণ্ডা উঁচে রহে হামারা—"

সমস্ত দেশ, সমস্ত মানুষকে সেদিন পাগল করে দিয়েছিল নবজীবনের উন্মাদ ছন্দ! কোন্ নির্লজ্জ এক ধূমপায়ী মুসলমান বিড়িওয়ালার কাছে 'কাঁচি-মার্কা' সিগারেট চেয়েছিল, তেড়ে উত্তর এল : জুতি-মার্কা হ্যায়, খাও গে? একখানা বিলিতী কাপড়ের ওপরে খদ্দরের পাঞ্জাবী চড়িয়ে কে

যেন নাপিতের কাছে দাড়ি কামাতে গিয়েছিল, নাপিত তার আধখানা গাল কমিয়ে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দিয়েছিল। স্টেশনের সামান্য কুলি পর্যন্ত সাদা সাহেবের মাল তুলতে ঘৃণাবোধ করলে, বললে, "নেহি ছুঁয়েঙ্গে।"

সেদিন কেউ ঘরে থাকতে পারেনি, রঞ্জুও না।

বেশ পরিষ্কার মনে আছে। দশটা বাজতে না বাজতেই বাঁধা নিয়মে ভাত খেয়ে রওনা হয়েছিল ইস্কুলের দিকে। কিন্তু খানিকদূর এগোতেই বাধা পড়ে গেল। দলবল নিয়ে পথ আটকে দাঁড়ালো ভোনা।

হ্যাঁ—সেই ভোনা। সেই মার্বেল আর বাঘবন্দী চ্যাম্পিয়ান, হাত সাফাইয়ে বিশারদ, কুশ্রী কদর্য আলোচনায় মুখখোলা সেই ভোনা। আজ সম্পূর্ণ রূপান্তর হয়েছে তার। মাথায় খদ্দরের টুপি, বুকে ব্যাজ, হাতে পতাকা। শুধু ভোনা নয়, কালী, খাঁদু, পূর্ণ—সবাই।

—কোথায় যাচ্ছিস রঞ্জু?

—ইস্কুলে।

ভোনার দলের প্রত্যেকটি ছেলের মুখে ফুটে উঠল ঘৃণা আর অনুকম্পার রেখা।

—শেম্! শেম্!

—ধিক্।

—লজ্জা হয় না?

নেতার মতো উদাত্ত উদার ভঙ্গিতে ভোনা তুলে ধরল পতাকা: এখনো ইংরেজির মোহ? এখনো গোলামখানায় ঢুকতে চাস? ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

লজ্জায়, অপরাধবোধে সংকুচিত হয়ে উঠল রঞ্জু: কী করব তবে?

—আমাদের সঙ্গে চলে আয়।

—কোথায় যেতে হবে?

—ইস্কুলে পিকেটিং করতে।

ওরা রঞ্জুকে ডাকলে বটে কিন্তু রঞ্জুর জন্যে আর অপেক্ষা করলে না। মুহূর্তে ড্রিলের ভঙ্গিতে ভোনা অ্যাবাউট টার্ন করলে, সঙ্গে সঙ্গে দলের আর সবাই বিদ্যুৎবেগে পেছন ফিরে গেল। বেশ জোরে জোরে বার কয়েক পা ঠুকে ভোনা গান ধরলে:

"মেরে সোনেকি হিন্দুস্তান,
তু হামারা দিল্‌কা রোশ্‌নী
তু হামারা জান—"

তার পরেই গানের তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে গেল ওরা। উৎসাহে উল্লাসে ওদের চোখমুখ ঝলমল করছে, একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, একটা কঠিন সংকল্পের নির্ভুল ব্যঞ্জনা সঞ্চারিত হয়ে গেছে ওদের সর্বদেহে। উনিশ শো তিরিশ সালের স্পর্শমণির ছোঁয়া পেলে সোনা হয়ে গেছে অনেক আবর্জনা, মুছে গেছে অনেক গ্লানি, ধুয়ে নির্মল হয়ে গেছে যুগসঞ্চিত অনেক অপরাধের অপবাদ। রেল স্টেসনের কুলি আর মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙড় থেকে সুরু করে ভোনা, পূর্ণ, কালী, খাঁদু পর্যন্ত কিছু আর অবশিষ্ট নেই—কেউ বাদ নেই আর। বন্দেমাতরমের বীজমন্ত্র মুখের থেকে বুকে গিয়ে জমাট বেঁধেছে। গলা টিপে মুখকে তুমি বন্ধ করতে পারো, কিন্তু বুকের এই রক্তাক্ত মর্মলিপিকে মুছবে কে ?

রঞ্জু দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। চারদিকের রৌদ্র, গাছপালা, পথ, বাড়ি ঘর—কোনো কিছুর আজ যেন আলাদা কোনো রূপ নেই, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই কোনো রকমের। আজ সমস্ত কিছু এক রকম হয়ে গেছে,—ধরেছে একটিমাত্র রঙ—ত্রিবর্ণ পতাকার রঙ। আজ আকাশে বাতাসে ঝিম্ ঝিম্ রিম্ রিম্ করে একটা গম্ভীর মধুর সুরের রেশ অনুঝঙ্কৃত হচ্ছে : বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্—

স্মৃতির মধ্যে চমক দিয়ে উঠল একটি নাম : অবিনাশ বাবু! আজ এতদিন পরে রঞ্জু চিনতে পারল যেন অবিনাশ বাবুকে, যেন এতদিন পরে তার কাছে এই অবারিত রৌদ্রধারার মতো প্রত্যক্ষ আর দীপ্তোজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর প্রত্যেকটি কথা। একটা আকস্মিক আত্ম-চৈতন্যের বিস্ময় জেগে উঠল সে :

“স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে
এদেশ তোদের নয়—”

এই তো স্বদেশ—এতদিন পরে এই তো স্বদেশ তার সামনে এসে দাঁড়ালো। এই যমুনা, এই গঙ্গানদীর ওপর আজ থেকে আমাদেরই তো অধিকার। পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে তাদের বুকের ওপর দিয়ে জাহাজ আর বইবে না। আমরা জেগেছি, আমরা জাগব। আজ এই মুহূর্তটির জন্যে বেঁচে থাকা উচিত ছিল, তাঁর স্বপ্ন সার্থক হয়েছে।

রঞ্জু দুহাতে চোখদুটো রগড়ে নিলে একবার—যেন আর ঘুম ভেঙেছে। তারপর নিজের ভেতরে কিছু একটা নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত করে নিয়ে জোর পায়ে ইস্কুলের দিকে এগিয়ে গেল সে।

দূর থেকেই ঘন ঘন ধ্বনি উঠছে : বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্। বৈশাখী

বিকেলে ঈশান কোণ থেকে যেমন হু হু করে একটা উতরোল আর্তনাদের শব্দ তুলে বয়ে আসে কালো ঝড়, ঠিক তেমনি ভাবেই শোনা যাচ্ছে বন্দেমাতরম্—বন্দে—

ইস্কুলের সামনে প্রায় দুশো আড়াইশো ছাত্র। চারদিকের চারটে ফটক তারা আগলে রেখেছে, পাঁচ-সাতজন করে শুয়ে আছে ফটকের সামনে। যারা ঢুকতে চাও, তাদের মাড়িয়েই যেতে হবে তোমাদের। দুটি চারটি ভালো নিরীহ ছেলে বিপন্নের মতো এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ইচ্ছে আছে একটা সুযোগ পেলেই সাঁ করে ঢুকে যাবে ভেতরে। কিন্তু ওই সব গোবেচারী ভালো ছেলেদের ওপরে কড়া নজর আছে সকলের।

ওদের মধ্যে বদ্রী বলে একটা ছেলে কী করে ঢুকে পড়ল ইস্কুলের কম্পাউণ্ডের ভেতরে। আর ঢোকবামাত্র আর কোনো কথা নেই, ডাইনে বাঁয়ে লক্ষ্য না করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ইস্কুলের দিকে। পেছন থেকে শতকণ্ঠে ধিক্কার উঠল : শেম্—শেম্—

কে একজন বলতে যাচ্ছিল, একবার বেরিয়ে আসুক না ওখান থেকে। চিরকাল তো আর ইস্কুলে বসে অ্যালজাব্রা কষতে পারবে না। একবারটি বেরিয়েছে কি সঙ্গে সঙ্গে এক চাঁটিতে—

কিন্তু আক্রোশটা পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করবার আগেই আর একজন কেউ তাকে একটা থাবা দিয়ে চুপ করিয়ে দিলে। বললে, আমরা সত্যাগ্রহী—কোনো রকম ভায়োলেন্সের কথা আমাদের মুখে কেন, মনেও আসতে পারবে না।

একটু দূরেই ইস্কুল কম্পাউণ্ডের ভেতরে কালো স্যুট পরে দাঁড়িয়ে আছেন হেড্‌মাস্টার। তাঁর কালো মুখখানা আরো কালো হয়ে গেছে; চাপা আক্রোশে কোঁচকানো ভ্রূকুটো চোখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে—হঠাৎ একটা জোরালো আলো চোখে পড়লে যেমন অস্বস্তি বোধ হয়, সেই রকম। সত্যিই তো, বড্ড বেশি জোরালো আলো পড়েছে। সদ্য রায়সাহেব হয়েছেন হেড্‌মাস্টার—এ আলো তাঁর সহ্য হচ্ছে না। নতুন যুগের নতুন সূর্য উঠেছে ছেলেদের রক্তের ভেতরে, হাজার হাজার চোখে সে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। আর সূর্যকিরণের চেয়ে অতসী কাচের প্রতিফলন যে অনেক বেশি দুঃসহ একথাই বা কে অস্বীকার করবে।

বদ্রীর এই আকস্মিক সাফল্যে হেড্‌মাস্টার যেন অনুপ্রেরণা পেলেন একটা। হিংস্রভাবে নিচের ঠোঁটটাকে বার কয়েক চিবিয়ে নিলেন তিনি, তারপর এগিয়ে এলেন ছেলেদের দিকে। আগুন-ঝরা গলায় ডাক দিলেন : মৃগাঙ্ক!

ফার্স্ট ক্লাসের ফার্স্ট বয় মৃগাঙ্ক ভিড় ঠেলে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান ছেলে, আজ পর্যন্ত তার মুখের হাসির কেউ ব্যতিক্রম দেখেনি। মৃগাঙ্ক এক মুখ হাসি নিয়ে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে কি আপনি কিছু বলতে চান স্যার ?

—বলতে চাই ? হাঁ—বলতে চাই বই কি।—হতাশাজর্জরিত রুদ্ধস্বরে হেড্‌মাস্টার বললেন, তোমার কাছ থেকে এ আমি আশা করিনি।

—অন্যায় তো কিছু করিনি স্যার।

—অন্যায় করোনি!—বিকৃত ভঙ্গিতে হেড্‌মাস্টার বললেন: পড়াশুনো বিসর্জন দিয়ে ভারতমাতাকে মুক্ত করা হচ্ছে! তা করো—আপত্তি নেই। নিজেরা গোল্লায় যাবে যাও, কিন্তু অন্য ছেলেদের মাথা খাচ্ছ কেন ?

সত্যাগ্রহী মৃগাঙ্ক চটল না: আমরা তো আর কারুর মাথা খাইনি স্যার।

—খাওনি ?— হেড্‌মাস্টার বললেন, নিজেরা ইস্কুল বয়কট করেছ করো, কিন্তু যারা আসতে চাইছে তাদের বাধা দিচ্ছ কোন অধিকারে ?

মৃগাঙ্ক তেমনি হাসতে লাগল: মনুষ্যত্বের অধিকারে। অত্যন্ত দুঃখের কথা স্যার, আপনাকেও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে। যেটা সত্য, সেটা অন্যকে বোঝাতে সকলেরই অধিকার আছে স্যার।

—বটে!—হেড্‌মাস্টারের মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল: খুব বড় বড় কথা শোনাচ্ছ যে! আচ্ছা বেশ, এ সম্পর্কে আমারও কতটা অধিকার আছে সেটা একবার জানানো দরকার। বিদ্যুৎবেগে পেছন ফিরলেন হেড্‌মাস্টার। উচ্চকণ্ঠে উঠতে লাগল: বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্—

মিথ্যেই শাসানদি রায়সাহেব।

আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে এল পুলিশ। লাঠিধারী ভোজপুরী আর সশস্ত্র গুর্খার দল। মস্তিষ্কহীন যান্ত্রিক মানুষ—চোখে মুখে ক্লান্ত গ্লানির অপচ্ছায়া।

তরোয়াল ঘুরিয়ে উইণ্ড-মিলের সঙ্গে লড়াই করত কোন্ পাগলা লোকটা ? ডন্ কুইক্‌সোট্। গল্পের বইতে তার ছবি দেখেছিল রঞ্জু—এবার চোখের সামনে তাকে দেখতে পেলো।

বাঙালি ডি-এস্-পি—নামটা শুনেছিল, দিগম্বর সাহা। বেগুন-ক্ষেতে কাক-তাড়াবার মতো অস্থিসার চেহারা। আলনায় ঝোলানো জামার মতো শরীরে ঢল ঢল করছে ইউনিফর্মটা। রোগা হাঁটু আর হাড়সর্বস্ব পায়ে জুতোমোজা যেমন বেখাপ্পা, তেমনি বেমানান দেখাচ্ছে—কেন যেন "পুস্ ইন্ বুট্‌স্"-এর গল্প মনে পড়ে যায়। কোমরে চামড়ার খাপে রিভলভার, গাঁট

বের করা আঙুলে সেটাকে আগলে আছেন ডি-এস্-পি; সন্দেহ হয় রিভলভার ছুঁড়বার আগেই আঙুলগুলো প্যাকাটির মতো মট্ মট্ করে ভেঙে যাবে কিনা।

চেরা-গলায় ডি-এস্-পি হুঙ্কার ছাড়লেন। হার্মোনিয়ামের প্রথম আর শেষ রীড্ দুটো একসঙ্গে টিপলে যেমন একটা মিহি-মোটা বিচিত্র দ্বি-স্বর বেরোয়, গলার আওয়াজটা শোনালো ঠিক সেই রকম।

শাদা বাংলায় বললে পাছে ছেলেরা বুঝতে না পারে সেজন্যে দিগম্বর সাহা সাধু ভাষায় বললেন, বালকগণ, তোমরা বে-আইনি কাজ করিতেছ।

উত্তর এল : বন্দে মাতরম্—

—যদি ভালো চাও তো এখনি এখান হইতে প্রস্থান কর।

জবাব এল : মহাত্মা গান্ধী কী জয়—

—শেষবার বলিতেছি, না গেলে লাঠি চালাইবার হুকুম দান করিব। গুলিও চলিতে পারে।

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে ছেলেরা : ভারত মাতা কি জয়—

হার্মোনিয়ামের দুটো স্বর এবার চারটে হয়ে ঠিকরে বেরুল : লাঠি চার্জ!

লাঠি চলল। প্রথমে পড়ল মৃগাঙ্ক, তারপরে আরো, আরো আরো অনেকে। দশজন পালালো, বিশজন সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। রক্তের ছিটে বইল স্রোত হয়ে। বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্। লাঠি চালাতে পারো, গুলি ছুঁড়তে পারো, কিন্তু কণ্ঠরোধ করতে পারো না।

আহত ছেলেদের ঘোড়ার গাড়িতে তুলে ফেলা হল। বাকী জনপঞ্চাশকে একটা মোটা কাছি দিয়ে কর্ডন করে নিয়ে যাওয়া হল কোতোয়ালী থানায়, সেখান থেকে জেলখানাতে। ধুলো আর রক্তের রাজটীকা পরে অকম্পিত পায়ে এগিয়ে চলল ছেলেরা।

রঞ্জু নির্বাক দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

ঊনিশ শো তিরিশ সালের ছবি। অজস্র, অসংখ্য।

চৌমাথার মোড়ে একটি বেঞ্চি টেনে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল তিন চারটি খদ্দরের টুপি পরা ছেলে। একজন বলতে সুরু করল : বন্ধুগণ, বিদেশী শাসনের নির্মম অত্যাচারে—

দুদিকের ভিড় সরে গেল। দারোগা ঢুকলেন বাহিনী নিয়ে।

দারোগা বললেন, বক্তৃতা বন্ধ করুন!

ছেলেটি সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করলে না। বলে চলল, নির্মম অত্যাচারে

আমরা জর্জরিত হচ্ছি। আজ এই অত্যাচারের জবাব দিতে হলে—

দারোগা বললেন, নেমে আসুন, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।

এইবার উঠল দ্বিতীয়জন। দারোগা বললেন, আমি নিষেধ করছি, আপনি এখানে কোনো কথা বলতে পারবেন না।

দ্বিতীয় বক্তা কথা বললে না, আবৃত্তি সুরু করলে:

"ওরে তুই ওঠ্ আজি,
আগুন লেগেছে কোথা, কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি"।

—নেমে আসুন—ইউ আর অ্যারেস্টেড্।

তৃতীয় জন বক্তৃতা করলে না, আবৃত্তিও না—সোজা গান ধরে দিলে:

"বন্দে মাতরম্—
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্—"

—আপনাকেও আমি গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হচ্ছি।

ছবির শেষ নেই। একটার পর আর একটা—অসংখ্য গণনাতীত। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য—রঞ্জু এর ভেতরে যেন দর্শক ছাড়া আর কিছুই নয়। রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে, অসহ্য উন্মাদনায় ছিঁড়ে যেতে চেয়েছে মাথার শিরাপেশীগুলো, তবু কোথায় যেন বাধা পড়েছে তার। এই উন্মত্ত জীবন-স্রোতে তবু সে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারেনি। নিজের ভেতরে একটা বিচিত্র একাকিত্ব—বড়বাবুর ছেলের আশৈশব-লালিত স্বাতন্ত্র্য-বোধ তাকে সরিয়ে রেখেছে। ভরা গঙ্গার কূলে দাঁড়িয়ে দেখেছে বন্যাকে, তার ফেনিল ভয়ঙ্কর রূপকে; কিন্তু একটি মাত্র পা এগিয়ে গিয়ে সেই প্লাবনছন্দে মাতামাতি করতে পারেনি তবুও। খোলা জানলার মধ্য দিয়ে যেমন করে দেখেছিল তিরিশ সালের বন্যাকে—ঠিক সেই রকম। কেন? রঞ্জু ঠিক উত্তর দিতে পারে না। আজকের রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় হয়তো বলতে পারত: মনের ভেতর যত প্রচণ্ড হয়ে তার ঝড় জেগে ওঠে, তার কাছে তত ছোট হয়ে যায় বাইরের পৃথিবী। সমস্ত নির্শিরাস্নায়ুগুলোকে উগ্র প্রখর করে দিয়ে, বিনিদ্র উত্তেজিত মস্তিষ্কে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিয়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অস্থিরভাবে পায়চারী করে সে নিজের ভেতরে আস্বাদন করতে ভালোবাসে বিপ্লবের আবর্তকে; আর অদ্ভুত—বাইরে সে ভীরু, সে সংশয়ী। আত্মকেন্দ্রিক—ব্যক্তি আর অনুভূতি-সর্বস্ব। এখানেও হয়তো প্রশ্ন উঠবে—কেন? শুধু রঞ্জু নয়, রঞ্জুর মতো আরো অনেকের কাছেই হয়তো এ প্রশ্নেরও জবাব পাওয়া যাবে না।

কিন্তু আত্মবিশ্লেষণ থাক। সত্যিই—ছবির শেষ নেই।

একটা তোবড়ানো আল্‌কাত্‌রার দাগ চটে-যাওয়া বিবর্ণ ছোট সাইনবোর্ড চোখের সামনে ভেসে উঠছে এবারে। কাঁচা অসমান অক্ষরে লেখা রয়েছে: "লাইসেন্সপ্রাপ্ত দেশী মদের দোকান। ভেণ্ডার: হারানিধি পাল। সময়: সকাল আটটা হইতে রাত্রি নয়টা।"

কিন্তু আটটা বাজবার আগেই ভিড় জমে গেছে সেখানে। পিকেটিং চলছে।

একজন বলছে, ভাই, আজ বড় দুর্দিন। মদ খেয়ে দেশের আর সর্বনাশ কোরো না। তোমাদের পায়ে পড়ি, নেশা ছেড়ে দাও—

দশ বারোটি ক্রেতা জটলা করছে একটু দূরে দাঁড়িয়ে। বেশীর ভাগই নিম্নশ্রেণীর—ধাঙড়, মেথর জাতীয় লোক। নিম্নবিত্ত ভদ্রলোকও আছে দু একজন। ফিটফাট বাবুদের মদ কেনাটা এমনিতেই আড়ালে আবডালে চলে, সুতরাং আপাতত তারা রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত নেই—রয়েছে নেপথ্যে।

কাউণ্টারে আসীন লাইসেন্স-প্রাপ্ত ভেণ্ডার হারানিধি পাল বসে আছে প্যাঁচার মতো মুখ করে। গোল গোল মস্ত চশমার আড়ালে চোখদুটোতে যেন নরখাদকের দৃষ্টি। খালি গা, গলায় সোনার হারের সঙ্গে মস্ত বড় সোনার তাবিজ বুক আর পেটের মাঝামাঝি জায়গায় দোল খাচ্ছে। কুচকুচে কালো রঙের বিপুল বপু জুড়ে নিবিড় রোমাবলীর স্বচ্ছন্দ অভ্যুদয়, অনেকটা অনুসন্ধান করলে হয়তো চামড়ার সন্ধান মিলতে পারে। সবটা মিলিয়ে মনে হতে পারে, যেন শিকারের আশায় থাবা গেড়ে বসেছে একটা ভালুক।

কোমল স্বরে হারানিধি বললে, এ আপনাদের ভারী অন্যায় বাবুমশাই। এমনভাবে যদি আপনারা গরীবের অন্ন মারেন—

পিকেটারেরা তার দিকে ফিরেও তাকালো না। তারা বলে যেতে লাগল: ভাই সব, কথা শোনো। বাড়ি ফিরে যাও—

ক্রেতাদের একজন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল। অভ্যস্ত নেশার সময়ে এরকম অবাঞ্ছিত বিঘ্ন ঘটাতে সে খুশি হতে পারেনি। বললে, হামাদের পয়সায় হাম্‌লোগ দারু পিব, তুম্‌হারা কেনো বাধা দিতে আসিয়েছো বাবু?

বাকী লোকগুলো বোধ হয় এই কথাটার জন্যেই প্রতীক্ষা করছিল এতক্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে কলরব উঠল: সরিয়ে যাও—হামরা দারু পিব—হামাদের খুশি।

পাথরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়ালো পিকেটারেরা।

—না, তোমরা মদ খেতে পাবে না।

লোকগুলো চেঁচামেচি করছিল বটে, কিন্তু পিকেটারদের ঠেলে কেউ

এগিয়ে যায়নি। কিন্তু রক্তে রক্তে অভ্যস্ত নেশার নিয়মিত দাবী। এগোতে পারছে না, পিছোনোও অসম্ভব। মদ ছাড়া ওদের চলবে না।

হারানিধি আবার কাতরকণ্ঠে বললে, যারা নিতে চাইছে, তাদের নিতেই দিন না। কেন খালি খালি আপনারা ঝামেলা বাড়াচ্ছেন বাবুমশাই?

অবস্থাটা 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবেই হয়তো আরো খানিকক্ষণ চলত, কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটি ব্যক্তি প্রবেশ করল ঘটনাস্থলে। লম্বা খিট্‌খিটে চেহারার লোক, গায়ে বিলিতী আদ্দির ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবী, কানে একটা সিগারেট। বড় বড় বাবরী চুল, অবিন্যস্ত ও বিশৃঙ্খল—পরিপূর্ণ লম্পটের চেহারা। লাল চোখ দুটো চরকির মতো বোঁ বোঁ করে ঘুরছে তার—দুদিন ধরে নেশা করতে না পারায় আপাতত খুন চড়ে উঠেছে তার মাথায়।

দোকানের সামনে এসেই বাবরী চুল আদেশ করলে, হটো—তফাৎ যাও—

পিকেটারদের ভেতর যে উৎসাহী হয়ে সকলকে বোঝাচ্ছিল এতক্ষণ, সেই-ই জবাব দিলে। বললে, কালতো ফিরে গিয়েছিলে ভাই ব্রিজ্‌বিহারী, আজও তাই যাও।

—কেয়া? ব্রিজ্‌বিহারী কদর্য একটা মুখভঙ্গি করে গাল দিলে অশ্লীল ভাষায়। বললে, নেহি যায়গা, তুম্ ক্যা করোগে শালা?

অপমানে এক মুহূর্তের জন্যে চোখমুখ লাল হয়ে উঠল ছেলেটির। কিন্তু সত্যাগ্রহীর সংযম চক্ষের পলকে আত্মস্থ করে দিলে তাকে।

—তোমাকে অনুরোধ করছি ভাই, ফিরে যাও।

কেয়া, লৌট্ যাউঙ্গা? কভি নেহি। হটো শালা লোগ্—দিল্লাগিমে কাম ন চলে গা।

—না। তোমাকে মদ কিনতে দেব না।

—হটো—ব্রিজ্‌বিহারীর চোখে হত্যা ঝিলিক দিয়ে উঠল।

—না।

—না?

নক্ষত্রবেগে মাটি থেকে একখানা থান ইট তুলে নিল ব্রিজ্‌বিহারী—বসিয়ে দিলে সজোরে। অস্ফুট কাতরোক্তি করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল ছেলেটি। হাতের ফাঁক দিয়ে টপটপ করে রক্ত পড়তে লাগল, তবু সেই অবস্থায় সে বললে, আমার কথা রাখো ভাই—মদ খেয়ো না।

তখন চারদিকে কলরব উঠেছে: খুন খুন। বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হয়ে

গেছে মত্তপায়ীর দল, ঝরাং করে কাউণ্টারের জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছে হারানিধি। সবাই পালিয়েছে, শুধু পালাতে পারে নি ব্রিজ্‌বিহারী নিজে। মাটির ভেতর থেকে একটা অলক্ষ্য শৃঙ্খল যেন তার পা দুটোকে আটকে ফেলেছে সেখানে।

রঞ্জু ভুলতে পারবে না ব্রিজবিহারীর সেই মুখ। আড়ষ্ট সংকুচিত হয়ে গেছে—বিবর্ণ রক্তহীন হয়ে গেছে বাসি মড়ার মতো। ছেলেটির রক্তাক্ত মুখের দিকে সে তাকিয়ে আছে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে। মাথার ওপরে একটা প্রকাণ্ড পাথরের ছাদ ভেঙে পড়বার মতো নিজের অপরাধের আকস্মিক চৈতন্যে নিষ্পিষ্ট হয়ে গেছে ব্রিজ্‌বিহারী, ভেঙে চুরে ছত্রাকার হয়ে গেছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্রিজ্‌বিহারী থর থর করে কাঁপতে লাগল, তারপর আহত ছেলেটির মতোই দু হাতে নিজের মাথা মুখ ঢেকে বসে পড়ল ধুলোর ওপরে। যেন চৈতন্য অবলুপ্ত হয়ে আসছে তার।

মাতাল, লম্পট ব্রিজ্‌বিহারী নিষ্পিষ্ট হয়ে গেছে। ব্রিজ্‌বিহারী আর কোনদিন মদ খাবে না।

ছবির পরে ছবির শোভাযাত্রা চলে। কিন্তু উনিশ শো তিরিশ সালের সেই গভীর গম্ভীর পরিবেশের মধ্যেও মনে পড়ে, দলপতি ভোনা এবং তার সুযোগ্য পিতৃদেব ভবেন মজুমদারকে।—ঝোড়ো মেঘের এককোণে এক ফালি রূপালি রেখার মতো তা ঝলমল করে ওঠে।

আকস্মিক দেশসেবার উত্তেজনায় বেলুনের মতো ফেঁপে উঠেছিল ভোনা; কিন্তু ছোট একটা কাঁটায় খোঁচা লাগতেই ফেটে চুপসে গেল সে বেলুন।

দু'রাত্রি হাজত বাস করেই ভোনা টের পেলো কাজটা ভালো হয়নি; এবং দেশপ্রেম বস্তুটি আর যাই হোক, মনসাতলায় মার্বেল ফাটানো কিংবা গোষ্ঠের মেলায় হাত সাফাই করবার মতো সুখের ব্যাপার নয়। ছারপোকা আর কাঁটার মতো খস্‌খসে রোঁয়ায় ভরা কম্বলশয্যা তার পুষ্পশয্যা বলে মনে হল না, মশার কামড়ে চোখ মুখ ফুলে উঠল, 'সোনেকি হিন্দুস্তান' গানটা ব্রহ্মতালুতে গিয়ে আটকে রইল, গলা দিয়ে বেরুলই না আর। অবশেষে বাপ ভবেন মজুমদার থানাপুলিশে অনেক হাঙ্গাম হুজ্জুত করে, ছেলেকে বণ্ড লিখিয়ে দিয়ে, স্বদেশী ও কংগ্রেসের বাপ-বাপান্ত করতে করতে পুত্ররত্নকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এল।

কিন্তু আদালতের টাউট ভবেন মজুমদারের রাগটা ওইখানেই থামল না। পরের দিন সকালবেলায় বুকটান করে সে দাঁড়িয়ে গেল মনসাতলায় সিমেন্টের

বেদীটার ওপরে। না—বক্তৃতা দিয়ে জেলে যাওয়ার জন্তে নয়, সম্পূর্ণ অন্যরকম উদ্দেশ্যে।

তারপর মুখ ছুটল ভবেন মজুমদারের।

শ্রাব্য-অশ্রাব্য ভাষায় অবিশ্রান্ত গালাগালি। কংগ্রেস চোর, গান্ধী বাটপাড়। স্বদেশী ছোকরারা সব গুণ্ডা আর বদমায়েসের দল। ইংরেজের সঙ্গে চালাকি করতে যায় সব। ঠেঙিয়ে দেবে টিট করে, ভুলিয়ে দেবে বাপের নাম—। তা দিক—তার জন্যে ভবেন মজুমদারের মাথাব্যথা নেই। কিন্তু তার ছেলেকে—এমন হীরের টুকরো ছেলেকে বিভ্রান্ত করেছে কোন্ শয়তান হতভাগারা? তাদের কাঁচা মাথাগুলো আস্তো আস্তো চিবিয়ে খেলে তবেই রাগ মেটাতে পারে ভবেন মজুমদার।

বক্তৃতা হল জমাট—প্রায় ঝাড়া দেড়ঘণ্টা। যারা শুনছিল তারা তখনকার মতো কোনো উচ্চবাচ্য করলে না। কিন্তু প্রতিক্রিয়াটা হল তার পরের দিন—ভোরের আলো আকাশে ফুটে ওঠবার আগেই।

—ক্যান্-ক্যান্-ক্যান্—

টিন পেটানোর বিশ্রী বেখাপ্পা আওয়াজে পাড়ার লোক জেগে উঠল। আর জেগে উঠলেন ভবেন মজুমদার—কিন্তু সে জাগরণ আনন্দের নয়—এইযে বৈতালিকেরা তাঁকে প্রভাতী শুনিয়ে জাগাতে এসেছে এদের উদ্দেশ্য যে একেবারেই সাধু নয় এ সম্বন্ধে ভবেন মজুমদারের সন্দেহ রইল না বেশিক্ষণ!

—ক্যান্-ক্যান্-ক্যান্—

প্রায় পঁচিশ তিরিশটি পাড়ার ছেলে জড়ো হয়েছে ভবেন মজুমদারের বাড়ির সামনে। আট দশটা ভাঙা ক্যানেস্তারা কোত্থেকে সংগ্রহ করেছে সব—প্রাণপণে তাই পিটছে তারা। তার প্রলয়ঙ্কর শব্দে যে কোনো লোকের শুধু কান কেন, মাথার পোকা পর্যন্ত বেরিয়ে যাওয়া উচিত।

টিন পেটানোর দলে আজ রঞ্জুও ছিল।

—এসব কী?—রোষরক্ত লোচনে ভবেন মজুমদার বললেন, অ্যাঁ, কী সব?

উত্তর এল সমস্বরে।

—বন্দে মাতরম্—

—মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়—

—ভারত মাতা কী জয়—

রাগে ভবেন মজুমদার লাফিয়ে উঠল তিড়িং করে। হাত দুই ছিটকে পড়ল

একটা বাগ্‌দা চিংড়ির মতো। চিৎকার করে বলল, শালা শূয়ারকা বাচ্চা সব! ভাগো, ভাগো এখান থেকে—

এবার জবাব দিলে ক্যানেস্তারা। ভবেন মজুমদারের কণ্ঠ ডুবিয়ে দিয়ে কর্ণপটহবিদারী শব্দ উঠতে লাগল: ক্যান্-ক্যান্-ক্যান্—

ক্যানেস্তারা প্রত্যুত্তর দিলে দ্বিগুণ জোরে!

ভবেন মজুমদার আবার একটা লাফ দিলে শূন্যে। এ অবস্থায় হাই-জাম্প প্রতিযোগিতায় যোগ দিলে বোধ হয় রেকর্ড করে ফেলতে পারত একটা। বললে, এই ভোনা, এই হারামজাদা, হামরা লাঠি লে আও—

উত্তেজনায় ভবেন মজুমদার ভুলে গিয়েছিল তার ছেলে বাঙালি, হিন্দুস্থানী নয়।

কিন্তু বাপের পেছনে দাঁড়িয়ে ভোনা তখন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ক্যানেস্তারা পার্টির দিকে তাকিয়ে আছে। Thou too Brutus—অ্যাঁ! কাল পর্যন্ত যাদের ওপর তার একচ্ছত্র নেতৃত্ব ছিল, আজ তারাও তার শত্রুপক্ষে রূপান্তরিত হয়েছে। কালী, খাঁদু, পূর্ণ—তার বিশ্বস্ত অনুচরেরা শেষে ক্যানেস্তারা বাজাতে সুরু করেছে তাদেরই বাড়ির সামনে এসে!

—এই শালা শূয়ারকা বাচ্চা শুনা নেই? হামি বোলানা তুম্‌কো লাঠি আনতে?—বলেই ভবেন মজুমদার একখানা দশাসই চাঁটি হাঁকড়ালো ভোনার কানের নিচে। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাঁত্‌ করে উঠেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ভোনা, আর ভৈরব হুঙ্কার ছেড়ে ক্ষিপ্ত ধূর্জটির মতো ক্যানেস্তারা পার্টিকে তাড়া করলে ভবেন মজুমদার।

ক্যানেস্তারা পার্টি তৈরীই ছিল, চক্ষের নিমেষে হাওয়া। সমস্ত পাড়াটা নিস্ফল আক্রোশে দৌড়ে ভবেন মজুমদার যখন হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল, তখন নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে তেম্‌নি ক্যানেস্তারা তার সঙ্গে সঙ্গে বাজতে বাজতে আসছে।

ভবেন মজুমদার ঝাঁ করে থেমে দাঁড়ালো, আবার তাড়া করল। আবার ফিরল, আবার তাড়া করল। তারপর যখন বেদম হয়ে দাওয়ায় বসে কদর্য গালিগালাজ সুরু করলে, তখন তার কণ্ঠস্বরকে তলিয়ে দিয়ে দশ দশটি ক্যানেস্তারা তেম্‌নি পরম পুলকে যথাস্থানে এসে আনন্দ-ধ্বনি করছে।

পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা অষ্টপ্রহরের অবিরাম কীর্তনের মতো চলল। ভবেন মজুমদার ঘরে থাকে—বাড়ির চারদিকে ক্যানেস্তারা বাজে; বাজারে যায়, পেছনে ক্যানেস্তারা চলে; উকিলের সেরেস্তায় হাঁটে, পেছনে ক্যানেস্তারা হেঁটে

যায় ; রাত্রে শোয়ার চেষ্টা করে, জানালার বাইরে ক্যানেস্তারা ঘুমপাড়ানি গান শোনাতে থাকে। সমস্ত শহরের একটি দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠল ভবেন মজুমদার।

আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে ভবেন মজুমদার ভোনার হাত ধরে আবার সেই মনসাতলায় এসে দাঁড়ালো। বললে, ক্ষমা চাইছি, হাত জোড় করছি, ক্যানেস্তারা বন্ধ হোক—আমার প্রাণ যায়।

ছেলো বললে, বলুন, বন্দে মাতরম্—

কাতরস্বরে ভবেন মজুমদার বললেন, বন্দে মাতরম্।

—বলুন, মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়—

—মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়!—ভবেন মজুমদার প্রায় কেঁদে ফেললে।

ক্যানেস্তারার নিনাদ বন্ধ হল।

উনিশ শো তিরিশ সাল।

ঝড়ের গতিতে উড়ে বেরিয়ে গেল আইন-অমান্য আন্দোলনের দিনগুলি। চম্পারণে, মেদিনীপুরে জেগে রইল তার চিরন্তন স্বাক্ষর। কারাগারে, নির্যাতনে, রক্তপাতে আরো দৃঢ়মূল করে দিয়ে গেল স্বাধীনতার শপথকে ; সন্দেহ রইল না যে এবার যাত্রা সুরু, থেমে দাঁড়াবার উপায় রইল না আর।

বিনিদ্র উত্তেজিত মস্তকে রাতের পর রাত জেগে রঞ্জু আবৃত্তি করে যেত :

"বাহিরিয়া এল কারা ? মা কাঁদিছে পিছে
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।
ঝড়ের গর্জন মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে,
ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল,
যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল,
এসেছে আদেশ,
বন্দরের কাল হল শেষ—"

জানালা দিয়ে আত্রাইয়ের বন্যা দেখেছিল রঞ্জু, অভিভূত দর্শকের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিল অসহযোগ আন্দোলনের রূপটাকে। কিন্তু এইবারে এল তার পালা। আর এক নতুন পথে, আগুনজ্বালা রক্তঝরা দুর্গমের দিগন্তে তাকে হাতছানি দিলে উনিশ শো তিরিশ সাল।

সূত্রপাতটা হল আশ্চর্য রকমে।

খবরের কাগজের পাতায় ভয়ঙ্কর সংবাদ এল একটা। চঞ্চল হয়ে উঠল দেশ। —পুরের শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট আততায়ীর রিভলবারের গুলিতে নিহত।

সংবাদ ওইখানেই শেষ হল না। একটার পর আর একটা—ডাকলুট, ডাকাতি, হত্যা, বোমা বিস্ফোরণ। ত্রিবর্ণ-পতাকার আলোড়ন চঞ্চল শান্তিপূর্ণ অহিংস-বাংলা দেশের বুকের তলা থেকে আত্মপ্রকাশ করলে আগ্নেয়গিরি।

তারপর ?

দেশজোড়া স্বদেশী আন্দোলন তখনো পাকে খেয়ে যাচ্ছে ঘূর্ণি হাওয়ায়। তখনো দলে দলে সত্যাগ্রহী যাচ্ছে জেলখানার পাঁচিলের আড়ালে, মহিষবাথানের নোনা জলে মিশছে তাদের আহত দেহের রক্ত। সহিষ্ণুতার দেবদুর্লভ শক্তির সঙ্গে চলেছে পশুত্বের লড়াই। এমন সময়—

চট্টগ্রাম! ভারতবর্ষের বুকে জ্বলে উঠল বিপ্লবের রক্তাক্ত আকাশ প্রদীপ!

এ খবর বিশ্বাস করতেও যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায় রক্তবহা নাড়ীগুলো। একি সত্য—একি সম্ভব! শুধু অস্ত্রাগার নয়, চক্ষের পলকে চট্টগ্রামের বুকের ওপর থেকে মুছে গেল ইংরেজ শাসনের কালো কলঙ্ক। মাত্র কয়েকটি তরুণ প্রাণের দীপ্তিতে আর পিস্তলের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল দুশো বছরের জমাট বাঁধা আবর্জনা।

জালালাবাদ, কালারপোল, ধলঘাট, পানাড়তলী। খবরের কাগজে যেন সুদূর মঙ্গল-গ্রহের অচেনা রহস্যময়তার খবর। মুকুন্দপুর শহরও নাড়া খেয়ে উঠেছে। উত্তেজিত আলোচনা চারদিকে—একই কথা, চট্টগ্রামের কথা। সমস্বরে সকলে বলে, হ্যাঁ, কাণ্ড একটা করলে বটে এই চাটগাঁয়ের ছেলেরা! সাবাস!

কিন্তু সব আবছা রঞ্জুর কাছে—সব দুর্বোধ্য। দুরধিগম্য মঙ্গল গ্রহই বটে! এরা কারা—কী রকম দেখতে এরা? সাধারণ মানুষ? তাদের মতোই সুখ-দুঃখে-ভয়ে-ভাবনায় ভরা? বিশ্বাস হয় না। এমন দুর্বার যাদের শক্তি—এত দুর্ধর্ষ যাদের সাহস, মরণকে যারা এমন করে পায়ের তলায় দলে যেতে পারে, তারা কি নিতান্তই সাধারণ—একেবারে তাদের মতো হুবহু এক?

এরা কারা? তবে কি এরাই সে ক্ষুদিরামের দল? মাটির তলায় গুপ্ত কারখানায় এরাই কি তবে প্রস্তুতি নিচ্ছিল দিনের পর দিন?

কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসাও করা যায় না। অন্তত এটা বুঝেছে যে এ প্রশ্ন যাকে তাকে করা নিরাপদ নয়, তা ছাড়া যাকে বিশ্বাস করা চলে সে হয়তো বেকুব ঠাউরে বসে থাকবে।

অস্বস্তির একটা ঘুণ যেন কুরে কুরে খেতে লাগল বুকের মধ্যে।

একদিন অবশ্য ভোনাকে গুণ গুণ করে গান গাইতে শুনেছিল :

"আমায় ফাঁসি দিয়ে মা ভুলাবি
আমি কি মার সেই ছেলে,
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে—"

—কার গান, এ কার গান ভোনা? যেন আর্তনাদ করে উঠে জানতে চেয়েছিল রঞ্জু।

—আমি জানিনা বাবা—ভোনা সামলে নিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। চোখেমুখে স্পষ্ট দেখা দিয়েছিল ভয়ের ছায়া: জিঙ্গার-মার্চেণ্ট, নৌ জাহাজের খবর।

হতাশায় ম্লান হয়ে রঞ্জু চুপ করে গেল। আভাস পায়, অথচ ধরতে পারে না। এমন কেউ কি নেই যে এই অস্বস্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে তাকে, সরিয়ে দিতে পারে তার দৃষ্টির আড়াল করা সে পর্দাটাকে?

মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ মেনে তারাও চলেছে দেশকে স্বাধীন করতে, শৃঙ্খল মুক্ত করতে ভারতবর্ষকে। কিন্তু কত ঘোলো তাদের কাজ, কেমন ফিকে—শুধু পড়ে পড়ে মার খাওয়া ছাড়া কিছু যেন করবার নেই তাদের। আর ওদিকে চট্টগ্রাম ঈশানের রক্তমেঘ, আগামী দিগন্তের অগ্নিরাগ।

মারবার পথ না মার খাওয়ার পথ? কিল্ অর্ বী কিল্‌ড্? ঠিক বুঝতে পারে না। সব ঘোলাটে হয়ে যায়। কোথাও কি দিশারি নেই কেউ—নেই এমন একজন যে তার মনকে সঙ্গ দিতে পারে এখন, একটা গুরুভার নামিয়ে দিতে পারে চেতনার ওপর থেকে?

ছিল বইকি। দিশারি এল জীবনে।

পাড়ার একদল ছেলের সঙ্গে কংগ্রেস ময়দান থেকে প্যারেড করে ফিরছিল রঞ্জু। হঠাৎ একজন জ্বালাভরা গলায় বললে, ওই ছাখ, ভালো ছেলে যাচ্ছে!

সকলের দৃষ্টি একসঙ্গে ঘুরে গেল সেদিকে। একটা সাইকেলে করে চলেছে পরিমল।

শুনিয়ে শুনিয়ে খাঁদু বললে, হ্যাঁ, বড় হয়ে রায়বাহাদুর হবে। এত বড় ব্যাপারটা হয়ে গেল, ঘর থেকে একবার বেরুল না পর্যন্ত!

পরিমল অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ বোঁ করে ঘুরিয়ে দিলে সাইকেলটা। তারপর দলটার একেবারে পথ আটকে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল।

—এই যে দেশপ্রেমিকের দল, ভারতমাতাকে স্বাধীন করে ফিরে এলে তো?

অবাক হয়ে রঞ্জু তাকিয়ে রইল পরিমলের মুখের দিকে। এমন দিনে এই রকম কথা যে কেউ উচ্চারণ করতে পারে এটা যেন কল্পনার বাইরে ছিল। অল্প পরিচয়, মুখ চেনা বললেই হয়, তবু কেন কে জানে পরিমল সম্পর্কে রঞ্জুর কেমন মোহ ছিল একটা—একটা কৌতুহল ছিল। কিন্তু নিষ্ঠুর একটা ঘা দিয়ে পরিমল তার মোহভঙ্গ করে দিলে। পরিমল আর যাই হোক—সে যে ভবেন মজুমদারের দলের লোক এতটা ভাববার জন্যে মন তৈরী ছিল না যেন।

জবাব দিলে পূর্ণ: তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।

—লজ্জা? কেন?—কৌতুকভরা হাসিতে পরিমলের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তোমরাই তো গান গেয়ে বেড়াও—'কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!'

কালী বললে, ধিক্।

কিন্তু পরিমল গায়ে মাখল না। তেমনি উজ্জ্বল স্বরে প্রশ্ন করলে, ব্যাপারটা কী? সবাই মিলে এ ভাবে চাঁদা করে আমায় গাল দিচ্ছ কেন?

খাঁদু ঘৃণামিশ্রিত মুখে বললে, বুঝতে পারছ না?

—একেবারেই না। বোঝালে বড় বাধিত হব।

ভোনার অভাবে আজকাল খাঁদুই নেতা! সুতরাং বোঝাতে সুরু করলে।

—আজ দলে দলে দেশের ছেলে জেলে যাচ্ছে? স্বাধীনতা আসছে। কিন্তু তুমি নিশ্চিন্তে টেরী বাগিয়ে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছো। তোমার গলায় দড়ি দেওয়া উচিত।

পরিমল বোঝবার ভাণ করলে: ওঃ তাই নাকি! খেয়াল করিনি তো। তা কী যেন আসছে বললে?

—স্বাধীনতা।

—স্বাধীনতা? আসছে নকি? কোন ট্রেনে?

খাঁদুর মুখ রাঙা হয়ে উঠল। কিন্তু সত্যাগ্রহী হওয়ার ল্যাঠা অনেক। চটলে চলবে না—তাতে ভারতমাতা ব্যথা পাবেন। সুতরাং অহিংসা গলায় জবাব দিলে, তোমার সঙ্গে ইয়ার্কী দেবার সময় আমাদের নেই। আমরা কাজের লোক। সরো, পথ ছাড়ো।

পূর্ণ বললে, সামনে আসন্ন স্বাধীনতার রূপ দেখেও তুমি এমন করে ইয়ার্কী দিতে পারছ এটাই আশ্চর্য!

—স্বাধীনতার রূপ? সে কী রকম ভাই!—আবদারের সুরে পরিমল বললে,

একটা ছাগলের গলায় খদ্দরের দড়ি আর পিঠে একবস্তা স্বদেশী লবণ—এই কি স্বাধীনতার মূর্তি?

—যা বোঝোনা, তা নিয়ে বাজে কথা বোলো না—কালী চটে উঠল।

—আহা-হা, ক্ষেপছ কেন?—পরিমল হাসিমুখে বললে, সত্যাগ্রহীর যে চটতে নেই। আচ্ছা তোমরা তো সবাই অহিংস, আমি যদি তোমাদের প্রত্যেককে একটা করে চাঁটি লাগিয়ে দিই, তোমরা নিশ্চয় তাতে আপত্তি করবে না?

মুখের মধ্যে দাঁতগুলো কিড়মিড় করে উঠল খাঁদুর, কিন্তু ব্যর্থ আক্রোশ। পরিমলের কথাটা যেন শুনতেই পায়নি এমনিভাবে পাশ কাটিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দলের আর সবাই।

পেছন থেকে ডাক দিলে পরিমল: চললে? হে দেশপ্রেমিকেরা, নিতান্তই যদি যাবে তা হলে যাওয়ার আগে কেউ আমাকে চার আনা পয়সা ধার দিয়ে যাও।

মুখ ফিরিয়ে কালী বললে, কী করবে চার আনা পয়সা দিয়ে?

—গলায় দেবার জন্যে দড়ি কিনব।

এর পর আর কথা চলে না। মুখ গোঁজ করে নিরুপায় স্বেচ্ছাসেবকেরা হাঁটতে সুরু করলে। পেছন থেকে শোনা যেতে লাগল পরিমলের উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ।

দু পা এগিয়ে খাঁদু বললে, বিশ্বাসঘাতক!

পূর্ণ বললে, শেম্‌লেস!

কালী বললে, দেশের শত্রু, জাতির শত্রু।

রঞ্জু কিছুই বললে না। রাগ নয়, অনুযোগ নয়,একটা গভীর বেদনাবোধে সমস্ত মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। পরিমলের ভেতরে অসাধারণ কিছু একটা কামনা করেছিল সে—আবিষ্কার করতে চেয়েছিল কোনো একটা আশ্চর্য কিছুকে। নির্জন কাঞ্চন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে কী একটা দুর্বোধ সম্ভাবনা তার চেতনাকে দুলিয়ে দিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু একসঙ্গে অনেকগুলো কাচের বাসন ভেঙে পড়বার মতো বিশ্রী শব্দ করে মনের ভেতরে কী যেন চুরমার হয়ে গেল তার।

কিন্তু পৃথিবী অনেক বড়—মানুষ অনেক বড়। রঞ্জু সেটা জানল এরই দিন কয়েক পরে। উনিশ শো তিরিশ সাল তার মনের সামনে খুলে দিলে আর একটা মণিকোঠার দরজা।

—আট—

জংলা বাগানটায় অজস্র ভাঁট ফুল ফুটেছে। বেগুনি রঙের হালকা একটুখানি ছোঁয়া-লাগো রাশি রাশি শাদা ফুলে যেন চারদিক আলো করে দিয়েছে, মধুর একটা বুনো গন্ধ সব কিছুকে রেখেছে আচ্ছন্ন করে। রেললাইনের ওপারে একটা ন্যাড়ামুড়ো মাদার গাছ—এখান থেকে মনে হয় তার সারা গায়ে লাল রঙের তুলি ঝেড়ে ছিটে দিয়েছে কেউ। আমের মুকুল থেকে শুকনো পাতার ওপরে টপ টপ করে মধু পড়বার শব্দ। বসন্ত।

রঞ্জু চুপ করে বসে ছিল ছাইগাদাটার পেছনে। উড়তে উড়তে হঠাৎ এল হলদে রঙের একটা বড় প্রজাপতি, সেয়াকুল কাঁটার হলদে ফুলের দুটো উড়ন্ত পাপড়ি যেন। কানের কাছ দিয়ে বোঁ করে চলে গেল নীলাভ কালো রঙের মস্ত বড় একটা ভ্রমর। গোটা তিনেক শালিক পাখি নাচতে নাচতে এগিয়ে এল, কিচ্ কিচ্ করে, রঞ্জুকে যেন জিজ্ঞাসা করলে, কী ভায়া, এমন চুপচাপ যে? ব্যাপারটা কী? আমাদের দুটো চারটে ঢিল পাটকেল মারবার মতলব নাকি? কোথা থেকে তীব্র মিহি গলায় একটা চিল চেঁচিয়ে উঠল—যথাকালে বোধ হয় মরা ইঁদুর-টিদুর কিছু জোটেনি, খুব সম্ভব ক্ষিদে পেয়েছে ওর। বাতাবী লেবু গাছটার কালো কোটরের ভেতরে এক জোড়া ভাঁটার মতো উজ্জ্বল গোল চোখ দেখা যাচ্ছে—ওখানে দুটো প্যাঁচা থাকে। চোখ বড় বড় করে বোধ হয় বোলবার চেষ্টা করছে—বেলা ডুবতে আর আর দেরী কত।

বেশ লাগে। বেশ লাগে এখানে নিরিবিলিতে এমনি করে বসে থাকা। কেমন যেন হয়ে গেছে, পাড়ার কারুর সঙ্গে মিশতে ইচ্ছে করে না, ভালোও লাগে না! স্বদেশী আন্দোলন মরে গেছে, আবার ফিরে আসছে সেই পুরোনো, সেই স্বাভাবিক দিনযাত্রা! আজ রবিবার—মনসাতলায় তেমনি চীৎকারের সঙ্গে মার্বেল খেলা চলছে, তেমনি আনন্দভরে উঠেছে বাঘ-বন্দীর কোলাহল। শুধু রঞ্জুর মন যেন পাখা ঝাপটে ফিরছে শূন্য আকাশে। কী একটা চাই, কিছু একটা একান্তই দরকার। যখন সমস্ত দেশটা একসঙ্গে ত্রিবর্ণ পতাকায় শপথ নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে উঠেছিল, তখন দূরে দাঁড়িয়েছিল রঞ্জু, দেখেছিল দর্শকের অভিভূত একটা দৃষ্টি নিয়ে, ভাবতে চেষ্টা করেছিল—বুঝতে চেয়েছিল সমস্তটাকে। আজ ভাবনা শেষ হয়ে গেছে, বোঝা হয়ে গেছে সব কিছু।

মনের দিক থেকে সে সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে উঠেছে এখন। কিন্তু এখন আন্দোলন থেমে গেছে—এখন সন্ধি, এখন শান্তি। এখন তার কিছু করবার নেই।

মিটে গেছে অহিংস লবণ আন্দোলন। উনিশশো ত্রিশ সালের ৬ই এপ্রিল ডাণ্ডী অভিযানকে কেন্দ্র করে যে বিপ্লব সূচিত হয়েছিল, একত্রিশ সালের ৪ঠা মে তার অকালমৃত্যু ঘোষিত হয়ে গেল। স্বাক্ষরিত হল গান্ধী-আরউইন চুক্তি।

একদল বলছে, ভালোই হল, বেশ সম্মানজনক চুক্তি হল একটা।

লজ্জায় মাথা নিচু করে থেকেছে আর একদল। দুঃখে, অপমানে মুখ দিয়ে কথা ফোটেনি তাদের। বেজেছে যুদ্ধের বিউগল, সৈনিকের হাতে ঝল্সে উঠেছে তলোয়ার। রক্তে জেগেছে তরঙ্গ। তখন যেন সেনাপতি আদেশ করেছেন সেই তলোয়ার শত্রুর পায়ের নিচে রেখে তাকে প্রণাম করতে!

আগুন জলেছিল দেশ জোড়া মানুষের মনে। কামার-কুমোর, চাষা-মজুর—এমনকি মাতাল লম্পট ব্রিজ্‌বিহারীর পর্যন্ত। কিন্তু ঘৃণার এত বড় আগুনকে কেন ফু দিয়ে নিবিয়ে দিলেন সেনানায়ক গান্ধী? জনগণের মনের ওপর যাঁর এত বড় আসন, তিনি কেন বিশ্বাস করতে পারলেন না জনশক্তিকে?

প্রতিবাদ আসে মনে—কিন্তু জোর করে বলতে পারে না কেউ। মহাত্মা গান্ধী—নামটাই যাদুমন্ত্র। মন্ত্রমুগ্ধই হয়ে থাকে মানুষ—ঝিমোতে থাকে নেশাখোর টিয়াপাখির মতো।

একটা ছবি আজও ভাসছে রঞ্জুর চেতনায়। সে ভালো ছেলে মৃগাঙ্কের ছবি। স্কুলে পিকেট করতে গিয়ে পুলিশের লাঠিতে মাথা চৌচির হয়ে গিয়েছিল, তবু তার মুখের হাসি ফিকে হয়নি সেদিন।

অনেকদিন পরের কথা। মৃগাঙ্ক তখন ইন্‌সিয়োরেন্সের দালাল। খদ্দরের পাঞ্জাবীর মলিন আচ্ছাদনের নিচে দারিদ্র্যজীর্ণ দেহ। পুরোনো ভাঙা হার্কিউলিস্‌ সাইকেলে ক্যাচ্‌ ক্যাচ্‌ করে শব্দ ওঠে তার।

রঞ্জু জিজ্ঞাসা করেছিল, পড়াশুনো ছাড়লেন? নষ্ট করলেন এমন ভালো ক্যারিয়ার?

অত্যন্ত বিশীর্ণভাবে হেসেছিল মৃগাঙ্ক। জবাব দেয়নি।

—কী করছেন এখন?

মুখের ওপর সেই বিষণ্ণ হাসিটা টেনেই মৃগাঙ্ক বলেছিল, দেখতেই পাচ্ছ। দেশের লোককে ইন্সিয়োরেন্সের উপকারিতা বোঝাচ্ছি।

—পলিটিক্‌স?

—কী হবে? কোন মানে হয় না—কেমন যেন নিভন্ত চোখ মেলে তাকিয়ে ছিল মৃগাঙ্ক।

—হঠাৎ এমন করে ফুরিয়ে গেলেন কেন?

—কী করব? গাছে তুলে দিয়ে বারবার মই কাড়লে কী আর করা যাবে বলো? কম্প্রোমাইজ্ আর কম্প্রোমাইজ্। সকলেরই সব রইল, জলের মাছ জলে গেল—মাঝখান থেকে আমার ভবিষ্যৎটাকে আমি নিজের হাতে ভেঙে চুরমার করলাম। কেন বুঝিনি বার্দোলির শিক্ষা? চৌরিচৌরার মানে?—দেবতার পথ দিয়ে মানুষ কখনো চলতে পারে না—অন্যমনস্ক স্বরে মৃগাঙ্ক বলে।

সবটা না বুঝেও অন্তত মৃগাঙ্ককে বুঝতে পেরেছিল রঞ্জু। তিরিশ সালের এপ্রিল মাসে লাঠির ঘায়ে যার মাথা ফেটে রক্ত পড়েছিল, এ সে মানুষ নয়। এ তার 'মমি'—একটা চলন্ত শবদেহ। প্রাণ নেই, বোধও নেই কোথাও।

মৃগাঙ্কের চোখ চমকে উঠেছিল হঠাৎ: শুনছি তোমরাও কাজ করছ। খুব ভালো, খুব খুশি হলাম। কিন্তু দোহাই তোমাদের, ধার্মিক হয়ো না, আত্মশুদ্ধির চিন্তায় আকুল হয়ো না। তা হলেই বাঁচতে পারবে। আর সেই সঙ্গে যে ভুল আমরা সেদিন করেছিলাম, তারও প্রায়শ্চিত্ত করতে পারবে।

রঞ্জু দাঁড়িয়েছিল স্তব্ধ হয়ে—একটা কথা মুখে আসে নি এই অপমৃত্যুর রূপ দেখে। মৃগাঙ্ক কাছে এগিয়ে এসেছিল, সমস্ত চোখেমুখে একটা বীভৎস দীনতা ফুটিয়ে রঞ্জুকে বলেছিল, আট আনা পয়সা ধার দিতে পারো আমায়? কাল শোধ দেব। বাজারের পয়সা নেই আজ।

আট আনা দিয়েছিল রঞ্জু—মৃগাঙ্ক আর তা শোধ করেনি। শোধ যে করবে না তা পূর্ব সংস্কারেই বুঝতে পেরেছিল ও।

কিন্তু সে অনেক পরের কথা। এখন কিছু করা চাই। সোনা, কালী, পূর্ণ, খাঁদু যত সহজে এগিয়ে গিয়েছিল, তত সহজেই আবার নিজেদের জায়গাতে ফিরে এসেছে—ভুলে গেছে অবলীলাক্রমে। কিন্তু রঞ্জুর তো তা নয়। ঝড় যখন থামল তখন তার ঘা এসে লাগল তার বুকের মধ্যে। দেরী করে এসেছে বলেই যেতে চাইছে না। আর মাত্র সাত আটমাসের মধ্যে যেন অবিশ্বাস্যভাবে বড় হয়ে উঠেছে সে।

কী করবে? কিছু জানে না। আজকাল তার আজগুবি খেয়াল জেগেছে একটা—লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লেখে। মিষ্টি কোমল কবিতা নয়। জীবনে যাকে সে রূপ দিতে পারল না, কবিতার ভেতর দিয়ে ধরতে চায় তাকে।

বসাতে চেষ্টা করে ভালো ভালো শব্দ : রুদ্র, নটরাজ, ঈশান, বিষাণ, বহ্নি, শোণিত, আহব। চট্টগ্রাম প্রেরণা দিয়েছে তাকে।

লেখার চাইতে আরো ভালো লাগে কবিতার বই। সেদিন একটা বই এনেছিল পাশের যতীনবাবুর বাড়ি থেকে : "সবহারাদের গান।" আশ্চর্য লেগেছে তার কতগুলো লাইন :

"বাহিরিয়া এসো বন্ধু, আসিয়াছে মুক্তির আহ্বান,
সাগরের কূলে কূলে দুলে দুলে তরুণ নিশান
ডাকিছে তোমারে সখে, দেশে দেশে সাজে বীরদল,
দিকে দিকে ধ্বনিতেছে তরুণের রণ কোলাহল—"

শুধু ওই নয়। আরো অনেকগুলি কথা আছে, আছে অপরিচিত নাম, যাদের অর্থ পরিস্ফুট নয় রঞ্জুর কাছে। না হোক, সমুদ্র-ঢেউয়ের গম্ভীর গর্জনের মতো বিশাল দুর্বোধ্য কণ্ঠে কিছু একটা যেন বলবার চেষ্টা করে তারা। ভয় করে, ভালোও লাগে : মিশরের জগলুল, সাথে যায় বীর ডি-ভ্যালেরা,

সানিয়াৎ সেন-মন্ত্রে চলে নব দীক্ষিত চীনেরা।
সব আগে ওই চলে গুর্জরের তাপস-নির্ভয়,
মৃদুতায় মেষশিশু, পরাক্রমে কেশরী দুর্জয়!
সত্যাগ্রহ ধ্বজা করে পিছে চলে কোটি নর-নারী,
জেগেছে ভারতবর্ষ—সাবধান, ওরে স্বেচ্ছাচারী—"

সাবধান, ওরে স্বেচ্ছাচারী। বার বার আওড়াতে ইচ্ছে করে পংক্তিগুলোকে। চট্টগ্রাম! অমর অগ্নিযজ্ঞের রক্তাক্ত ইতিহাস। বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়ে অশ্বিনীর সেই গবেষণা : এরাই তবে 'নিখিলিষ্ট'!

বৈরাগী এসেছিল বাড়িতে কিছুদিন আগে। একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল ননীচোরা যশোদা দুলালের গান। চমৎকার মিষ্টি লোকটির গলা। রঞ্জু তাকে একমুঠো চালের সঙ্গে দুটো পয়সাও দিয়েছিল।

খুশি হয়ে বৈরাগী বলেছিল, আরো গান শুনবে খোকাবাবু? স্বদেশী গান? স্বদেশী যুগ। আগ্রহভরে রঞ্জু বলেছিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ স্বদেশী গানই শোনাও। একতারায় ঝঙ্কার দিয়ে বৈরাগী গান ধরেছিল :

"একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি!
অভয়রামের দ্বীপান্তর মা, ক্ষুদিরামের ফাঁসি।
লাট সাহেবকে মারতে গিয়ে মারলেম ভারতবাসী।
বারো বছর পরে

জনম নেব মাসীর ঘরে মাগো,
চিনতে যদি না পারো মা, দেখবে গলায় ফাঁসি—"

বৈরাগীর অজ্ঞতা আর কল্পনায় বহর মনে করলে আজকে রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের হাসি পায়। কিন্তু রঞ্জু—সেদিনের ছোট রঞ্জুর হাসি পায়নি। একটা উদ্‌ভ্রান্ত উত্তেজনায় চোখমুখ রাঙা হয়ে উঠেছিল তার—বুকের ভেতরে ঘোড়া ছুটে আসবার শব্দের মতো কী একটা শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। বড় বড় চোখ মেলে আগ্রহ-ব্যাকুল রঞ্জু জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা বৈরাগী, তুমি জানো অভয়রাম কে, ক্ষুদিরামই বা কে ?

বৈরাগী বলেছিল, ওই গানেই তো আছে।

—না, না, তুমি বলো।—রঞ্জুর স্বরে আকুলতা প্রকাশ পেল: আচ্ছা, সত্যি বলো তো, ক্ষুদিরামের কি ফাঁসি হয়েছে ?

ছেলেমানুষি প্রশ্নে বৈরাগী কৌতুক বোধ করেছিল: ফাঁসি না হলে তো গানই হত না খোকাবাবু।

—কক্ষণো নয়, কিছু জানো না তুমি! ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়নি। মাটির নিচে তার বোমার কারখানা আছে।

হঠাৎ ভয় পেয়েছিল বৈরাগী। ভয় পেয়েছিল ভোনার মতোই। চারদিকে চুরি করা চোখ মেলে দেখে নিয়েছিল একবার—এই সাংঘাতিক ছেলেটির ভয়ঙ্কর কথা কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে কিনা। তারপর তাড়াতাড়ি বলেছিল গান গানই খোকাবাবু, আমরা গরীব মুখ্যুসুখ্যু মানুষ—অত খবর জানব কোত্থেকে ?

গোপীযন্ত্রে দ্রুত ঝঙ্কার তুলে বৈরাগী চলে গিয়েছিল:

"নাচে আমার মাখন চোরা ননী লয়ে হাতে—"—

একটা অতৃপ্ত হতাশায় ভরে গিয়েছিল মনটা। বিশ্বাস হয় না—বিশ্বাস করতে ইচ্ছেও হয় না। হতেই পারে না ক্ষুদিরামের ফাঁসি। বছরের পর বছর ধরে মাটির তলায় নিঃশব্দে তার কারখানার কাজ চলেছে। অবশ্য মাটির তলায় কারখানা থাকা কতটা সম্ভব কে জানে, তবু তো দু একটা ডিটেকটিভ বইতে পড়েছে কত রহস্যভরা গুপ্তঘরের কথা। সেই রকম কোনো একটা অলখ্‌-পুরী থেকে একদিন উঠে আসবে কামান—একদিন ভেঙে-চুরে শেষ করে দেবে সমস্ত, একদিন—

একা একা ছাইগাদাটার পাশে বসে এসব ভেবেছে রঞ্জু, ভেবেছে নির্জন কাঞ্চন নদীর ধারে, বৈঁচিবনের নিচে বিছানো মখমলের মতো নরম ঝুরো-

বালির ওপরে বসে। আর ভয় নেই কাঞ্চন নদীকে; লোহার পুলের তলা থেকে কালীমূর্তি উঠে আসবে খেটক-খর্পর নিয়ে—এগুলিকে নেহাৎ ছেলেমানুষি আতঙ্ক বলেই মনে হয় এখন। নদীর নীল নির্মল জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের ভেতরে এই সব কথা নিয়েই আলোচনা করেছে রঞ্জু—ভেবেছে ক্ষুদিরামের কথা, তার কারখানার কথা।

আজও এলোমেলোভাবে এই সমস্তই মনের মধ্যে পাক খেয়ে ফিরছিল। 'জেগেছে ভারতবর্ষ, সাবধান, ওরে স্বেচ্ছাচারী' কিন্তু একটা ক্ষোভ তাকে পীড়ন করেছে, কাঁটার মতো ফুটছে একটা বিশ্রী অস্বস্তি। সত্যিই কি জেগেছে ভারতবর্ষ? যদি জাগলই, তবে এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল কেন?

—রঞ্জু?

কে ডাকে? চকিত হয়ে ঘাড় ফেরালো। এখানে, এই নিরিবিলি খিড়কির বাগানে আবার কে এসে হানা দিয়েছে? বিরক্তি বোধ হয়।

কিন্তু যে ডাকছিল তার দিকে চোখ পড়তেই সে বিরক্তি আর রইল না—কপালের মেঘ কেটে গিয়ে আলো হয়ে উঠল সমস্ত মুখ—বিস্ময়ে আর খুশিতে।

একটু দূরে পরিমল দাঁড়িয়ে।

—পরিমল? আয় আয়—

হাসিমুখে পরিমল এগিয়ে এল!

—অনেক খুঁজে তোকে আবিষ্কার করা গেল। বাপরে, যা জংলা বাগান—গোরু হারালে পাত্তা মেলে না। বেশ চমৎকার জায়গাটা বার করেছিস তো?

রঞ্জু শুধু হাসল।

—ঝোপ-ঝাড়ের ওপরে তোর খুব ঝোঁক আছে দেখছি!—একটা গাছের ছায়াতে যেখানে রোদের তাপ না পেয়ে খানিকটা হলদে রঙের বিবর্ণ ঘাস উঠেছে, সেইখানে পা ছড়িয়ে বসল পরিমল।—সেদিন দেখলাম একা একা নদীর ধারে ঘুরছিস, আজ দেখছি চুপচাপ বসে আছিস বাগানে। ব্যাপার কি রে? একেবারে ভাবুকের মতো চাল-চলন, কবিতা-টবিতা লিখিস নাকি?

চমকে উঠল, মুখের ওপরে খেলা করে রক্তের উচ্ছ্বাস। অন্তর্যামী নাকি পরিমল? তার কবিতার খাতা এখনো একান্তভাবে তারই নিজস্ব জিনিস—পৃথিবীর দ্বিতীয় কোনো মানুষকে সে খাতা দেখানোর উৎসাহ তার নেই, সাহসও না। একটা গোপন অপরাধের মতো—গোষ্ঠের মেলায় চুরি করে

আনা সেই সাবান আর সুতোর গুলির মতো এ তার মনের ভেতরেই লুকিয়ে রাখবার ব্যাপার।

কী জবাব দেবে, সেটা ভেবে ঠিক করবার আগেই প্রসঙ্গটা বদলে দিলে পরিমল। মনের ওপর থেকে নেমে গেল একটা অস্বস্তির বোঝা।

পরিমল বললে, তোকে একটা কথা বলবার জন্যে খুঁজছিলাম রঞ্জু।

—কী কথা?—বিস্মিত কৌতুকে চোখ তুলল। একবার আপাদমস্তক দেখে নিল পরিমলের। দিব্যি ঝকঝকে চেহারা—সে যে বড়লোকের ছেলে এ কথা কাউকে না বলে দিলেও চলে। নিখুঁত করে আঁচড়ানো চুল, গায়ে একটা ফর্সা হাফসার্ট, পায়ে চকচকে চামড়ার চটিজুতো। একটা ব্যবধান আছে—সুস্পষ্ট ব্যবধান আছে; শুধু রঞ্জুর সঙ্গে নয়—পাড়ার সকলের সঙ্গেই। ওকে কাছে পাওয়ার কথা, ভোনা কিম্বা খাঁদুর মতো ওর সঙ্গে মার্বেল খেলার কথা মনেও পড়ে না। তবু ওর ভেতরে কিছু একটা আছে—যা মনকে টানে, ওর চোখের দিকে তাকালে মনে হয় কী একটা আশ্চর্য সম্ভাবনা বুঝি লুকিয়ে রয়েছে তাদের ভেতরে। কিন্তু একটা ব্যথাবোধও আছে—সূক্ষ্ম একটা অনুযোগ জেগে আছে কোনোখানে। যেমন আশা করেছিল ঠিক সেটা পায়নি—কোথাও মোহভঙ্গ হয়ে গেছে তার।

মনে পড়েছে। সেই কংগ্রেস ময়দান থেকে প্যারেড করে আসবার দিন—

কিন্তু আজ রঞ্জু কোনো কথা ভাববার আগেই পরিমল ভাবছে। বললে, আমার ওপর চটেছিস, নারে?

—কেন? চটব কেন?

—বাঃ সেদিন? তোরা সব প্যারেড করে আসছিলি, আমি ঠাট্টা করেছিলাম?

ক্ষুণ্ণ গম্ভীর গলায় রঞ্জু বললে, তাতে চটবার কী আছে? তুমি এসব পছন্দ করো না, তোমার সঙ্গে আমাদের মত মেলে না। সেজন্যে রাগ করে তো লাভ নেই।

একটা শুকনো পাতা কুড়িয়ে নিয়ে সেটাকে টুকরো টুকরো করছিল পরিমল—কিছু একটা ভাবছিল। রঞ্জুর কথাটা শুনেছে অথচ যেন তার মানে বুঝতে পারেনি, এম্‌নি একটা ফাঁকা দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল খানিকটা। তারপরে আস্তে আস্তে বললে, তোদের বিশ্বাস আছে, স্বাধীনতা আসবে?

—কেন আসবে না?—রঞ্জু হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠল: তিরিশ কোটি

লোক জেগে উঠেছে। তারা আর পড়ে পড়ে পরাধানতার অপমান সহবে না।

পরিমল মৃদু হাসল।

—তা হলে এই তিরিশ কোটি জেগে-ওঠা লোক কী করবে এখন ?

—লড়াই করবে ইংরেজের সঙ্গে।

—লড়াই করবে ? বেশ, খুব ভালো কথা—এর চেয়ে ভালো কথা আর কিছুই হতে পারে না। আমি শুধু জানতে চাইছি—এই লড়াইটা হবে কী উপায়ে ?

—কেন ?—মুখস্থ করা কথাগুলো রঞ্জু আউড়ে যেতে লাগল : অহিংস আত্মত্যাগে। আইন-অমান্য আন্দোলনে। বিদেশী বয়কট করে।

পরিমল বললে, কথাগুলো শুনতে মন্দ নয়—পুণ্যি হয়। কিন্তু ওরা যদি গুলি চালায় ? মারে ?

—মরব। কত আর মারবে ? মরতে মরতেই স্বাধীনতা আসবে।

এবার খিল খিল করে হেসে উঠল পরিমল : তা হলে পাঁটা আর মুরগীর স্বাধীনতা এল না কেন আজ পর্যন্ত ? পৃথিবীর প্রথম দিনটি থেকে এ অবধি ওরাই তো মরেছে সব চাইতে বেশি !

—কিন্তু ওরা খাদ্য—পরিমলের জেরার ধরণে রঞ্জু ক্রমশ বিব্রত হয়ে উঠছিল : মানুষ তো আর খাবার জিনিস নয়। তা ছাড়া ওরা প্রতিবাদ করতে পারে না, মানুষে প্রতিবাদ করতে পারে।

পরিমল বললে, সে প্রতিবাদ কি সহিংস ?

—না, অহিংস।

—তা হলে বলির পাঁটা কাঠগড়ায় ফেলবার সময় যে ব্যা ব্যা করে ডাকে, সেটাও তো অহিংস প্রতিবাদ ?

—কী মুশকিল ! মানুষ আর পাঁটা তুমি একভাবে দেখছ কেন ?

পরিমল রঞ্জুর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল অপলক-দৃষ্টিতে : তোমার কি বিশ্বাস ওরা আমাদের মানুষ বলে মনে করে কখনো ?

—করে না ?

—নিশ্চয় না—কথাটার ওপরে অস্বাভাবিক একটা জোর দিলে পরিমল : করে না। তাই কথায় কথায় ওরা আমাদের লাথি মারে, আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে পোষা কুকুরকে রুটি খাওয়ায়। দুনিয়ার কালো জাতিদের ওপরে ওদের কোনো দরদই নেই। শিকার করার আনন্দে ওরা আফ্রিকায় গিয়ে কালো মানুষগুলোকে গুলি করে মারে। আমেরিকায় নিগ্রোদের ওপরে

চালায় অকথ্য অত্যাচার। অস্ট্রেলিয়ার সুখের রাজত্ব গড়তে গিয়ে ওরা সে দেশের লোককে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলে দিয়েছে।

ক্ষিপ্রবেগে একটা উল্কা ছুটে গেল রঞ্জুর শরীরের মধ্য দিয়ে। এ কে কথা কইছে? এ কোন্ পরিমল?

পরিমল বলে চলল, তুই বলছিলি, মানুষ খাদ্য নয়। কে বললে নয়? মানুষের চাইতে ভালো খাদ্য কি আর কিছু আছে? কালো মানুষের সর্বস্ব গ্রাস করে রাজার হালে কাল কাটায় ওরা। আমাদের সব কিছু লুটে-পুটে নিয়ে ওদের লণ্ডন ঝলমল করে ওঠে। ওরা বলে, আফ্রিকার লোকে নর-মাংস খায়। দু দশটা মানুষকে তারা খায়—আর এরা খাচ্ছে কোটি কোটি মানুষকে। তারা যদি বর্বর নরখাদক হয়, তা হলে এদের সভ্যতাটা কী রকমের?

বদলে গেছে পরিমল—এ নতুন পরিমল। গলার স্বর অল্প অল্প কাঁপছে, চকচক ঝকঝক করছে চোখ দুটো, প্রত্যেকটা কথার সঙ্গে সঙ্গে যেন কণায় কণায় ঠিকরে পড়ছে আগুন: অহিংসা দিয়ে এদের রুখতে পারবি রঞ্জু? একটা গোখরো সাপ ফণা তুলে এলে তুই কি হাত জোড় করে বলতে পারবি, ছাখো বাপু, হিংসেটা বড় খারাপ, তুমি এই তুলসীপাতাটা খেয়ে বোষ্টুম হও, তারপরে ঘরে গিয়ে দিনরাত 'নিতাই গৌর রাধে শ্যাম' বলে কেত্তন গাইতে থাকো?

—কিন্তু ওরা তো সাপ নয়।

—না। সাপের চাইতেও ওরা সাংঘাতিক। আমরা মানুষ নই—পশু; ওরা মানুষ নয়—নরখাদক। আমরা যদি মানুষ হয়ে রুখে দাঁড়াতে পারি তবে ওরাও মানুষ হবে—নইলে নয়।

—সেটা কি অহিংসা দিয়ে হতে পারে না?

—না। কোনোকালে পৃথিবীর কোনোদেশ তা পারেনি। আজও পারবে না।

—তা হলে?

—তা হলে মার খেয়ে পড়ে থাকাই সার হবে। যা এবারেও হল।

তর্কে হেরে যাওয়া জেদীর মতো ঘাড় নাড়তে লাগল রঞ্জু: তোর কথা আমি মানি না।

—বেশ তো, মানা না মানা সে তো তোরই হাত। কিন্তু দুঃখ কী জানিস? চোখ বুজে যারা যুক্তিকে অস্বীকার করে, তাদের দুর্গতি কোনোকালে ঘোচে না।

পরিমল চুপ করল, রঞ্জু চুপ করে রইল। বাগানটা নির্জন। শেয়াকুল কাঁটার হলদে ফুলের পাতলা পাপড়ির মতো পাখনা মেলে সেই প্রজাপতিটা উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, আমের গাছে শিস্ দিচ্ছে দোয়েল, মুকুলের টাটকা ভাঙা মধু খেয়ে তারও নেশা লেগেছে হয়তো। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে ধুতরো ফুলের গন্ধ, ভাঁট ফুলের গন্ধ। ওদিকের জংলা আমগাছটায় বেয়ে বেয়ে উঠেছে বুনো কাঁকরোলের ঝাঁকড়া একটা লতা, দু তিনটে মস্ত কাঁকরোল পেকে টুকটুকে হয়ে হাওয়ায় দুলছে রঙীন বেলুনের মতো। বহুদূর থেকে গুম্ গুম্ করে একটা চাপা অস্পষ্ট শব্দ আসছে—একটু আগেই যে মাল গাড়িটা সামনের রেল লাইন দিয়ে বেরিয়ে গেল, সেটা এখন কাঞ্চননদীর পুলটা পার হচ্ছে বোধ হয়।

কয়েক মিনিট কেটে গেল চুপচাপ। হাত বাড়িয়ে একটা ভাঁট ফুলের ডগা ছিঁড়ে আনল পরিমল, তারপর আস্তে আস্তে বললে, তুই বই পড়তে ভালোবাসিস রঞ্জু ?

রঞ্জু কথাভরা বোবা চোখে তাকালো। সুরটা নতুন ঠেকছে।

পরিমল আবার বলে, পড়ার বই ছাড়া আর কিছু তোর ভালো লাগে ? উপন্যাস পড়িস ?

—পড়ি বই কি। বাবার আলমারি থেকে চুরি করে আনি।

—শরৎচন্দ্রের বই পড়েছিস ?

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তো ? অনেক বই পড়েছি তার। দত্তা, শ্রীকান্ত, বিন্দুর ছেলে—

ভাঁটফুলের মঞ্জরীটা নিজের মুখের ওপরে বুলোতে লাগল পরিমল : বেশ লেখে লোকটা, তাই না ?

—চমৎকার।

পরিমল আবার চুপ করে রইল। তারপর আবার মৃদুস্বরে বললে, শরৎচন্দ্রের একখানা বই আছে, নাম শুনেছিস কখনো ? 'পথের দাবী' ?

—'পথের দাবী' ? না, শুনিনি তো।

—পড়বি বইটা ?

—দেবে ?—মন লোলুপ হয়ে উঠল তৎক্ষণাৎ।

—দেব, কিন্তু এখন নয়।—পরিমল বললে, তার আগে তোকে আরো খানকয়েক বই পড়তে হবে, নইলে সে বইটার মানে ঠিক বুঝতে পারবি না।

—বেশ তো, দাওনা বই। সাগ্রহ রঞ্জু বললে, আজই দেবে ?

—আজই ?—পরিমল আবার একটু চুপ করে রইল : আচ্ছা, আয় তবে আমার সঙ্গে।

—কোথায় ?

—কেন ?—পরিমল উজ্জ্বল ভাবে হাসল : আমাদের বাড়িতে ? বই তো আর আমি সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াচ্ছি না। তা ছাড়া—পরিমলের কথার ভেতরে একটা অস্পষ্ট গোপনতার ইঙ্গিত ফুটে বেরুল : সঙ্গে করে নিয়ে বেরুনোর মতো বইও সেগুলো নয়। একটু লুকিয়েই পড়তে হবে—ধরা পড়লে একেবারে সর্বনাশ।

—সর্বনাশ ? কেন ?

—সেটা পরে বুঝতে পারবি—পরিমলের কথায় ইঙ্গিতটা যেন চোখের চাউনিতেই এবারে পরিষ্কার হয়ে উঠল : আয় আমার সঙ্গে।

—তোদের বাড়িতে ?

—হ্যাঁরে হ্যাঁ। কেন, তোর লজ্জা করছে নাকি ?

—ধ্যেৎ, লজ্জা আবার কিসের ?—লজ্জিত মুখে রঞ্জু উঠে দাঁড়ালো।

পাড়ার সব চাইতে বড়লোকের মস্ত বড় বাড়িতে প্রথম পা দিল সে।

পরিমলেরা বড়লোক। কিন্তু কত বড়লোক সেটা ধারণা করবার জো ছিল না এতদিন। বিচিত্র চেহারার একটা মস্ত বড় ফটক—পরিমল পরে বলেছিল ওটা নাকি বানগড়ের নাগ-দরজার অনুকরণে তৈরী। দুদিক থেকে দুটো মস্ত মস্ত সাপ উঠে মাথার ওপরে একসঙ্গে ফণা মিলিয়েছে—সেখানে কালো পাথরের একটা পদ্ম বসানো। চারদিকে ঢেউ খেলানো নিচু পাঁচিল, ভেতরে ফুলের বাগান। লাল সাদা গোলাপে, স্থলপদ্মে, বড় বড় ম্যাগ্নোলিয়ায় আর নানা রঙের অজস্র ক্রোটনে বাগান আলো হয়ে আছে। লাল সুরকির ফালি ফালি পথ, হেনার ছায়াঘন কুঞ্জের ভেতরে দু-তিনটে বসবার বেদী। এককোণে সমান করে ছাঁটা চিকণ-সবুজ ঘাসের জমি, সেখানে খুঁটির সঙ্গে লোহার একটা সরু শেকল দিয়ে একটা চিতি হরিণ বাঁধা। পায়ের শব্দ পেতেই হরিণটা বড় বড় কান খাড়া করে সজাগ হয়ে উঠল, নাড়তে লাগল বেটে ল্যাজটা, তারপর আশ্চর্য গভীর নীল চোখ মেলে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে।

রঞ্জু বললে, বেশ বাগান ভাই তোদের ! আর কী সুন্দর ওই হরিণটা।

পরিমল হেসে বললে, বাগানটা বাবার সখ, আর হরিণটা মিতার।

—মিতা ! মিতা কে ?

পরিমল বললে, মিতা আমার বোন। বাবার আবার সেকেলে নামের

ওপর ঝোঁক আছে কিনা, তাই নাম দিয়েছেন সংঘমিত্রা। অতবড় নামের সংক্ষেপ হল মিতা।

মিতা! বেশ নাম তো। ওই সুন্দর হরিণটার সঙ্গে নামটিও মিলে গেছে যেন। মিতা নাম শুনলেই যেন মিতালি হয়ে যাবে মনে মনে।

পরিমল বললে, আমরা যখন ডুয়ার্সে বেড়াতে যাই, তখন মিতা বায়না ধরে হরিণের ছানাটা কিনেছিল। এখন দিব্যি বড় হয়েছে, পোষও মেনেছে। কিন্তু হলে কী হবে, দুরন্তপনার শেষ নেই। একবার ছাড়া পেলেই বাগানের ফুল-পাতা আর কিছু আস্তো রাখবে না।

হরিণটা আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। নাড়তে লাগল ছোট ল্যাজটা, নীল চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠল কান্নার আভাসে। মনে হচ্ছিল—ওদের সব কথা সে বুঝতে পারছে, বোঝাবার চেষ্টা করছে অন্তত।

পরিমল বললে, এখন আমি তোমায় আদর করতে পারব না, আমার অনেক কাজ—বুঝেছ? চল রঞ্জু, আমরা ভেতরে গিয়ে বসি।

ভারী সুন্দর বাড়ি—কিন্তু এ কী রকমের বাড়ি? এত বেশি সাজানো যে মন খারাপ হয়ে যায়। যেন থাকবার জন্যে নয়, দেখবার জন্যে। উজ্জ্বল তকতকে কালো রঙের মেজে, পা পিছলে পড়তে চায়। এখানে ওখানে নানারকম ছোটবড়ো পাথরের মূর্তি, বুদ্ধদেব, বাসুদেব এই সব। পরিমলের বাবার খেয়াল। দু-পা এগোতেই মস্ত বড় একটা হলঘর, ওদের ড্রয়িংরুম।

ঘরটায় ঢুকে বিহ্বলভাবে চারিদিকে তাকাল রঞ্জু। আকাশী নীলরঙের দেওয়ালে বড় বড় ছবি। চারদিকে নানা আকারের বসবার আসন—সোফা সেট, কাউচ। ছোট বড় টেবিলে ব্রোঞ্জের মূর্তি; দুটো ফুলকাটা কাচের ফুলদানীতে একগুচ্ছ টাটকা গোলাপ ফুল, দেখা যায় না, অথচ কোথা থেকে মিষ্টি ধূপের গন্ধ এসে ঘরটাকে ভরে রেখেছে। হঠাৎ রঞ্জু নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত মনে করতে লাগল, যেন এমন একটা জায়গাতে এসে পা দিয়েছে যেখানে তার আসা উচিত ছিল না।

পরিমল বললে, দাঁড়িয়ে পড়লি কেন? ওপরে আয়—

—ওপরে?

—হ্যাঁ, আমার পড়বার ঘরে।

ভীরু পায়ে অগ্রসর হল। অস্বস্তি লাগছে—পরিমলের ঐশ্বর্য পীড়া দিচ্ছে ওকে। ভোনা, খাঁদু, পূর্ণকে যদি ওর ভালো না লাগে, তা হলে এ জগতটাও ওর জন্যে নয়। রঞ্জুর মনে হতে লাগল এ বাড়িটা থেকে বাইরে না বেরুনো

পর্যন্ত যেন ও বুক ভয়ে নিশ্বাস নিতে পারবে না। এ ওর জায়গা নয়—এ যেন শত্রুপুরী।

হলঘরের কোণা দিয়ে সাদা ঝকঝকে সিঁড়ি। এত পরিষ্কার যে কল্পনাও করা যায় না। ওই সিঁড়িটা দিয়ে ওপরে উঠতে হবে? কী আছে ওপরে, কী আশ্চর্য রহস্য আছে সেখানে। সাবধানে পা ফেলে ফেলে উঠতে লাগল রঞ্জু। ভয় করছে, আশঙ্কা হচ্ছে। তার ময়লা পায়ের ছোঁয়া লেগে এমন চমৎকার সিঁড়িটাই বা নোংরা হয়ে যাবে হয়তো!

ওপরে উঠে দুপা এগোলেই পরিমলের পড়বার ঘর। কাচের দরজা ঠেলে পরিমল ডাকলে, আয় রঞ্জু, বোস।

পড়বার ঘরই বটে। ছোট্ট ঘর। কিন্তু নিখুঁত নিপুণভাবে গোছানো। সামনেই মস্ত বড় খোলা জানালা, তাই দিয়ে চমৎকার দেখা যায় নিচে ওদের বাগানটাকে, মিউনিসিপ্যালিটির রাঙা সুরকির রাস্তাটাকে, তার ওপারে ছোট ছোট বাড়িগুলোকে পর্যন্ত। সেই নারকেলগাছগুলোর দুলুনি বয়ে শির শির করে মিঠে হাওয়া ঢুকছে ঘরে। জানালা ঘেঁষে বড় একটা লম্বা টেবিল, কয়েকখানা ঝকঝকে বই তার ওপরে পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো; দোয়াতদানি, কলম, পেন্‌সিল, ব্লটিংপ্যাড। দুখানা গদী আঁটা চেয়ার, ফর্সা তোয়ালে দিয়ে ঢাকা। ঘরের তিন দিকে আলমারি—রকমারি অজস্র বইতে একেবারে ঠাসা। একটা ছোট কাঠের স্ট্যাণ্ডের উপরে রূপোর ফ্রেমে আঁটা দুখানি ছবি; একখানা রঞ্জু চিনল—রবীন্দ্রনাথ; আর একখানা পরিমল পরে বলে দিয়েছিল—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পরিমল বললে, এই হল আমার পড়বার ঘর। ঠিক আমার নয়—আমাদের দুজনের—আমার আর মিতার। এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে বোস, বাড়ির কেউ এদিকে আসবে না।

ইতস্তত করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল রঞ্জু। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারটা আধখানা প্রায় নিচের দিকে টেনে নিলে তাকে—ভয় করতে লাগল ছিঁড়ে একেবারে পড়ে না যায়। কিন্তু সহজ বুদ্ধিটা তাকে বলে দিলে এটা স্প্রিংয়ের চেয়ার, এদের ধরণই এই।

পরিমল বললে দাঁড়া, তা হলে একটু চায়ের জোগাড় করি।

—চা?

—হ্যাঁ, একটু চা না হলে জমবে কী করে।

—কিন্তু ভাই, চা তো আমি বিশেষ খাই না।

—এক কাপ খেলে কোনো ক্ষতি নেই। বোস, আমি দু মিনিটের মধ্যেই আসছি।

চটিটার শব্দ করে বেরিয়ে গেল পরিমল।

রঞ্জু বসে রইল অভিভূত হয়ে। জলের মাছ ডাঙায় উঠে আসবার মতো কেমন একটা অনুভূতি হচ্ছে তার। নিজেকে অত্যন্ত বিপন্ন আর বিব্রত বোধ হচ্ছে। অসীম আশঙ্কাভরে রঞ্জু ভাবতে লাগল, এখন যদি এ ঘরে এসে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে কেউ যে সে কে এবং কেন এসেছে—তা হলে তার অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে। নিশ্চয়ই মুখে কথা আটকে আসবে—উত্তর জোগাবে না, তারপর আত্মরক্ষার জন্যে মরিয়া হয়ে সামনের জানালাটা দিয়ে সোজা নিচের বাগানটায় ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হবে তাকে।

রঞ্জু টের পেল বাইরে থেকে এত বেশি হাওয়া আসছে বটে, তবু তার জামাটা ভিজে উঠেছে ঘামে, তার কপাল বেয়ে গড়িয়ে নামছে দু ফোঁটা ঘাম। নিরুপায় হয়ে নিজেকে সে সামলে নেবার চেষ্টা করলে খানিকটা। তারপর ওই বিশ্রী চিন্তাটার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে প্রথমটা কড়িকাঠে, তারপরে চোখ বুলোতে লাগল দেওয়ালের গায়ে।

এখানেও ছবি, এখানেও দেওয়ালে খানকয়েক যত্ন করে টাঙানো। সব চাইতে বড় ছবিখানা অয়েল-পেন্টিং—টকটকে চওড়া লালপেড়ে শাড়ীপরা, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা সুন্দর চেহারার একটি মহিলা। রঞ্জুর দিকে যেন নিবিড় স্নেহভরে তাকিয়ে আছেন তিনি। ছবিটার ওপর এক ছড়া শুকনো মালা দুলছে। পরিমলের মা নেই শুনেছিল, বোধ করি ইনিই মা। তা ছাড়া আরো খানতিনেক ছবি আছে, কিন্তু সব অপরিচিত মুখ, রঞ্জু তাদের কাউকে চিনতে পারল না।

দেওয়াল থেকে চোখ নামিয়ে টেবিলের দিকে মনোনিবেশ করলে সে। ভীরু হাতে একটা বই টেনে নিতেই নিজেই অজ্ঞাতসারে খুশি হয়ে উঠল—বাঃ, খাসা বই। রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'।

প্রথম পাতাটা ওল্টাতেই চোখে পড়ল পরিষ্কার বইয়ের মালিকের নাম লেখা: কুমারী সংঘমিত্রা লাহিড়ী। সংক্ষিপ্ত 'মিতা' নামটি, পোষা হরিণটা আর এই হাতের লেখা—সব যেমন হওয়া উচিত তেমনি। খারাপ হাতের লেখা দেখতে পারে না রঞ্জু, কেমন নোংরা মনে হয়—শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যায় মানুষের ওপরে কিন্তু মিতা তাকে নিরাশ করে নি।

রঞ্জু পাতা ওলটাতে লাগল, তারপর এক জায়গায় গিয়ে দৃষ্টিটা থেমে

পড়ল তার। লাল-নীল পেন্‌সিল দিয়ে ভারী যত্ন করে দাগানো একটা কবিতা, খুব মন দিয়ে বোধ হয় মিতাই সেটা পড়েছে। কবিতার নাম "গুরুগোবিন্দ।"

গুরুগোবিন্দের নামটা জানা আছে ইতিহাসের পাতায়, কিন্তু সে মানুষটিকে নিয়ে এমন কী কবিতা লেখা সম্ভব—যা এত করে দাগ দিয়ে পড়তে হবে?

রঞ্জু আকৃষ্ট হল কবিতার দিকে। কিন্তু লাইন কয়েক পড়তেই কবিতাটার সুর আর ছন্দ তার রক্তের মধ্যে যেন দোলা ধরিয়ে দিলে। কী প্রদীপ্ত কী অপূর্ব উজ্জ্বল কবিতা। কেন সে এতদিন এমন একটা কবিতা পড়তে পায়নি! গুন্ গুন্ করে রঞ্জু দাগানো লাইনগুলো পড়ে যেতে লাগল :

"হায় সে কি সুখ, এ গহন ত্যজি
হাতে লয়ে জয়তূরী,
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে,
রাজ্য ও রাজ্য ভাঙিতে গড়িতে
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি—"

নিজেই সে বুঝতে পারল না, কবিতার দ্রুতগতির সঙ্গে সঙ্গে কখন তার অপরিচিত পরিবেশের ভয় কেটে গেছে, মন থেকে মুছে গেছে অনধিকারের সংশয়। তার গলার স্বর ক্রমশ ওপরে উঠতে লাগল :

তুরঙ্গসম অন্ধ-নিয়তি
বন্ধন করি তায়,
রশ্মি পাকড়ি আপনার করে
বিঘ্ন বিপদ লঙ্ঘন করে
সময়ের পথে ছুটাই তাহারে
প্রতিকূল ঘটনায়—"

পেছন থেকে হাসিভরা মুখে পরিমল বললে, বাঃ, কবি যে একেবারে ভাবের রাজ্যে তলিয়ে গেলি দেখছি!

চটকা ভেঙে গেল রঞ্জুর। মুহূর্তের মধ্যে স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে সে সজাগ হয়ে উঠল। মনে হল অন্যায় করে ফেলেছে, মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, করেছে অনধিকার-চর্চার অপরাধ। সসংকোচে বইটা বন্ধ করে সে সরিয়ে রাখল, একটা ঢোঁক গিলে নিয়ে বললে, এই—একটু দেখছিলাম।

পরিমল হাসল, পাশের চেয়ারটাতে বসল এসে। বললে, কী বই পড়ছিলি? কথা ও কাহিনী?

রঞ্জু মাথা নাড়ল।

—ঠিক ধরেছি, নিশ্চয় কবি তুই! তাই কবিতার বইয়ের ওপরে এত ঝোঁক—নিজের আবিষ্কারের আনন্দে অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠল পরিমল।

—যাঃ বাজে কথা—লজ্জায় রঞ্জু ততক্ষণে আরক্তিম।

কিন্তু বরাত ভালো, এবারেও পরিমল নিজে থেকেই প্রসঙ্গটা বদলে দিলে। বললে, বলে এলাম, এক্ষুণি চা আসবে। আচ্ছা, দেওয়ালের ওই ছবিগুলোকে চিনতে পারিস?

—উনি বোধ হয় তোর মা।

—ঠিক ধরেছিস। আর ওগুলো?

—চিনতে পারলাম না।

—তোর দোষ নেই ভাই, দেশের দুর্ভাগ্য। সমস্ত ভারতবর্ষের যাঁরা সত্যিকারের গৌরব, তাঁদের ভুলে যাওয়াই রেওয়াজ আমাদের।

—কিন্তু ওঁরা কারা পরিমল?

পরিমল ছোট একটা নিশ্বাস ফেলল: আর একদিন বলব, আজ থাক।

আজ থাক। এ কথাটা আরো দু-একবার রঞ্জু শুনেছে ওর মুখে। প্রথম বোধ হয় বলেছিল সেই নিরালা কাঞ্চননদীর ধারে। কী একটা জিনিষ একান্তভাবে বলতে চাইছে, কিন্তু বলতে পারছে না; কোথায় আটকে যাচ্ছে—কোথা থেকে একটা সংকোচ এসে বাধা দিচ্ছে তাকে। কী এমন একটা কথা, কিসের জন্যে এত সংকোচ পরিমলের? একবার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হল—কিন্তু কী যে হয়েছে পরিমলের ছোঁয়া লেগে, ওরও কথা আটকে এল।

ভালো লাগছে না রঞ্জুর, কেমন বিরক্তি লাগছে একটা। কাছে থেকেও কাছে নেই পরিমল—চোখের দৃষ্টিতে ঘনিয়ে আছে দূরাস্তীর্ণ একটা অন্যমনস্কতা। কী যেন ভাবছে, অত্যন্ত নিবিড়ভাবে ভাবছে। অথচ সে ভাবনাটাকে অনুমানও করবার ক্ষমতা নেই রঞ্জুর—সে ভাবনার সে অংশও নিতে পারবে না। একেবারে পাশটিতে বসে-থাকা মানুষের সঙ্গেও যে মনের হাজার মাইল জোড়া দুস্তর ব্যবধান ছড়িয়ে থাকে তার পরিচয় রঞ্জু পেলো এই প্রথম।

এ ভাবে চুপ করে বসে থাকা চলে না আর। রঞ্জু বললে, কই বই দিবি না?

—হ্যাঁ দিচ্ছি—

পরিমল উঠল। রঞ্জু আশা করেছিল বড় একটা আলমারীর ভেতর থেকে একরাশ ঝকঝকে বই বার করে আনবে ও। কিন্তু তা করল না পরিমল। ঘরের এক কোণে একটা শেল্ফ—যেখানে একরাশ মাসিকপত্র আর খবরের কাগজে ডাঁই হয়ে উঠেছে, সেই স্তূপ ঘেঁটে কাগজের প্যাকেট বের করলে একটা। রঞ্জু হতাশ হল অত্যন্ত।

—দেখি, কী বই ?

—একটু পরে।—প্যাকেটটা কোলের ওপর নিয়ে পরিমল মিনিটখানেক চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বললে, আচ্ছা রঞ্জু !

—কী ?

—সত্যিই কি বিশ্বাস করিস অহিংসা দিয়ে স্বাধীনতা আসবে ?

রঞ্জু হাসল : আবার ও কথা তুলছ কেন ?

—না, এম্‌নি।—পরিমল আবার চুপ করে রইল খানিকটা : আচ্ছা, তুই বিপ্লববাদীদের কথা শুনেছিস কখনো ?

—শুনেছি বইকি।—রঞ্জু সোৎসাহে বললে, তারাই বোমা ছুঁড়েছে, গুলি করেছে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে। ভয়ঙ্কর লোক সব—শৈশবের সংস্কারে ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল : নিশ্চয় ক্ষুদিরামের দল।

পরিমল হঠাৎ নড়ে চড়ে বসল চেয়ারটাতে, কেমন অদ্ভুতভাবে তাকালো রঞ্জুর দিকে।

—খুব ভয়ঙ্কর লোক ওরা, না ?

—নিশ্চয়, কোনো সন্দেহ আছে ? যারা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে গুলি মারতে পারে, অসাধ্য কাজ আছে তাদের ?

পরিমল ঠোঁটে আঙুল দিলে। স্-স্-স্—আস্তে।

কাচের দরজা ঠেলে একটা চাকর ঢুকল। বাক্সের ডালার মতো একটা কাঠের পাত্রে করে (পরে জেনেছিল ওকেই ট্রে বলে) দু পেয়ালা চা আর দু রেকাবী খাবার এনে রাখল টেবিলের ওপরে।

—নে রঞ্জু।

—সে কিরে, এত খাবার কেন ? না, না ওসব আমি খাব না।

—আচ্ছা লাজুক ছেলে তো তুই। খাবার নিয়ে কখনো লজ্জা করতে আছেরে বোকা! পাওয়ামাত্র মুখে পুরে দিতে হয়—এই হচ্ছে বুদ্ধিমানের নিয়ম। নে, নে চটপট—

থালায় লুচি, মিষ্টি, আলু আর বেগুন ভাজা। সোনালি ফুল-পাতা আঁকা

নীল রঙের পেয়ালাতে সোনালি রঙের চা। খাওয়ায় চাইতে দেখতেই যেন বেশি ভালো লাগে।

—কেন আবার এত সব—

বাধা দিলে পরিমল: মিতা পাঠিয়ে দিয়েছে, আমার কিছু বলবার নেই।

মিতা! সত্যি, বেশ নাম। আদর করে যেন বারবার নাম ধরে ডাকতে ইচ্ছে করে। রঞ্জুর চমৎকার লাগল লুচিগুলো, অনভ্যস্তভাবে চায়ে চুমুক দিয়ে জিভ একটু পুড়ে গেল বটে, তবু সে চায়ের স্বাদ এত ভালো লাগল বলবার নয়।

খাওয়া শেষ হল নিঃশব্দে। একটু পরেই চাকরটা এসে যখন পেয়ালা পিরিচগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল, তখন আবার পুরোনো কথায় খেই ধরলে পরিমল।

—তুই যেন কী একটা কথা বলছিলি? ক্ষুদিরামের দল—

রঞ্জু অপ্রতিহতভাবে বললে, তাইতো শুনেছি।

—জানিস, কে ক্ষুদিরাম?

রঞ্জু বিব্রত বোধ করতে লাগল: শুনেছি অল্প অল্প।

—কী শুনেছিস? তেম্‌নি বিচিত্রধরণে রঞ্জুর মুখের দিকে পরিমল তাকিয়ে রইল।

শুনেছি—সন্দিগ্ধচোখে পরিমলের মুখভাবটা লক্ষ্য করে রঞ্জু বললে, মাটির তলায় তার কামানের কারখানা আছে।

—আর?

—আর রঞ্জু একটা ঢোঁক গিলল: ক্ষুদিরাম লাটসাহেবকে মারতে চেষ্টা করেছিল।

হঠাৎ শব্দ করে সকৌতুকে পরিমল হেসে উঠল।

কেমন যেন একটা চমক লাগল তখনি। বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়ে গেল বহুদিন আগেকার একটা কথা। ক্ষুদিরামের আলোচনা প্রসঙ্গে এম্‌নি করেই সেদিন অবিনাশবাবু হেসে উঠেছিলেন। আজ পরিমলের কণ্ঠে যেন তাঁরই সেই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল।

হাসি বন্ধ করলে পরিমল। তারপর শান্ত গম্ভীর স্বরে বললে, তুই ভুল শুনেছিস রঞ্জু।

কোথাও একটা ভুল আছে এটা রঞ্জু নিজেও অনুমান করেছিল। ক্ষীণভাবে বললে, তবে যে বৈরাগী গাইছিল—

—বৈরাগী ?—পরিমল আবার হাসল, কিন্তু এবারে নিঃশব্দে।

রঞ্জু অভিভূত হয়ে আসছিল। আস্তে আস্তে বললে, তুমি জানো কিছু ক্ষুদিরাম সম্বন্ধে ?

—জানি।

—জানো ?—রঞ্জুর শরীরটা শিরশির করে উঠল। শূন্য কল্পনায় একটা অন্ধকার সমুদ্রে সাঁতার দিতে দিতে এতদিন পরে কূল দেখতে পেয়েছে যেন। উদগ্র আকুলতায় একটা তরঙ্গ এসে তার বুকের পাঁজরায় উচ্ছ্বসিত আবেগে ঘা দিতে লাগল : কী জানো তুমি ?

—অনেক কথাই জানি। তুই জানতে চাস ?

রঞ্জু মাথা নাড়ল। কথা বলবার শক্তি নেই তার।

পরিমল খবরের কাগজের প্যাকেটটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। চাপা গলায় বললে, ক্ষুদিরামের কথা আমি নিজে কিছু বলব না, এই বইগুলোই বলবে। কিন্তু একটা কথা আছে রঞ্জু।

—কী কথা ভাই ?

—বইগুলো লুকিয়ে রাখতে হবে—লুকিয়ে পড়তে হবে, লুকিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

—কেন ?—রঞ্জুর মুখে বিস্মিত কৌতূহল।

—কেন ?—পরিমল কঠিনভাবে বললে, যারা আমাদের গলা টিপে রাখতে চায়, তারা যে ওদের পরিচয় আমাদের জানতে দেবে না ভাই।

রঞ্জু হতাশভাবে বললে, তোর কথা কিছু বুঝতে পারছি না পরিমল।

—বইগুলো পড়লেই বুঝতে পারবি। পৃথিবীর সমস্ত বিপ্লবীর পরিচয়ই যে প্রথম অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে আসে। দুর্যোগের ভেতরে তারা আমাদের হাত বাড়িয়ে দেয় স্বাধীনতার আলোয় এগিয়ে যাওয়ার জন্যে।

সুন্দর ভাবে, যেন ছাপার অক্ষরে সাজিয়ে কথাগুলো বলে গেল পরিমল। আর ওদিকে আবার একটা তীব্র বিদ্যুৎতরঙ্গ চমকে উঠল রঞ্জুর শরীরের মধ্যে।

—বিপ্লবী !

—হাঁ বিপ্লবী। আর বিপ্লবী শহীদদের একজন অগ্রদূত ক্ষুদিরাম।

রঞ্জু বিহ্বলভাবে বলে ফেলল : তুমি কি বিপ্লবীদের দেখেছ পরিমল ? চেনো তাদের ? চট্টগ্রামের সর্বনেশে মানুষগুলোকে তুমি কি দেখেছ কোনোদিন ?

—আচ্ছা ছেলেমানুষ তুই রঞ্জু !—পরিমল যেন লঘু কৌতুকে আবার সহজ হয়ে উঠল : তারা ভয়ঙ্কর লোক, আমি নিরীহ জীব, তাদের চিনব কী করে ?

তবে তুই যদি চিনতে চাস ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

—আমি!

—হ্যাঁ, তুই। ভয় কি, তারা বাঘভালুক নয়। তারাও আমাদের মতোই সহজ মানুষ—শুধু তাদের মনটা বজ্র দিয়ে গড়া। আমাদের পাশে পাশেই তো দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমরা চিনতে পারি না।—পরিমল যেন সামলে নিলে নিজেকে : যাক গে, ও সমস্ত বাজে কথা এখন থাক। চল, বইগুলো তোর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।

প্যাকেটটা ততক্ষণে পরিমল লুকিয়ে নিয়েছে জামার নিচে। দুজনে উঠে পড়ল, তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে, হলঘর পেরিয়ে আবার বাগানে চলে এল।

আর সেইখানেই দেখা হল মিতার সঙ্গে।

প্রাচীরের ধারে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি—কিছু ভাবছিল বোধ হয়। ওদের কথাবার্তার শব্দে ফিরে তাকালো।

তেরো-চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে, অর্থাৎ বয়সে রঞ্জুরই সমান। টুকটুকে রং, কপালে কাঁচপোকার সবুজ টীপ, পরণে ডুরে-পাড় শাড়ী। আশ্চর্য স্বকুমার আর শান্তদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ওদের দিকে।

পরিমল বললে—মিতা, এ আমার বন্ধু রঞ্জু—রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

দুখানি ছোট হাত কপালে ঠেকিয়ে স্নিগ্ধ স্বরে মিতা বললে, নমস্কার!

নমস্কার! রঞ্জু নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তাকেও কেউ কোনোদিন নমস্কার জানাবে—ছোট্ট, ভীরু রঞ্জু একদিন নমস্কার পাওয়ার মতো বড় হয়ে উঠবে, একথা কি কখনো কোনো কল্পনাতেও ছিল তার। প্রতিনমস্কার করল না রঞ্জু, শুধু অর্থহীনভাবে কিছু একটা বলবার চেষ্টা করে দ্রুত ফটকটার বাইরে চলে গেল।

পরিমল বললে, কি রে, অমন করে দৌড়ে পালাচ্ছিস্ যে? ভয় পেলি নাকি? দাঁড়া, দাঁড়া, আমিও আসছি—

পেছন থেকে রঞ্জু শুনতে পেল—মিতার মিষ্টি খিল্ খিল্ হাসির শব্দে সমস্ত বাগানটা ভরে উঠেছে। তার পালানোটা ভারী উপভোগ করেছে সে।

সে প্রথম। সেই হাসির শব্দই বালক রঞ্জুকে হঠাৎ জাগিয়ে দিলে কৈশোরের রঞ্জনের মধ্যে। বাগানের ফুলে ফুলে দোলা লাগিয়ে আসা এক ঝলক বাতাসে একটা নতুন চঞ্চলতা জেগে উঠল মনে।

বাল্য থেকে কৈশোরে : কল্পনার রূপকথা থেকে জীবনের রূপকথায়! সেই প্রথম নমস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই রঞ্জুর কথা শেষ হল, স্বরু হয়ে গেল রঞ্জনের কাহিনী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

—নয়—

পরিমল এল তার দিন দুই পরে।

এর ভেতরেই বই দুখানা পড়ে ফেলেছে রঞ্জন, গিলেছে গোগ্রাসে। এক-খানার নাম 'ফাঁসির ডাক', আর একখানা 'শহীদ সত্যেন'। একখানার ওপরে একটা ফাঁসির দড়ির ছবি—একটি ছেলে হাসিমুখে সে দড়ি গলায় জড়িয়ে নিচ্ছে; আর একখানার মলাটে একটা রিভলভার আঁকা—তার মুখ থেকে লাল আগুন আর কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। বই দুটোর মলাটের দিকে তাকালেই গা শির শির করে ওঠে।

কিন্তু শুধুই কি মলাট? ভেতরের প্রতিটি পাতায় আশ্চর্য সব লেখা, তার প্রতিটি পংক্তিতে যেন বজ্রের গর্জন, তার প্রতিটি হরফ থেকে যেন রক্তের বিন্দু আর আগুনের কণা পড়ছে ঠিকরে ঠিকরে। রঞ্জনের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। টগ্ বগ্ করে ফুটতে লাগল তার বুকের ভেতরে।

এই তো এতদিন পরে পাওয়া গেল তার সত্যিকারের পথ, উত্তর মিলল মনের ভেতরে সঞ্চিত এতদিনের পুঞ্জ পুঞ্জ জিজ্ঞাসার। উনিশ শো তিরিশ সালের লবণ-সত্যাগ্রহ, আইন-অমান্য, বিলাতী-বর্জন—এই চরকা-লাঞ্ছিত অহিংস-পথ—এ আমাদের জন্যে নয়। এ স্থবিরের ধর্ম, কাপুরুষের মনোবিলাস। পলাশীর মাঠে যে সূর্য ডুবেছিল—তা রক্ত মাখা, রক্তের মধ্য দিয়েই ইংরেজ কোম্পানি সেদিন পথ করে গিয়েছিল সুতানুটি-কলিকাতা-গোবিন্দপুর থেকে দিল্লীর ময়ূর-সিংহাসন পর্যন্ত, কাশ্মীরের তুষার-শুভ্রতা থেকে কুমারিকা-অন্তরীপের নীলিমা-বিস্তার পর্যন্ত। আজ সেই অধিকার থেকে তাকে তাড়াতে হলে সেই রক্তের পথ ছাড়া আর কোনো পথই নেই—উত্তরের শুভ্র তুষার থেকে সুরু করে দক্ষিণের নীল সমুদ্র পর্যন্ত রক্তে আজ রাঙা করে দিতে হবে। দেশমাতার যেরূপ আজ আমরা 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে বন্দনা করি তা ষড়ৈশ্বর্যময়ী কমলদলবিহারিণী কমলার রাজরাজেশ্বরী মূর্তি নয়; সমস্ত ভারতবর্ষের কালো আকাশে তাঁর খেটক-খর্পর প্রসারিত করে দিয়ে দাঁড়িয়েছেন ভয়ঙ্করী চামুণ্ডা, মহামেঘের মতো বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে তাঁর উত্তাল কেশমালা,

রুধিরক্রতি হচ্ছে তাঁর কণ্ঠবিলম্বী নরমুণ্ডের হারে, রক্তলোলুপার অট্টহাসি ধ্বনিত হচ্ছে দিকে দিকে—'ম্যায় ভুখা হুঁ'—

বইয়ের পাতায় পাতায় সেই চামুণ্ডার আবাহন, ছত্রে ছত্রে সেই ভয়ঙ্করীর বন্দনা। রুদ্ধশ্বাসে রঞ্জন পড়ে যেতে লাগল : "চক্রান্ত, শঠতা এবং প্রচণ্ড দমন-নীতির সাহায্যে পৌনে দুইশো বছর ধরিয়া ইংরেজ আমাদের শাসন করিতেছে। কিন্তু ইহা শাসন নয়, শোষণ। রক্তলোভী শয়তানের মতো সে প্রতিমুহূর্তে আমাদের বুকের রক্ত শুষিয়া খাইতেছে, কাড়িয়া লইয়াছে শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি। দেশ-জোড়া একটা গোলামখানা বানাইয়া ইংরেজ আর তার পোষা কুকুরের দল, তার ঘৃণ্য টিকটিকিবাহিনী অবাধে রাজত্ব করিতেছে; তাহাদের চাবুকের ঘায়ে যখন পিঠের চামড়া রক্তাক্ত হয়, তাহাদের বুটের লাথি খাইয়া যখন প্লীহা ফাটে, তখনো এই গোলামেরা দাঁত বাহির করিয়া হাসে, সরকারকে সেলাম বাজাইয়া এবং রায়বাহাদুরী খেতাব পাইয়া ধন্য হয়!"

পড়তে পড়তে যেন দম আটকে আসতে লাগল, মন্ত্রমুগ্ধের মতো পাতার পর পাতা উল্‌টে চলল সে :

"কিন্তু সে গোলামের দলে আমরা নই। স্বাধীন ভারতবর্ষে আমরা স্বাধীন মানুষ হইয়া দাঁড়াইব। ভারতবর্ষের এক ইঞ্চি জমিতে একজন ইংরেজেরও জায়গা হইবে না। নীল চাষের নামে যারা বাংলার কৃষককে নির্মমভাবে নির্যাতন করিয়াছে; বাংলার তাঁতীদের আঙুল কাটিয়া যারা আমাদের বুকের ওপর ফাঁদিয়াছে ম্যাঞ্চেস্টারী শোষণ-যন্ত্রের বনিয়াদ; সিপাহী-বিদ্রোহ দমনের নামে যারা শত শত নিরপরাধ মানুষের তাজা চামড়া উপড়াইয়া হিন্দুর গায়ে গোরুর—আর মুসলমানের গায়ে শূয়োরের ছাল বসাইয়া চর্বি মাখাইয়া জ্যান্ত আগুনে পোড়াইয়া মারিয়াছে, কামানে গোলার বদলে যারা মানুষকে ব্যবহার করিয়াছে; জালিয়ানওয়ালার শত শত নিরস্ত্র অহিংস-নরনারীকে মেশিন গান চালাইয়া হত্যা করিতে যাদের বাধে নাই; যাদের ফাঁসিকাঠ আমাদের শত-শহীদের মৃত্যু দিয়া চিহ্নিত, যাদের কারাগারে শত শত দেশসেবক তিলে তিলে আত্মদান করিয়াছে—সেই শয়তানদের জন্য কোনো ক্ষমা আমাদের অভিধানে নাই। ইহার প্রতিটির জন্য আমরা বিচার করিব, এই অত্যাচারের প্রত্যেকটির প্রতিশোধ আমরা লইব। অহিংসার ভাঁওতায় ভুলিয়া দক্ষিণ-পন্থী কংগ্রেসের সঙ্গে সুর মিলাইয়া রিফর্মের অথবা স্বায়ত্তশাসনের কাঁচ-কলা হজম করিতে আমরা রাজী নই। বাঘের মুখের সামনে ছাগলের অহিংস-নৃত্য জাতির অপমান মনুষ্যত্বের অপমান। দেশমাতার পূজা-মণ্ডপে আজ ইংলণ্ডের শাদা-

পাঁটাদের বলি দিয়াই আমরা স্বাধীনতার বোধন করিব।"

এ শুধু লেখা নয়—লেখার মধ্য দিয়ে যেন সেই বলির বাজনা বাজছে। রক্ত চাই—অত্যাচারীর রক্ত দিয়ে আমাদের স্বাধীনতাকে শোধন করে নিতে হবে। ভারতবর্ষের মাটিতে যতদিন একজন ইংরেজ থাকবে ততদিন জানব আমাদের শৃঙ্খল মোচন হয় নি। আর তার একটিমাত্র উপায় হচ্ছে সশস্ত্র বিপ্লব, রক্তাক্ত ভয়ঙ্করের পথে অভিযাত্রা।

এই ভয়ঙ্কর অভিযানের কাহিনী আছে দ্বিতীয় বইটিতে। আছে ক্ষুদিরামের কথা। তার স্বপ্নে দেখা ক্ষুদিরাম, খেড়ে ছেলে অশ্বিনীর মুখে শোনা 'নিখিলিস্ট্' ক্ষুদিরাম, বৈরাগীর গানের ক্ষুদিরাম। বালক রঞ্জনের অপরিণত ভাব-বিলাসী মন মাত্র কয়েকটি পাতার মধ্য দিয়ে যেন হাজার হাজার বছরের নিষ্ঠুর কঠিন বাস্তব অভিজ্ঞতার পথ পার হয়ে গেল। আশ্চর্য, কোথায় লুকিয়েছিল এসব, কোথায় প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল এই অপরূপ জগতের কাহিনী? এই সামান্য কয়েকটি পাতার ইন্দ্রজালের মধ্য দিয়ে অনেকগুলো কালো পর্দা তার দৃষ্টির সামনে থেকে সরে গেল, আবিষ্কৃত হয়ে 'গেল রহস্যের এক বিশাল রত্নভাণ্ডার।

মা এসে বাইরে থেকে ডাকলেন, ছেলের আজ হল কি?

চমকে উঠল, ধ্বক্ করে দুলে উঠল হৃৎপিণ্ড। নক্ষত্রবেগে বইখানা চালান হয়ে গেল 'সরল জ্যামিতি'র তলায়। মা টের পান নি তো!

মা আবার বললেন, গল্পের বই জুটিয়েছ বুঝি? তাই মনসাতলার দিকে মন নেই?

আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে রইল সে—মা যদি বই দেখতে চান তা হলেই সর্বনাশ। কিন্তু হেঁসেলে হাঁড়ি চাপিয়ে এসে তাঁর দাঁড়াবার সময় ছিল না, মা চলে গেলেন।

আবার বই খুলল রঞ্জন। এক অজ্ঞাত অদ্ভুত জগতের বিচিত্র ইতিহাস। এ ইতিহাস মেলে না ক্লাসে-পড়া তোগলক-বংশ আর লর্ড বেণ্টিঙ্কের সুশাসনের মধ্যে, এ ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না অ্যালফ্রেড্ দি নোব্লের মহত্বের বিবরণীতে। মাটির তলায় ক্ষুদিরামের গোপন কারখানার মতো একটা অদৃশ্য পাতালপুরী থেকে কাল-নাগিণীর ফণার মতো এ উদ্যত হয়ে উঠল, এর প্রতিটি পাতায় পাতায় সাপের বিষের তীব্র জ্বালা!

সে পড়ে যেতে লাগল:

"কিন্তু মীরজাফর-আমিরচাঁদ-জগৎশেঠের বংশধরদের মৃত্যু নেই। তারই প্রমাণ পাওয়া গেল মাণিকতলা বোমার মামলায়। বিশ্বাসঘাতক নরেন

গোস্বামী হল রাজসাক্ষী। বিভিন্ন বন্দীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সে ভেতরের খবর বের করবার চেষ্টা করতে লাগল। সত্যেন বসু আর কানাইলাল দত্ত এই বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দেবার সংকল্প গ্রহণ করলেন।

ঘটনার দিন হাসপাতালে অসুস্থ সত্যেন নরেন গোস্বামীকে ডেকে পাঠালেন তার কাছে জবানবন্দী দেবার জন্য। নতুন শিকারের আশায়, নতুন তথ্য জানবার লোভে বিশ্বাসঘাতক নিশ্চিন্ত মনে দেখা করতে গেল। দু-চারটে কথার পরই সত্যেন রিভলবার বের করে গুলি করলেন, আহত দেশদ্রোহী আর্তনাদ করে ছুটে বেরুল।

কিন্তু মাঝপথে মৃত্যুদূতের মতো আবির্ভূত হলেন কানাইলাল। রিভলবার হাতে তিনি অনুসরণ করলেন পলাতক বিশ্বাসহন্তাকে। জেলারের আফিসে পৌঁছুবার আগেই জাতির কলঙ্ক নরেন গোস্বামীর রক্তাক্ত মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ইংরেজের কাছ থেকে ইনাম পাওয়ার আগেই ঘরশত্রু বিভীষণ দলের বিপ্লবী বীরদের কাছ থেকে পেল তার দেশদ্রোহিতার চরম পুরস্কার।"

ঠিক হয়েছে। অসহ্য আক্রোশে গর্জন করে মন বললে, ঠিক হয়েছে। আজ এমনি করেই একটার পর একটা দেশের শত্রুদের নিপাত করা দরকার। দেশ জুড়ে নরেন গোস্বামীর রক্তবীজেরা টিকটিকি রূপে ছড়িয়ে আছে, তারা নিজেদের শত্রু—তারা জাতির আবর্জনা। এই আবর্জনাগুলো পরিষ্কার না করা পর্যন্ত স্বাধীন ভারতবর্ষ একটা অসম্ভব কল্পনা, একটা অবাস্তব ব্যাপার।

রক্তের মধ্যের যেন বিদ্যুৎ ছুটতে লাগল। সেও যদি এই মুহূর্তে একটা রিভলবার হাতে পায় তাহলে একটা বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারে। ক্ষুদিরাম, সত্যেন, বীরেন গুপ্ত, গোপীনাথ সাহা কিংবা চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীর মতো সেও বেরিয়ে পড়তে পারে হত্যার অভিযানে। একটা রিভলবারে কটা গুলি থাকে—পাঁচটা, ছ'টা? যদি ছ'টা গুলি থাকে তা হলে তার পাঁচটা দিয়ে সে পাঁচজন বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করবে, আর বাকীটা—বাকী বুলেটটা সে খরচ করবে নিজের বুকে, হাসতে হাসতে প্রাণ দেবে বীর প্রফুল্ল চাকীর মতো।

দেশের জন্যে মরা! সে কি আশ্চর্য গৌরব—সে কি অপূর্ব সার্থকতা! ফাঁসির দড়ি হোক গলার মণিহার, পিস্তলের গুলি হোক দেশমায়ের আশীর্বাদ! নতুন দিনের স্বাধীন ভারতবর্ষের যে ইতিহাস লেখা হবে অক্ষয় অক্ষরে, সে ইতিহাসের পাতায় জ্বল জ্বল করতে থাকবে আরো অগণিত শহীদের সঙ্গে তারও নাম। সেদিন দেশের ছেলেরা তারও উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাবে, 'ফাঁসির সত্যেনে'র সঙ্গে সঙ্গে আর একটি নামও লেখা হয়ে যাবে: 'ফাঁসির রঞ্জন।'

রঞ্জন উঠে দাঁড়ালো। পায়চারী করতে লাগল ঘরময়। মনটা একটু অন্তর্মুখী হলেই তার পুরোনো পাগলামি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা আবৃত্তি করে যেতে ইচ্ছে করে। পায়চারী করতে করতে আউড়ে চলল :

"সম্মুখে যে আসে সরে যায় কেহ,
পড়ে যায় কেহ ভূমে,
দ্বিধা হয়ে বাধা হতেছে ভিন্ন
পিছে পড়ে থাকে চরণ-চিহ্ন
আকাশের আঁখি করিছে খিন্ন
প্রলয় বহ্নি ধূমে—"

আচমকা থেমে গেল রঞ্জন। বেছে বেছে এই লাইনগুলোই তার মনে পড়ল কেন, মাত্র দু তিনবার পড়া 'গুরুগোবিন্দ' কবিতার পংক্তি তার মনের ভেতরে এমন ভাবে বাঁধাই বা পড়ে গেল কী করে? স্মৃতি-শক্তির গর্ব অবশ্য করতে পারে সে, বাড়ির 'চয়নিকা'-খানা প্রায় তার কণ্ঠস্থ। কিন্তু নিতান্তই পরের বাড়িতে বসে পড়া এই কবিতাটা এমনভাবে তার স্মৃতির ভেতরে এত সহজে বাসা বেঁধে নিলে কেমন করে?

মনের আকাশে থম থম করছিল ঝোড়ো মেঘ, তার ফাঁক দিয়ে যেন গলে পড়ল এক টুকরো জ্যোৎস্না। অদ্ভুতভাবে একটা মোড় ঘুরে গেল চিন্তাটা। চোখের সামনে ছবির মতো দেখা দিল একখানা বিশ্রীরকম সাজানো বাড়ি, ফুলে ফুলে ভরা তার বাগান, সে বাগানের মাঝখানে হেনার ঝোপ। একটুখানি জমিতে ঝলমল করছে শিশিরে ধোয়া উজ্জ্বল ঘন-ঘাসের আনন্দ, চেনে বাঁধা ছোট একটি চিতি-হরিণ, তার দুটি গভীর নীল চোখে অফুরন্ত স্নেহ। সেই ফুল, সেই হেনার লতা, বাতাসে টাটকা ফোটা গোলাপ আর ধূপের গন্ধ, ফুলে ফুলে ছোট বড় প্রজাপতি। গল্পের মতো ওই জগৎটাকে রঞ্জুর ভালো লাগেনি, বড় অস্বাভাবিক, বড় বেশি সাজানো মনে হয়েছে। তবু ওই মেয়েটি—যার ভালো নাম সংঘমিত্রা, ডাক নাম মিতা?

অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে লাগল, সংঘমিত্রা নয়, মিতাই ভালো। দুটি হাত জড়ো করে নমস্কার জানিয়েছিল, আশ্চর্য, নমস্কার জানিয়েছিল ছোট আর ছেলেমানুষ রঞ্জুকে।

আচ্ছা, মিতা কি পড়েছে এই সব বই, এমনি করে ভেবেছে তারও মতো? তাই সম্ভব, নিশ্চয়ই তাই। পরিমলের বোন সে, পরিমলের মতো একই চিন্তায়, একই সুরে তারও মন বাঁধা। ভাবতে ইচ্ছা করে এই বইগুলো পড়ে

মিতারও কি তার মতো উত্তেজনা জাগে রিভলভার হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে, 'অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি?' ছোট মেয়ে মিতা, পোষা হরিণের সঙ্গে যে মিতার মিতালি, সেও কি—

রঞ্জু, রঞ্জন?

বাইরে থেকে চেঁচিয়ে ডাকল কে।

রক্ত চমকে উঠল সর্বাঙ্গে। পরিমল? দরজা খুলে রঞ্জন বেরিয়ে এল বাইরের বারান্দায়: কে?

কিন্তু পরিমল নয়। পাকামি-ভরা গালের পাশ দিয়ে ভ্যাংচানির ভঙ্গিতে আধখানা জিভ বের করে দাঁড়িয়ে আছে ভোনা। সঙ্গে সঙ্গে দলটিও ঠিক আছে তার—কালী, খাঁদু, পূর্ণ। ভবেন মজুমদারের সেই কেলেঙ্কারীটা কবে চুকে-বুকে গেছে, দলবলের মধ্যে ভোনা আবার পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আবার হয়ে উঠেছে মনসাতলা মার্বেল পার্টির একচ্ছত্র নেতা।

বিরক্তিতে বিস্বাদ হয়ে গেল মন: ডাকছিস কেন?

ভোনা জিভের ডগাটায় একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে সেই পুরোণো কবিতার লাইন দুটো শুনিয়ে দিলে:

Jim is a good dog
Everyday he catches a frog—

হ্যালো গুড্ ডগ জিম, কী করছিস?

রঞ্জন বললে, সকালবেলা কী ইয়ার্কী এ সব?

—এ সব ইয়ার্কী নয়? ওরে বাবা, ভালো ছেলে এখন ধম্মো কথা শুনতে চায়। শুনবি ধম্মো কথা? সংস্কৃত?—ভোনা বিশ্রী মুখভঙ্গি করে শুরু করলে, ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্না শমন সন্তনুপ্যা, শন্নো সমুদ্রিয়া আপঃ শমন সন্তকুপ্যা—

কিছুদিন আগে পৈতে হয়েছে ভোনার, তারই খানিকটা মন্ত্র গড়গড় করে আউড়ে গেল সে।

খাঁদু বাধা দিয়ে বললে, থাম্না, কেন বাজে কথা বলছিস। শোন্ রঞ্জু, আজ সন্ধ্যের পর বেরুতে হবে।

—কেন?

—বাঃ তুই আছিস কোথায় রে? আজ যে নষ্টচন্দ্র। অতুল ঘোষের লিচু বাগানে আজ—হুঁ-হুঁ!

মনটা কালো হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। দিনের পর দিন এই দলটা সম্পর্কে তার অশ্রদ্ধা বেড়েই চলেছে সমান ভাবে। সেই কুৎসিত কদর্য কথাগুলোকে

সে ভোলেনি, ভোলেনি গোষ্ঠের মেলায় সে অতিরিক্ত অভিজ্ঞতাটা। তবুও সে বিরক্তিটা চাপা পড়ে গিয়ে একটা নতুন শ্রদ্ধা চাড়া দিয়ে উঠেছিল—লেগেছিল একটা আলোর ঝলক। 'ঝাণ্ডা উঁচে রহে হামারা'। ছাব্বিশে জানুয়ারীর স্বাধীনতার সংকল্প। পতাকা হাতে এগিয়ে চলেছে ভোনা। তারও পরে—

ভবেন মজুমদার। পেছনে পেছনে ক্যানেস্তারায় শোভাযাত্রা। তার পরে আবার যেমন ছিল ঠিক সেই রকম। বান ডেকেছিল, এসেছিল নতুন আত্রাইয়ের দেশ-ভাসানো নতুন বন্যা—একাকার হয়ে গিয়েছিল গ্রাম-প্রান্তর, নদী-নালা, দিগ্‌দিগন্ত। যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ নেমে গেল সে জল। পড়ে রইল সেই পচা ডোবা, সেই দুর্গন্ধ জল, কচুরিপানা, আর ব্যাঙাচির ঝাঁক। মনসাতলা থেকে সেই মার্বেলে ফাটানোর শব্দ: 'হাত ইস্টেট্—উড্ড্‌ কিপ্‌'—, আজ আবার সেই পুরোনোর পুনরাবৃত্তি—অতুল ঘোষের লিচু বাগানে নষ্টচন্দ্র।

বললে, না।

—না কেন? চমৎকার লিচু, ভালো মজঃফরপুরী লিচু। একটা খেলে আর ভুলতে পারবি না। আর ভালোছেলেগিরি করতে হবে না, সন্ধ্যেবেলা ডেকে নিয়ে যাবো, কেমন?

রঞ্জন ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল—না। কটু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল এদের দিকে। শুধু এরা খারাপ ছেলে বলেই নয়, আজ একটা নতুন ধাক্কায়, নতুন একটা আশ্চর্য পথের সংকেতে এদের সঙ্গে তার পার্থক্যটা চিহ্নিত হয়ে গেছে আরো স্পষ্টরেখায়। এই মনসাতলা নয়, ভয়ে ভরা কাঞ্চননদীর বালিভাঙা নয়, এই শহর মুকুন্দপুরের খোয়াওঠা রাস্তা, নড়বড়ে ল্যাম্প্‌ পোস্ট্‌, বাজারের নোংরা মাড়োয়াড়ীপট্টি কিংবা ইটবারকরা একতলা জীর্ণ বাড়িগুলোও নয়। অন্ধকার রাত্রে নক্ষত্রভরা আকাশে প্রসারিত আকাশগঙ্গার মতো আজ তার মনের যাত্রা শুরু হয়েছে অপরিচয়ের ছায়াপথে। আলো আঁধারের অচেনালোকে সেখানে বিকট শব্দে বোমা ফেটে পড়েছে ফুলঝুরির মতো, ছুরির নীল উজ্জ্বল ফলার মতো রিভলভারের ছুটন্ত আগুন; ফাঁসিকাঠ দেখেনি—তবুও সে চিনতে পারছে ফাঁসির দড়িতে দুলছে উজ্জ্বল কয়েকটি জ্যোতির্ময় মূর্তি—ওরা কারা? ক্ষুদিরাম? সত্যেন বসু? কানাইলাল? বীরেন গুপ্ত?

এই ভোনা, এই কালী, খাঁদু আর পূর্ণ—এরা সে অপূর্ব ছায়ালোকের

কল্পনাও করতে পারে না। নিতান্ত নিচুতলার জীব এরা, এরা করুণার পাত্র। বললে, মাপ করতে হবে ভাই, ও সবের মধ্যে আমি নেই।

—অঃ ?—গালের পাশ দিয়ে জিভ বের করে ভেংচে দিলে ভোনা, পিট্‌পিট্‌ করে উঠল শয়তানী-ভরা চোখদুটো। চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, থাকো বাবা, ঘরে বসে গুড্‌ কণ্ডাক্টের প্রাইজ পাও তাহলে। চলে আয় খাঁদু, ওই গঙ্গাফড়িংটাকে দিয়ে কাজ হবে না দেখছি।

চলে গেল দলটা। যেতে যেতে উচ্চঃস্বরে গান ধরল ভোনা :

'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে'—

খাঁদু চীৎকার করে উঠল, এন্‌কোর, এন্‌কোর! আবার—এগেইন্‌!

ইস্কুল ছুটি। দুপুরে নিঃসাড় পায়ে সে বেরিয়ে এল খিড়্‌কি দরজা দিয়ে, এসে বসল ঠাণ্ডা ছায়ায় ঘেরা পাখিডাকা নির্জন ছাইগাদাটার পাশে। বই দুটো সঙ্গে করে এনেছে, আর এনেছে খাতা পেনসিল। খানিকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইল রেললাইনের কালো রেখাদুটোর দিকে, মোটা মোটা পাতার আড়ালে গাঢ় সবুজ উজ্জ্বল কচি বাতাবীগুলোর দিকে, যেখানে আমগাছে পুষ্ট একটা লতার সঙ্গে পাকা একটা লাল টুকটুকে বন-কাঁকুড় দুলছে, তার দিকে। তার পর পেন্‌সিলের পেছনটাকে কামড়ালো খানিকক্ষণ, গোটা কয়েক দাঁতের দাগ ফেলল, খাতার মলাটে এলোমেলোভাবে একটা পাখি আঁকল, সেটা হাঁস আর ময়ূরের মাঝামাঝি একটা প্রাণী, নিজের নামটা জড়ানো ইংরেজিতে সই করবার চেষ্টা করলে বারকতক, তারও পরে লিখতে শুরু করল।

কতক্ষণ লিখেছিল খেয়াল নেই হঠাৎ পেছনে শুনল হাসির শব্দ। কেমন ভয় করল, থর থর করে কেঁপে উঠল হাতটা, পেন্‌সিল গড়িয়ে পড়ল নিচে।

আর কে ? পরিমল। এম্‌নি করে চমক লাগিয়ে দিতেই ভালোবাসে।

সেই পরিচিত হাসিতে ঝল্‌মলে পরিমলের মুখ। বললে, ধরে ফেলেছি।

খাতাটা সে লুকোবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু এর মধ্যেই সেটাকে ঝাঁ করে ছিনিয়ে নিয়েছে পরিমল। তারপর দু পা দূরে সরে গিয়ে, যাতে রঞ্জন কেড়ে নিতে না পারে, উল্‌টে পাল্‌টে একটা কবিতা সে আবিষ্কার করে বসল : 'কানাইলাল'।

—'কানাইলাল ?' বড় বড় চোখ করে রঞ্জনের মুখের ওপরে দৃষ্টি ফেলল পরিমল : কানাইলালকে নিয়ে তুই কবিতা লিখছিস কেন রে ?

—তোমার কী। খাতাটা ফেরত দাও।

—দাঁড়া, দাঁড়া, ভারী ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে যে।—পরিমল আরম্ভ করল :

মৃত্যুর রূপ এত সুন্দর এ কথা জানিনি আগে,
চিরচঞ্চল প্রাণের লীলায় মত্ত-পিনাকী জাগে।
বেদনা-বিহত কাজল নয়নে
বিদ্যুৎশিখা হেরি ক্ষণে ক্ষণে
একটি মানবে যুগমানবের মূর্ত প্রতীক হেরি,
মৃত্যুর মাঝে বাজায়ে গেল সে সত্যের জয়ভেরী।

আরে, আরে!—পরিমলের কৌতুকভরা সরসকণ্ঠ হঠাৎ শ্রদ্ধা আর মুগ্ধতায় নিবিড় হয়ে উঠল : এ যে সত্যিকারের একজন নীরব কবিকে আবিষ্কার করা গেল! এত ভালো তুই লিখতে পারিস তা তো জানতাম না। বলতুম টুকলি করেছিস, কিন্তু তা তো বলতে পারি না। কারণ কানাইলালকে নিয়ে কেউ আজ পর্যন্ত কবিতা লেখেনি, এ ব্যাপারে তুই-ই বাংলার প্রথম কবি। ভালো কথা, পিনাকী মানে কিরে?

রঞ্জু সঙ্কুচিত হয়ে বললে, থাক, রেখে দে।

—রেখে দেব, বলিস্ কী! এ যে আবিষ্কার! ইউরেকা!

শস্যশ্যামলা বাংলা মায়ের স্নেহ-অঞ্চলতলে,
রুদ্র বিষাণ উঠেছে বাজিয়া, খড়্গ উঠেছে জ্বলে!
এই সব কচি কিশোরের প্রাণে
আছিল সুপ্ত কোথা কোন্‌খানে
ধ্বংসের হেন উগ্র পিপাসা বহ্নির এই জ্বালা,
রচিল কেমনে বুকের রক্তে মায়ের বরণ-মালা!

—না, এ কবিতা জোরে পড়া যাবে না।—পরিমল নীরবে লেখাটার ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেল। পড়া যখন শেষ হল, তখন কেমন বিষণ্ণের মতো চুপ করে রইল সে, কোনো কথা বললে না, ভালো মন্দ মন্তব্যও করলে না কিছু। মাটি থেকে একটা চোরকাঁটার শিষ তুলে নিয়ে চিবুতে চিবুতে বললে, তুই যা লিখেছিস তা কি তুই বিশ্বাস করিস্ রঞ্জু?

—কেন করব না?

পরিমল ছোট্ট করে হাসল : ঠিক তা নয়। বই দুটো তুই পড়েছিস তা বুঝতে পারছি। কিন্তু হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় খানিকটা লিখে যাওয়া এক জিনিস, আর তাকে মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করা একেবারে আলাদা ব্যাপার।

এ সব উচ্ছ্বাসের কোনো দাম নেই, কাজের বেলায় দেখা যায় সবটাই ফাঁকি।

পরিমলের বলার ধরণের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যাতে অপমানিত বোধ করলে রঞ্জন, তেতে উঠল মন। হঠাৎ শিরদাঁড়াটা সোজা করে বললে, তোকে কে বলল এর সবটাই উচ্ছ্বাস?

—না, এম্‌নি।—পরিমল কথাটাকে ঘুরিয়ে নিলে, থাক ও-সব। কেমন লাগল বই দুটো?

ক্ষুণ্ণ জবাব এল: চমৎকার। আর বই নেই এ রকম? সেই 'পথের দাবী?'

—আছে, সবই আছে। দেব আস্তে আস্তে। কিন্তু পরিমল আবার ঘুরিয়ে নিলে কথাটাকে: আজ বিকেলে আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবি এক জায়গায়?

—কোথায়?

—পুবপাড়ায় আমাদের একটা ক্লাব আছে, লাইব্রেরীও। নাম 'তরুণ সমিতি।'

ক্ষুদিরাম কানাইলালের সঙ্গে যে মন আকাশগঙ্গার স্রোতে স্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছিল, তার 'তরুণ সমিতি'র পরিণতিটা ভালো লাগল না। হতাশভাবে রঞ্জন বললে, কী হয় সেখানে?

—একসারসাইজ্‌ হয়, বক্সিং হয়, লাঠি আর ছোরা খেলাও শেখানো হয়। তা ছাড়া লাইব্রেরীতে অনেক ভালো ভালো বই আছে, তুই তো পড়তে ভালোবাসিস।

আগ্রহ আবার সজাগ হয়ে উঠল: এ সব বই পাওয়া যাবে? এই ফাঁসির ডাক, এই শহীদ সত্যেন?

—পাগল নাকি রে? কী ছেলেমানুষ তুই!—পরিমল হাসল: এ সব যে বাজেয়াপ্ত বই। এগুলো রাখলে পুলিশ ধরবে না?

—বাজেয়াপ্ত বই!—বইগুলো যে সাধারণ নয়, তা তো বুঝতে পেরেছে পড়েই। কিন্তু 'বাজেয়াপ্ত' কথাটা—আর তার সঙ্গে পুলিশের যোগাযোগের উল্লেখ শুনে যেন সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম করে উঠল তার।

পরিমল মিটিমিটি হাসল: হ্যাঁ, বাজেয়াপ্ত বই।

—তবে এ সব বই তুমিই বা পেলে কোথায়? তুমিও কি পুলিশকে ভয় করো না?

—চুক্—জিভে আর তালুতে মিলিয়ে হতাশভরা একটা শব্দ করলে পরিমল: তুই একেবারে হোপ্‌লেস। বড্ড বেশি তোর কৌতূহল। এত সহজেই কি সব কথা জানা যায়—না জানতে দেওয়া যায়? ধৈর্য ধরতে হয়, অপেক্ষা

করতে হয়, তৈরী করে নিতে হয় মনকে। সে সব হবে পরে। কিন্তু একটা কথা তোকে বলি রঞ্জু। এ কবিতা যদি লিখতে হয় তা হলে সামলে চলিস। এ সমস্ত বই পড়া অন্যায়। এ রকম কবিতা লেখাও তার চাইতে কম অন্যায় নয় কিন্তু।

মুখ গোঁজ করে রঞ্জন বললে, আমি কাউকে ভয় করি না।

পরিমল বললে, বোকার মতো কথা হল রে। এ তোর অহিংস খদ্দর-মার্কা ব্যাপার নয় যে হৈ চৈ করতে করতে জেলে যাবি আর কাশীর ষাঁড়ের মতো ফুলের মালা চিবুতে চিবুতে বেরিয়ে আসবি। সি আই-ডির ঘা কতক হাণ্টার, আর হাতের নোখে গোটা কয়েক পিন্ ফুটলেই বুঝতে পারবি কত ধানে কত চাল বেরোয়।

চুপ করে রইল রঞ্জন। কল্পনার ছায়াপথের আশে পাশে আরো কতগুলো নতুন জিনিসের আভাস পাচ্ছে মন। কিছু একটা প্রায় বুঝতে পারছে, অথচ ধরতে পারছে না। মনের এ অবস্থাটা অসহ্য সবচাইতে। হাতের নাগালের মুখোমুখি একটা পাকাফলের মতো। ছোঁয়া যায়, ছেঁড়া যায় না অথচ।

উঠে পড়ল পরিমল।

—বই দুটো তো পড়া হয়ে গেছে, আমি নিয়ে চললাম।

—নতুন বই ?

—পরে দেব। আর ভালো কথা, যাবি তুই আজকে আমাদের ক্লাবে ? ঘণ্টা দেড়েক পরে ডাকতে আসব।

—আসিস।

পরিমল চলে গেল। পেন্সিল মুখে দিয়ে রঞ্জন ভ্রূকুটি-ভরা চোখে নিরীক্ষণ করতে লাগল সদ্যোরচিত কবিতাকে। এ কি সত্যিই একটা সাময়িক আবেগ, না রক্তে রক্তে শিকড় মেলে দেওয়া দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ একটা প্রতীতি ?

পুবপাড়ার তরুণ-সমিতি ভারী সুন্দর জায়গায়।

একটা পুরোনো সেকেলে জমিদার বাড়ি। মোটা মোটা থাম, উঁচু উঁচু খিলান। দোতলা অতিকায় বাড়িটার ওপরতলাটা প্রায় ধ্বসে পড়েছে, ভাঙা ছাতের ওপরে ঘাস গজিয়েছে, গজিয়েছে বট পাকুড়ের চারা। সাদা বাড়িটার সর্বাঙ্গ কালচে সবুজ শ্যাওলায় ছাওয়া, তার ভেতর দিয়ে সরু মোটা অসংখ্য সাপের মতো ছড়িয়ে আছে বাদামী রঙের শিকড়। নিচের তলায় কতগুলো ঘর এখনো দাঁড়িয়ে আছে, তবে বালাই নেই জানালা কবাটের। বছর সাতেক আগেও এই জমিদার বংশের অবশিষ্ট দুজন নাকি এ বাড়িতে বাস

করত—বিধবা মা, কুমারী মেয়ে আর এক হিন্দুস্থানী চাকর। একদিন সকালে দেখা গেল মা আর মেয়ে গলাকাটা অবস্থায় খাটের ওপরে পড়ে আছে, ঘরময় রক্ত। আর বাক্স প্যাটরাগুলো সব ভাঙা—হিন্দুস্থানী চাকরটাও অদৃশ্য।

সেই থেকে এই বাড়ি পরিত্যক্ত। কোন দাবীদার একে অধিকার করতে আসেনি। খুন আর ভাঙাচুরো অবস্থার সুযোগ নিয়ে ভূতুড়ে বাড়ি বলে এর নাম রটেছে। ছড়িয়েছে নানারকম অবাস্তব আর অলৌকিক কাহিনী। সামনে একটা ছোট মাঠ, কোমরসমান ঘাস আর বিছুটির জঙ্গল মাথা তুলেছে। তা ছাড়া চারপাশে ঝুপসী আমের বাগান। সেকেলে সমস্ত জংলা গাছ—এককালে হয়তো ভালো আম হত, কিন্তু এখন যা হয় তা দুর্দান্ত টক আর পোকা লাগা। সর্বভুক্ ছেলেরা পর্যন্ত এ বাগানের দিকে পা বাড়ায় না, অবশ্য ভূতের ভয়ও যে এক আধটু না আছে এমন কথাও বলা যায় না।

কিন্তু 'তরুণ-সমিতির' ছেলেরা একটু গোঁয়ার, তাই বেছে বেছে এই নির্জন অস্বস্তিভরা জায়গাতেই গড়ে তুলেছে তাদের আখড়া। বিছুটি আর ঘাসবনভরা মাঠটাকে কোদাল দিয়ে চেঁছে পরিষ্কার করে ফেলেছে, বসিয়েছে প্যারালাল বার, রিং ঝুলিয়েছে, ডুলিয়েছে বক্সিংয়ের বালির বস্তা। তা ছাড়া খেলার ব্যবস্থাও আছে, একপাশে করা হয়েছে দাড়িয়াবান্ধা (গাদী) আর ব্যাড্‌মিণ্টনের ঘর। লাইব্রেরীটা তবে এখানে নয়, সেটা পাড়ার মধ্যে ক্লাবের একজন মেম্বারের বাড়িতে।

ওরা দুজনে 'তরুণ-সমিতি'র জিম্‌ন্যাস্টিক ক্লাবে গিয়ে যখন পৌঁছুল, তখন চারদিকে শান্ত-বিকেল। ঝুপসী আমবাগানের আড়ালে বেলা শেষের সূর্য হারিয়ে যাচ্ছে ভীরুর মতো। ক্লাবের প্রায় পনেরো বিশটি ছেলে একান্ত অভিনিবেশ সহকারে শরীরচর্চায় ব্যস্ত। কয়েকজন কুমীরের মতো লম্বা হয়ে হুস্ হুস্ করে বুক-ডন দিচ্ছে, একজন ঝুলছে রিংয়ের সঙ্গে, আর একজন প্যারালাল বারে হাঁটু ভাঁজ করে আটকে দিয়ে মাথা নিচে ঝুলিয়ে দোল খাচ্ছে—ঠিক ছবিতে দেখা শিম্পাঞ্জীর মতো। একজন দু হাতে দুটো বক্সিং গ্লাভ্‌স পরে ধাঁই ধাঁই করে ঘুষি বসাচ্ছে ঝুলন্ত বালির বস্তায়। পরিমল পরে বলেছিল, অমনি করলে নাকি ঘুষির ওজন বাড়ে। আর আখড়ায় ঢুকতেই সব চাইতে আগে যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে একটা আশ্চর্য মানুষ। কুচকুচে কালো রঙ, ছফুট লম্বা একজন যুবক। চওড়া চিতানো বুক—যেন লোহায় গড়া চেহারা। মাথার ওপর মস্ত একখানা লাঠি নিয়ে বোঁ বোঁ করে ঘোরাচ্ছে—এত জোরে ঘোরাচ্ছে যে লাঠিটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, শুধু

চোখে পড়ছে যে একটা বিরাট চাকার সূক্ষ্ম উড়ন্ত রেখা। দৃঢ় বিশাল শরীরের পা থেকে কাঁধ পর্যন্ত ছোট বড় অসংখ্য 'মাস্‌ল' ঢেউয়ের মতো উঠছে পড়ছে, বাইশেপগুলো ফুলে ফুলে উঠছে এক একটা লোহার পিণ্ডের মতো। তিন চারটি ছেলে লাঠি দিয়ে তার মাথায় ঘা দিতে চেষ্টা করছে, কিন্তু সেই প্রচণ্ড অশরীরী ঘূর্ণির কাছে গিয়ে চটাস্‌ চটাস্‌ করে তাদের হাতের লাঠিগুলো ঠিকরে ফিরে আসছে, একজনের লাঠি তো ছিটকে বেরিয়েই চলে গেল হাত থেকে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রঞ্জন। বললে, অদ্ভুত।

পরিমলও সেই দিকেই তাকিয়ে ছিল। প্রতিধ্বনি করে বললে, অদ্ভুত, তাই না? উনিই বেণুদা, আমাদের ক্লাবের সেক্রেটারী। বলতে গেলে ক্লাবের সব।

কথাটা পরিমল না বলে দিলেও রঞ্জন বুঝতে পারত। ওই স্বাস্থ্য, লাঠির ওপর অমন অপূর্ব দখল—কে আর ক্লাবের সেক্রেটারী হবে এ লোক ছাড়া!

সশ্রদ্ধভাবে পরিমল বলে চলল, এক লাঠির যে কতরকম কসরৎ উনি জানেন তার সংখ্যা নেই। আর শুধুই কি লাঠি? বক্সিংয়ের সময় ওঁর একটা মাঝারি সাইজের ঘুষি খেলে পনেরো মিনিট ধরে আমাদের মাথা ঘুরতে থাকে। রিং বারের এমন ফিগার নেই যা করতে পারেন না। এক নাগাড়ে দেড়শো ডন দিতে পারেন—একটু কষ্ট হয় না।

একটু পরেই লাঠি খেলা বন্ধ হল। কালো কুচকুচে একটা মূর্তির ওপরে বার্নিশ তেলের মতো ঘাম চক চক করছিল, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেললেন বেণুদা, এগিয়ে এলেন সেদিকে যেখানে ওরা দুজনে দাঁড়িয়েছিল। পরিমল কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ভরাট গম্ভীর গলায় কথা কয়ে উঠলেন বেণুদা।

—তুমি, রঞ্জন না?

মৃদু ভয় এবং গভীর বিস্ময়ের একটা মিশ্র অনুভূতি দোলা খেয়ে গেল মনে। কথার জবাব দিতে গিয়েও দিতে পারল না, কেমন যেন ধরে এল গলাটা।

বেণুদা এবারে হাসলেন: আমাদের জিম্‌ন্যাস্টিক ক্লাব কেমন দেখছ রঞ্জন?

—খুব ভালো। কিন্তু—এতক্ষণে জড়তাটা কাটিয়ে উঠতে পারল সে: আপনি নাম জানলেন কেমন করে আমার?

বেণুদা শুধু হাসলেন, উত্তর দিলেন না কথাটার। তারপর বললেন, আমাদের ক্লাবের মেম্বার হবে তো?

পরিমলই জবাব দিলে রঞ্জনের হয়ে। সোৎসাহে বললে, নিশ্চয় হবে।

সেই জন্যেই ওকে ধরে নিয়ে এলাম।

—বেশ, বেশ, খুব ভালো কথা।—ভরাট গম্ভীর গলায় বেণুদা বললেন, শরীর ভালো করা চাই সবার আগে। গায়ে যার জোর নেই, সেই পড়ে পড়ে মার খায়। আর যে বলবান, পৃথিবীতে গড়ে ওঠে তারই অধিকার। কী বলো রঞ্জন? ঠিক নয়?

রঞ্জন মাথা নেড়ে বললে, নিশ্চয়।

ঘাসের ওপরে বসলেন বেণুদা, পাশে বসল ওরা দুজন। বেণুদার ঘামে ভেজা শরীর থেকে একটা গন্ধ আসতে লাগল নাকে। কিন্তু ওই গন্ধটার ভেতরেও যেন পাওয়া গেল শক্তির পরিচয়, পৌরুষের ব্যঞ্জনা।

বেণুদা বলে চললেন, তাই বলে অবশ্য আমাদের ক্লাবের উদ্দেশ্য এই নয় যে শুধু শরীরকেই তাগড়া করতে হবে। সে শরীর কাবলীরও আছে, পাঞ্জাবীরও আছে। কিন্তু ফিজিক উইদাউট্ ব্রেণ অ্যাণ্ড্ অ্যাক্টিভিটি—কোনো দামই নেই তার। শরীরকে আমরা ভালো করব নিশ্চয়। কিন্তু তা শুধু নিজেদের জন্যে নয়। অন্য দশজনের জন্যে, সমাজের জন্যে। আমাদের ক্লাবের উদ্দেশ্য সব রঞ্জনকে স্পষ্ট করে বুঝিয়েছ তো পরিমল?

পরিমল অপ্রতিভ হয়ে মাথা নাড়ল, না।

বেণুদা ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকালেন পরিমলের দিকে, পরিমল লজ্জা পেল। বেণুদা বলে চললেন, আমরা সব রকম সোশ্যাল সার্ভিস্ করবার দায়িত্বও নিয়েছি। ধরো নার্সিং। কোথাও কারুর অসুখ-বিসুখ করলে আমাদের ক্লাবের মেম্বাররাই নার্সিং করতে যায়। কেউ যদি অন্যায় করে তার প্রতিবাদ করব আমরা। দুষ্টের দমন করা আমাদের মস্ত একটা কাজ। শহরের গুণ্ডা-বদমায়েসরা যাতে আমাদের নামে ভয়ে কাঁপে, সে ব্যবস্থাও আমরা করব। এতো গেল শরীরচর্চার দিক। তা ছাড়া আমাদের লাইব্রেরী আছে, সেখানে বাছা বাছা বই রেখেছি আমরা। দেশের ছেলেরা যাতে মানুষ হয়, তাদের শরীর আর মস্তিষ্ক একই সঙ্গে গড়ে উঠতে পারে, এই হল আপাতত আমাদের প্রধান লক্ষ্য। পরিমল, ফেরবার পথে তুমি রঞ্জনকে আমাদের লাইব্রেরী দেখিয়ে নিয়ে যেয়ো।

পরিমল মাথা নেড়ে জানালো, আচ্ছা।

বেণুদা উঠে এগিয়ে গেলেন প্যারালাল বারের দিকে। পরিমল চাপা গলায় জানতে চাইলে: কেমন দেখলি ভাই বেণুদাকে?

এখানে এসে যে একটি কথা ক্রমাগতই রঞ্জনের মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল, সেই কথাটাই বলতে পারল সে : চমৎকার।

পরিমল সায় দিয়ে বললে, হাঁ চমৎকার। একটু বেশি করে মিশলেই বুঝতে পারবি কী রকম প্রাণখোলা মানুষ।

ভোনা, কালী কিংবা খাঁদুর একটা নোংরা আবহাওয়া ছাড়িয়ে, নিজের ভেতরে আত্মসম্পূর্ণ রূপকল্পনার জগতের বাইরে এসে, যেন আজ সে দাঁড়িয়েছে একটা নতুন পৃথিবীর সম্মুখে। যেন হঠাৎ জানলা দিয়ে দেখা সেই আত্রাইয়ের বান। কোথায় ছিল এতদিন এই ছেলেরা, এই ক্লাব? স্বাস্থ্য সবলতা ইতরতা নেই; দুর্বুদ্ধি নেই, বিড়ি খাওয়ার উৎসাহ নেই, নষ্টচন্দ্রের সুযোগ নিয়ে পরের বাগানের ফল-পাকড় লুটতরাজ করবার মতো স্পৃহাও নেই কারুর। রঞ্জন যেন বায়োস্কোপের ছবি দেখছে সমস্ত। রিংয়ে বারবেলে, ব্যাড্‌মিন্টন আর দাড়িয়াবান্ধায়, ছোট বড় লাঠিতে বারো তেরো বছরের ছেলে থেকে শুরু করে কুড়ি বাইশ বছরের যুবক পর্যন্ত চমৎকার একটি দল। নতুন লাগে, অপরিচিত মনে হয়। কিন্তু এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই তবু কেমন করে এদের সঙ্গে একটা মানসিক সহযোগিতা ঘটে গেছে, এদের একান্ত ভাবে বোধ হচ্ছে নিজের দলের লোক বলে।

তবু কোথায় সূক্ষ্ম অতৃপ্তিবোধ। একটা ছোট কাঁটা যেন খর্ খর্ করছে পায়ের পাতার নিচে। কিছুতেই ভুলতে পারেনি সেই ফাঁসির ডাক আর শহীদ সত্যেন। বুকের শিথিল শিরাগুলোকে যেন একটা প্রকাণ্ড ধনুকে ছিলার মতো জুড়ে দিয়ে প্রচণ্ড টঙ্কার দিয়েছে কেউ। তার মন্দ্রে প্রতিটি রোমকূপ পর্যন্ত গম্‌গম্ করে উঠেছে এখন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মনের মধ্যে ফণা নাড়া দিয়েছে বাসুকী নাগ, দেশ ঘুমিয়ে পড়ল বলেই তো সে বশ মানতে চায় না। ওই বইগুলো যেন তার কাছে কোন এক যাদুকর সাপুড়ের তুবড়ী বাঁশির মাতাল করা ডাক পৌঁছে দিয়েছে। কিছু একটা করতে না পারা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই, তৃপ্তি তো নেইই।

কেমন যেন আশা হয়েছিল, এই ক্লাব তার সন্ধান বলে দেবে। এইখানেই কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে গুপ্ত দরজা, যার সামনে দাঁড়িয়ে কোনো একটা মন্ত্র উচ্চারণ করলেই মাটির বন্ধন বিদীর্ণ হয়ে পাতালপুরীর আনন্দ খুলে যায়,—দেখা যায় গল্পে শোনা শাদা মার্বেল পাথরের একটা অতলান্ত সিঁড়ি বিশাল অজগরের মতো পাক খেতে খেতে কোথায় নেমে গেছে—নেমে গেছে ক্ষুদিরামের কামানের কারখানায়। কিন্তু শুধু শরীর ভালো করতে হবে, শুধু

মগজকে উন্নত করতে হবে। এর বেশি কিছু নয়? রাত জেগে কতগুলো রোগীর সেবা করাই কি তরুণ সমিতির শেষ কথা? বোমার ফুলঝুরি, ছুরির নীলোজ্জ্বল তীক্ষ্ণ ফলকের মতো রিভলভারের এক ঝলক আগুন আর ছায়ামূর্তির মতো ফাঁসিকাঠে বিকীর্ণ যে আকাশগঙ্গা—সে কত দূরে, কেমন করে স্পর্শ করা যায় তাকে?

সমস্ত আখড়াটা অদ্ভুত কতগুলো ধ্বনিতে মুখর। রঞ্জন অন্যমনস্কভাবে শুনতে লাগল।

—শির্, তামেচা, বাহেরা—

লাঠির ঠকঠক আওয়াজ।

ব্যাড্‌মিণ্টনের কোর্ট থেকে শব্দ: ফাইভ অল!

ধপাধপ করে ঘুষি পড়ছে বক্সিংয়ের বালির বস্তায়।

আস্তে আস্তে নেমে আসছে বেলা। আমবাগানের ডাইনি চুলের মতো বন পাতার আড়ালে লাল সূর্য ডুবে গেল। পরিমল কী ভাবছিল, রঞ্জন জিজ্ঞাসা করলে, তুই এক্সারসাইজ্ করবি না?

—নাঃ, আজ আর নয়। কাল কুস্তি করে গায়ে বড় ব্যথা হয়েছে, বিশ্রাম নিচ্ছি আজকের দিনটা।

—ওঃ।

আবার চুপচাপ। পরিমল কেমন গম্ভীর হয়ে আছে, রঞ্জনের মনের ভেতরে আবার ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই আগুনজ্বলা বইগুলো, কতগুলি অগ্নিপতঙ্গের মতো তাদের চলন্ত আর জ্বলন্ত অক্ষর। পরিমল জানে। ওই সুড়ঙ্গ পথটা তার জানা আছে। কেন সে বলে দেয় না তাহলে? কেন সে এমন করে দূরে দূরে সরিয়ে রাখছে ওকে?

চল রঞ্জু, এবারে ওঠা যাক্—

উঠতে ইচ্ছে করছে না। ক্লান্তস্বরে বললে, এখনি?

—আর একটু বসবি? কিন্তু লাইব্রেরী যে আবার বন্ধ হয়ে যাবে ওদিকে।

—ওঃ, চল্ তা হলে—

ওরা উঠতে যাবে, এমন সময় কাণ্ড হয়ে গেল একটা।

একটি ছেলে প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে এল ছুটতে ছুটতে: বেণুদা, বেণুদা?

মাটিতে ঝুঁকে পড়ে বেণুদা তখন একটা ভারী বারবেল তুলছিলেন, ধপাৎ করে সেটাকে ফেলে দিলেন মাটিতে। বললেন, ব্যাপার কী, কী হয়েছে?

—ফণীর মার ঘর থেকে সব জিনিষপত্র রাস্তায় টান মেরে ফেলে দিচ্ছে।

বাক্স-প্যাটরা, বাসন, কোসন সমস্ত।

ছ ফুট উঁচু লোহার মানুষ বেণুদা সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তীরের বেগে। এক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল সমস্ত। লাঠির আওয়াজ, ব্যাড্মিণ্টন কোর্টের হাঁকাহাঁকি, চারপাশের ছোট বড় কথা আর হাসি কিছু কোলাহল। পোড়ো জমিদারবাড়ি আর ঘাসে-ছাওয়া মাঠটার ওপর দিয়ে যেন একটা কঠিন স্তব্ধতা নেমে এল।

—কে ফেলে দিচ্ছে? হালদার?—বেণুদার গলা গম্ গম্ করে উঠল, প্রতিধ্বনি কাঁপতে লাগল ভাঙা বাড়িটার ঘরে ঘরে গুম্ গুম্ শব্দে: হালদার ফেলে দিচ্ছে?

—শুধু হালদার নয়, তার সঙ্গে আরো চার পাঁচটা ষণ্ডা লোক। লাঠিও নিয়ে এসেছে।

—পাড়ার লোকে কী করছে?

—দাঁত বের করে দেখছে সব, হাসছে। ফণী বাধা দিতে গিয়েছিল, একটা লোক তাকে এমন মেরেছে যে তার নাক দিয়ে দর দর করে রক্ত—

দূত তার সংবাদটা আর শেষ করতে পারল না। তার আগেই বেণুদা গর্জন করে উঠলেন।

—অ্যাটেন্‌শন!

সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব ব্যাপার ঘটে গেল একটা। ক্লাবের যেখানে যে ছিল, ব্যাড্মিণ্টন আর দাড়িয়াবান্ধার কোর্ট থেকে রিং পর্যন্ত যারা এতক্ষণ নিতান্ত নিস্পৃহভাবে নিজের নিজের কাজ করে যাচ্ছিল, নক্ষত্রবেগে ছুটে এল তারা। ড্রিলের ভঙ্গিতে সব সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল মাঠের মাঝখানে।

—লেফ্‌ট টার্ণ—

একসঙ্গে কতগুলো পায়ের শব্দ করে দলটা ঘুরে গেল।

কার যেন উত্তেজিত স্বর শোনা গেল: লাঠি নেব বেণুদা?

—নো। কুইক্ মার্চ।

সঙ্গে সঙ্গে বেণুদাকে অনুসরণ করে দলটা এগিয়ে চলল।

রঞ্জন বসেছিল অভিভূতভাবে। কিছুই বুঝতে পারেনি। এতক্ষণ বায়োস্কোপের ছবি দেখছিল, এখন যেন তারই রোমাঞ্চক একটা অধ্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এর পরে?

রঞ্জনের কাঁধে আল্‌গাভাবে হাত ছোঁয়ালে পরিমল, ডাকলে, রঞ্জু?

—অ্যাঁ?

—চল্।

—কিন্তু কোথায় ?

—তরুণ সমিতি কী করতে চায় তার পরিচয় পাবি ?

ততক্ষণে একটা কিছু আঁচ করে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে মন : মারামারি হবে নাকি ভাই ?

—বড্ড বকাস্ তুই রঞ্জু, তাড়াতাড়ি চলে আয় না—পরিমলের কথায় উত্তাপ আর বিরক্তি স্পষ্টভাবে ফুটে বেরুল। দলটা অনেক এগিয়ে গেছে, ওরা উর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটলে পেছনে পেছনে। তারপর দু তিন মিনিটের মধ্যেই গিয়ে পৌঁছল পাড়ার ভেতর, এই রহস্যময় ঘটনার অকুস্থলে।

কেমন একটা গোলমেলে আর বিশৃঙ্খল ব্যাপার। ছোট একখানা মেটে বাড়ি—গরীবের বাড়ি যে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। সেই বাড়ির ভেতর থেকে চার পাঁচজন লোক ঘরের খাটবিছানা থেকে আরম্ভ করে তৈজসপত্র যা কিছু বাইরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে। টাকমাথা খাটো চেহারার একটা লোক নির্দেশ দিচ্ছে তাদের। একজন বিধবা ভদ্রমহিলা চীৎকার করে কাঁদছেন, একটি চোদ্দ পনেরো বছরের ছেলে মাটিতে বসে আছে নির্জীবের মতো, তার গায়ে ছিটের জামাটায় রক্তের ছোপ। আর একটু দূরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পাড়ার ভদ্রলোকেরা, কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নেই—যেন মেলায় কুমোরের দোকানে সাজানো একরাশ ধোঁপধাপ জুই পুতুল।

বেণুদার দলটা গিয়ে পৌঁছতেই টাকমাথা লোকটা তাদের দিকে ফিরে দাঁড়ালো। তার ছোট ছোট চোখদুটো দেখতে পেল রঞ্জন—সেই পড়ন্ত বেলাতেও দেখতে পেল কাঁকড়াবিছের ল্যাজের মতো তার ভ্রূদুটো বেঁকে গেল দুদিকে।

বেণুদা বললেন, হালদার মশাই, কী এসব ?

হালদার ঝাঁঝালোভাবে বললে, তা দিয়ে দরকার কী আপনার ?

বেণুদা হাসলেন। কালো মুখের ভেতর দিয়ে এক ঝলক শাদা শাদা দাঁত বেরিয়ে এল নিষ্ঠুর ভাবে : দরকার আছে বই কি। শুনুন, বিধবার ওপর এসব জুলুমবাজী চলবে না।

—নাঃ, চলবে না ?—বিশ্রী একটা জাম্বুবানের মতো দাঁত খিঁচুনি দিলে হালদার : যেন পুলিশ সাহেব এসেছেন ! আমার বাড়ি, আমার ঘর, বিনা ভাড়ায় ছ' মাস থাকতে দিয়েছি—সেই দয়াই হল আমার কাল। এখন নড়তে চাইছে না, ইয়ার্কী নাকি ?

বেণুদা নিরীহ হয়ে বললেন, কিন্তু এভাবে ওদের বার করে দিলে ওরা যাবে কোথায় ?

—যেখানে খুশি। কিন্তু আপনারাই বা কেন মাতব্বরী করতে এসেছেন ? নিজের চরকায় তেল দিন না মশাই ?

—আপনি ওদের জোর করে তাড়িয়ে দেবেন ?

—হ্যাঁ, দেব দেব।—হালদার খাটালের মোষের মতো মাটিতে পা ঠুকল ত্বপ্‌দাপ্‌ করে: আমার বাড়ী থেকে বের করে দেব আমি।

—কিন্তু ওরা যাবে কোথায় ? আপনি ভদ্রলোক—উনি ভদ্রঘরের মেয়ে, কোথায় গিয়ে উনি দাঁড়াবেন ?

হালদার এবারে চেঁচিয়ে উঠল।

—আপনি তো মশাই আচ্ছা লোক। গাঁয়ে মানে না অথচ মোড়লী করতে এসেছেন। ভদ্রভাবে উঠে যেতে বলেছি, তখন তো যায়ই নি, আবার মেজাজ কত! ধম্মো আছে, আইন আছে! জোর জুলুম চলবে না! ওঃ, ভারী আমার ভদ্রলোকের মেয়ে রে! ওঁর দাঁড়াবার জায়গা আমায় বাত্‌লে দিতে হবে! বেশ তো দাঁড়ান না গিয়ে কোনো বস্তিতে, কিংবা খোলাপট্টিতে—

—চুপ রও অসভ্য জানোয়ার—

সার্কাসে বাঘের গর্জন শুনেছিল, সেটা এবার শুনল মানুষের গলায়। বেণুদার একটা প্রবল ঘুষিতে তিন হাত দূরে ঠিকরে পড়ল হালদার, দাঁত ছরকুটে চিত্‌ হয়ে পড়ল মাটিতে। আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের ভেতরে যে লোকগুলো জিনিষপত্র টানাটানি করছিল, তারা ঝাঁপ দিয়ে পড়ল বাইরে। দুজনের হাতে দুখানা ছোরা ঝকঝক করে উঠল, পেশাদার গুণ্ডা ওরা—এর জন্যেই এসেছিল তৈরী হয়ে।

তারপর শুরু হয়ে গেল কুরুক্ষেত্র।

ভিড়ের মধ্যে ছোরাশুদ্ধ একটা হাত উঠল, আর একখানা হাত পেছন থেকে তাকে টেনে নামিয়ে নিলে। চিৎকার, কোলাহল। কয়েকটা আর্তনাদের শব্দ তীরের মতো চিরে দিলে আকাশকে, সমবেত ভদ্রলোকেরা বাসাভাঙা কাকের মতো আওয়াজ তুলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করলেন। জড় পুতুলগুলো জীবন্ত তা হলে!

মারামারি, কিল চড় ঘুষি চলছে, পরিমল কোথায় ছিটকে চলে গেছে। রঞ্জনের বুক কাঁপছে বাঁশ পাতার মতো, হাঁটুর কাছটা যেন ভেঙে আসতে চাইছে আতঙ্কে, গা দিয়ে দর দর করে ঘাম পড়ছে। কী করতে যাচ্ছিল

খেয়াল নেই, মনেও নেই—খুব সম্ভব ছুটে পালাবারই উদ্দেশ্য ছিল তার কিন্তু তার আগেই কপালের ডানদিকে একটা অসহ্য যন্ত্রণা যেন আকাশ থেকে ঠিকরে বাজের মতো ছোঁ দিয়ে পড়ল। যন্ত্রণায় চোখ বুজে এল তার, পরক্ষণেই সব ঝাপ্‌সা আর অস্পষ্ট—কোনো বোধই আর জেগে রইল না শরীরের কোনোখানে।

—দশ—

জরিপাড় শাড়ীর একটুখানি আঁচল, খানিকটা টিংচার আয়োডিনের গন্ধ, একখানা সরু হাতে কয়েক গাছা চুড়ির ঝিলিক আর মাথায় পাখার মিষ্টি বাতাস, প্রথম অস্বচ্ছ চেতনায় এগুলোই আভাসিত হয়ে উঠল ছায়াছায়া ভাবে। তারও পরে টের পাওয়া গেল কপালের ডান দিকে একটা টনটনে যন্ত্রণা, অস্ফুট কাতরোক্তি বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

—একটুও কি কমেনি?

কোমল হাল্‌কা গলায় জিজ্ঞাসা।

এবারে চোখ দুটো সম্পূর্ণ করে মেলল রঞ্জন।

—মা?

কিন্তু মা তো নয়। অচেনা ঘর, অচেনা পরিবেষ্টনী। মাথার কাছে টিপয়ের ওপরে লণ্ঠনের আলো। শ্যামল একখানি মিষ্টি মুখ, কপালে সিঁদুরের টিপ। বয়েসে ছোটদির মতো হবে, কিন্তু চোখেমুখে মার মতোই স্নেহগভীর আকুলতা।

—বাড়ি যাবে? একটু সুস্থ হও, বাড়ি পাঠিয়ে দেব বই কি।

তখন মনে পড়ল। মনে পড়ল পুবপাড়ার জিমনাষ্টিক ক্লাব, কুইক মার্চ, হালদারের দলের সঙ্গে সেই মারামারি। ছুটে পালাবার কথা ভেবেছিল, আচমকা একটা চোট লাগল মাথায়, তারপরই চারদিকের পৃথিবীটা দুলে উঠল, হঠাৎ চলতে সুরু করা একটা গাড়ির চাকার মতো ঘুরে উঠল সমস্ত, তারও পরে—

সব শাদা—সব অন্ধকার! একেবারে ছেলেবেলায়, অশরীরী অবিনাশবাবুর হাতছানিতে সেই ভাঙা আশ্রমের পাশে সেই অভিজ্ঞতা। অন্ধকার সরে গিয়ে যখন আলো পড়ল, তখন দেখা গেল শাড়ীর আঁচল, একটি মিষ্টি স্নেহ-করুণ মুখ, আর উৎকণ্ঠাভরা প্রশ্ন: একটুও কমেনি?

এর পরে চিন্তাধারাটা বয়ে গেল খরগতিতে। উঠে বসল বিছানায়। এবারে সমস্ত ঘরটা সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে দেখা দিল চোখের সামনে। ঘরে শুধু সেই মেয়েটি নয়, ওদিকে একখানা চেয়ারে চুপ করে বসে আছেন বেণুদা। বিছানায় তার পায়ের কাছে পরিমলও বসে আছে, যতটা বিষণ্ণ তার চেয়েও বিপন্ন মুখ যেন, অই জলে পড়েছে।

সাগ্রহে পরিমল বললে, কি রে, ভালো লাগছে একটু? তোকে ওখানে নিয়ে যাওয়াই ভুল হয়েছিল আমার।

হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত কাপুরুষ আর দুর্বল বলে বোধ হল, মনের ভেতরে বিঁধল অপমানবোধের একটা সূক্ষ্ম কাঁটা। বিছানা থেকে নামতে গিয়ে পা-টা টলে গেল একবার, কিন্তু রঞ্জু সামলে নিলে নিজেকে। বেশ সহজ সতেজ গলায় বললে, না, আমার কিচ্ছু হয়নি।

—না হওয়াই উচিত।—গম্ভীর গমগমে গলায় কথাটা বললেন বেণুদা, হাসলেন।—এত সহজেই কি দমে গেলে চলে? আজকাল ছেলেরা তো আর ননীর পুতুল নয়, তাদের হতে হবে আয়রণম্যান।

—তুমি থামো তো দাদা। মহিলাটি ভ্রূভঙ্গি করলেন: ও-সব বক্তৃতা রেখে দাও। ছেলেটাকে তো প্রায় মেরে ফেলবারই দাখিল করেছিলে তোমরা। সকলেই তো তোমাদের মতো আয়রণম্যাণ নয়, গোঁয়ারও নয়। ও সব সকলের সয় না বাপু।

পরিমল হেসে উঠল: করুণাদি, আপনি কিন্তু রঞ্জুকে অপমান করলেন।

—অপমান! কেন?—করুণাদি একবার কৌতুকভরা চোখ বুলিয়ে নিলেন রঞ্জনের ওপরে, তারপরে তাকালেন পরিমলের মুখের দিকে: এতে অপমানটা হল কোন্‌খানে?

—বাঃ আপমান নয়? ওকে আপনি দুর্বল বললেন, কিন্তু ও সেটা নিশ্চয়ই মেনে নিতে রাজী হবে না।

—উঃ দাদা—বেণুদার দিকে ভর্ৎসনাভরা দৃষ্টি প্রসারিত করলেন করুণাদি: তোমার শিষ্যদের কী বক্তৃতা দিতেই যে তুমি শিখিয়েছ! আর কিছু না হোক কথার চোটেই এরা ভারত উদ্ধার করে ফেলবে দেখছি। বক্তৃতা দিয়েই ইংরেজকে একেবারে ধূলোর মতো উড়িয়ে দেবে ভারতবর্ষ থেকে।

ঘর শুদ্ধ সবাই হাসল, এমনকি রঞ্জনও। কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে এই যে প্রসঙ্গটা উঠেছে তার সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারছে না সে; কেমন অপ্রতিভ, কেমন সংকুচিত মনে হচ্ছে যেন। সত্যিই তো, সে যে দুর্বল, তার যে শক্তি

নেই এটা তো পরিষ্কার ধরা পড়ে গেলে সকলের কাছে। না হয় লেগেছে একটা লাঠি কিংবা ইটের চোট, তাই বলে অমনভাবে বোকার মতো অজ্ঞান হয়ে পড়টা উচিত হয়নি তার, উচিত হয়নি একটা গভীর করুণা আর সমবেদনার প্রার্থীরূপে নিজেকে সকলের সামনে ধরে দিতে। দেখেছে ফাঁসির দড়ির স্বপ্ন, বুক পেতে নিতে চেয়েছে এগিয়ে চলার পথের সব চাইতে রূঢ় আঘাত; গুরু-গোবিন্দের মতো "তুরঙ্গসম অন্ধ-নিয়তি'র রশ্মি আঁকড়ে তাকে ছোটাতে চেয়েছে মৃত্যুর চড়াই উত্‌রাই চুরমার করে। কিন্তু একি হল! সকলের কাছে তো ধরা পড়ে গেল তার দুর্বলতা, তার অশক্ত পঙ্গুতা!

এ ঘরে আর থাকা চলে না—অত্যন্ত অপরাধী মনে হচ্ছে। সেই সঙ্গে মনে পড়েছে বাড়ির কথাও। বেরিয়েছে সেই বিকেল চারটেয়, অথচ ঘরের দেওয়াল ঘড়িতে এখন দেখা যাচ্ছে পৌনে আটটা। বাড়িতে কৈফিয়তের কথাটা ভাবতেই আশংকায় তালু অবধি শুকিয়ে উঠল তার।

—বাড়ি চল পরিমল।

করুণাদি বললেন, বোসো, একটু চা খেয়ে তাজা হয়ে যাও।

—নাঃ, চা আমি খাব না।

বেণুদা বললেন, তা হলে একটা গাড়ি ডেকে আনো পরিমল। ও হেঁটে যেতে পারবে না।

—কিছু দরকার নেই। আমি বেশ হাঁটতে পারব, আমার কিছু হয়নি।

করুণাদি এগিয়ে এলেন, নরম আঙুলে একবার কপালের ব্যাণ্ডেজটা পরীক্ষা করে দেখলেন রঞ্জনের। চমৎকার ভালো লাগল স্পর্শের এই অনুভূতিটুকু। ভারী নরম, ভারী কোমল করুণাদির হাতে ছোঁয়া। কেমন যেন ঘুম জড়িয়ে আসে, ব্যথা জুড়িয়ে যায়, মনে হয় মা হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন ছেলেবেলায় ঘুম পাড়ানোর আগে।

—আচ্ছা এসো ভাই।—করুণাদি হাসলেন: তাই বলে আমাদেরও ভুলে যেয়ো না। পরিচয়টা তো হল, পরিমলের সঙ্গে এসো মাঝে মাঝে এখানে, কেমন?—করুণাদি একটু থামলেন, ছায়াজড়ানো চোখে বললেন, তাই বলে অজ্ঞান অবস্থায় নয়, বেশ ভালো ছেলের মতো আর লক্ষ্মী হয়ে॥

এত সুন্দর লাগল কথাগুলি।. বুকের ভেতরে কেমন ছলছলিয়ে উঠল, কেন যেন ইচ্ছে করল হেঁট হয়ে সে করুণাদির পায়ের ধুলো নেয়। কিন্তু কেমন বাড়াবাড়ি ঠেকবে, সবাই কী ভাববেন কে জানে। তবু আচমকা একটা খেয়ালের মতো বোধ হল অজ্ঞান হয়ে এলেও নেহাৎ মন্দ হয় না সেটা।

অন্তত করুণাদির এই হাতের ছোঁয়াটা পাওয়া যাবে এবং এও নেহাৎ মন্দ একটা জিনিস নয়।

—আচ্ছা, আসব।

লণ্ঠন ধরলেন করুণাদি, আগে আগে চললেন বেণুদা, মাঝখানে রঞ্জন। আর এতক্ষণে জায়গাটাকে চিনতে পারল। ওই তো বড়ালদের মন্দিরটা, বরদাবাবুর বাগান, মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তায় টিপ টিপ করে জ্বলছে কেরোসিনের আলো।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বেণুদা বললেন, রঞ্জন :

—উঁ ?

—ব্যথা পেয়েছ সত্যি, কিন্তু তাই বলে ভয় পেয়ো না। জানোই তো।

আন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে ?

রঞ্জন চুপ করে রইল, কী জবাব দেবার আছে ভেবে পেল না।

বেণুদা বললেন, আচ্ছা তবে যাও। রাত হয়ে গেছে, আর দেরী কোরো না। পরিমল, ওকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে কৈফিয়তের হাত থেকে বাঁচিয়ে তবে তোমার ছুটি, বুঝেছো ?

পরিমল মাথা নাড়ল।

দু পা এগিয়েছে, হঠাৎ পেছন থেকে ডাক : রঞ্জন ?

করুণাদি। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন লণ্ঠন হাতে। শাড়ির জরি-পাড়টা চিক চিক করছে আলোয়, কানের একটা গয়না উঠছে ঝিলমিল করে। সুকুমার শ্যামল মুখের ওপরে প্রতিটি ভাঁজে আর রেখায় আরো গভীর, নিবিড় ছায়া যেন লুটিয়ে পড়েছে।

বললেন, ভুলো না রঞ্জন, আবার এসো, কেমন ?

—আসব, নিশ্চয় আসব। রঞ্জনের গলা আবেগে বেশ খেয়ে গেল এবারে।

বেণুদার পাশে, লণ্ঠন হাতে তখনো দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন করুণাদি। কিন্তু আর পেছন ফিরে তাকানো চলে না, এবার এগোতেই হবে বাড়ির দিকে।

ল্যাম্পপোস্টের মিটমিটে ভুতুড়ে আলোয়, খোয়া-ওঠা প্রায় নির্জন পথ দিয়ে চলল দুজনে। পরিমল যেমন মাঝে মাঝে অদ্ভুতভাবে চুপ করে থাকে, তেমনি নিঃশব্দেই চলেছে পাশাপাশি। ল্যাম্পপোস্ট যত পেছনে সরছে তত দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে নিজেদের ছায়া, অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘতর হয়ে, আবার

আর একটা পোস্টের কাছাকাছি আসতেই পায়ের নিচে গোল হয়ে জড়ো হচ্ছে সেটা—ছড়িয়ে পড়ছে পাশে পাশে।

কিন্তু কতক্ষণ আর ভালো লাগে নিজের ছায়া দেখতে দেখতে চলা? রঞ্জন অধৈর্যভাবে প্রশ্ন করল, ওটা বেণুদার বাড়ি, না?

—হুঁ।

—করুণাদি কে ভাই?

পরিমল সংক্ষেপে বললে, বেণুদার বোন—আমাদের সকলের দিদি।

—বেশ করুণাদি, না?—রঞ্জন সাগ্রহে পরিমলের দিকে তাকালো, করুণাদি সম্পর্কে আরো কিছু জানতে চায় বিস্তীর্ণ ভাবে। সমর্থন চায় নিজের বিশ্বাসের।

—হুঁ।—একটু থামল পরিমল: কিন্তু ভারী কষ্টের জীবন করুণাদির—ভারী ব্যথার জীবন।

—কষ্ট, ব্যথা! রঞ্জন চমকে উঠল: কেন?

—আর একদিন বলব—শ্রান্ত স্বরে জবাব দিলে পরিমল।

ক্ষুন্নভাবে চুপ করে রইল রঞ্জন। ওই এক দোষ পরিমলের। পরে বলব, আর একদিন বলব। আভাস দেয়, অথচ স্পষ্ট করে না, ঠেলে দিতে থাকে জিজ্ঞাসার আকুল কালো অন্ধকারের মধ্যে। এ এক বিশ্রী লুকোচুরি খেলা—সমস্ত মনকে ক্লান্তিতে অবশ করে দেয়, বিকল করে দেয় বিরক্তিতে।

—এগারো—

এক একটি দিন। খণ্ড, বিচ্ছিন্ন। একটি সূর্যোদয় থেকে আর একটি উদয়রাগ পর্যন্ত সৌরগোলকের পরিক্রমা। চব্বিশটি ঘণ্টা দিয়ে ছকে কাটা দিন—নানা রঙের দিন। আলাদা আলাদা রূপ, নতুন ভাবনা, নতুন সংঘাত। পরিচিত পৃথিবীতে অজস্র অগণিত অপরিচয়ের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ানো। তিলে তিলে পলে পলে নিজেকে জানা, নিজের শক্তিকে, দুর্বলতাকেও।

নানা রঙের খণ্ড ছিন্ন দিন। বহু-বিচিত্রে পরিকীর্ণ, স্বাতন্ত্র্যে সীমাঙ্কিত। তারপর দূরে সরে এলে মনে হয় যেন কোনো অন্ধকার রাত্রিতে চলন্ত ট্রেণের সে যাত্রী। কালি ঢালা বন-বনান্তরে গ্রাম-গ্রামান্তের একটা নির্বিশেষ অবিচ্ছিন্নতা যেন ধরা দেয় চোখের সামনে! সেই অচ্ছেদ চলিষ্ণুতার ভেতরে দ্রুত পেরিয়ে

যাওয়া ছোট স্টেশনের এলোমেলো আলোর মতো নির্বিশেষের মধ্যেও কোনো বিশেষের মোহময়তা। সুদূর অতীতে বিস্মৃতপ্রায় রূপদক্ষের হাতে তীক্ষ্ণোজ্জ্বল শলা-ছেদনী ঝকমক করে ওঠে শিলালিপির পাষাণপটে। সমস্ত মানসিকতার সঙ্গে সেদিন যাদের যোগ ছিল—হয়তো অলক্ষ্য, হয়তো নিছক অর্থহীনভাবে—আজ তাদের সম্পূর্ণ তাৎপর্যটি ধরা পড়ে গেছে; পাওয়া গেছে মানসিক সংযোগের সেই সূক্ষ্মসূত্রটি—সেদিন অজানিতে যার অঙ্কুর পড়েছিল, আজ তা পল্লবিত হয়ে জীবনের বীথি দিয়েছে রচনা করে। আর সেই ছায়াবিস্তারের নিচে শুকিয়ে মরে গেছে অনেক গুল্ম, অনেক নতুন চারার নতুন পাতা—যেগুলিকো হয়তো সেদিন ভুল হয়েছিল আগামী কালের বনস্পতি ভেবে।

সেদিনকার সেই মারামারি ব্যাপারটা অনেকখানি গড়িয়েছিল অবশ্য! শেষ পর্যন্ত পুলিশও এসেছিল। হালদারকে ধমকে দিয়ে গেছে, একটা নামমাত্র ভাড়ার ব্যবস্থাও ফণীর মার কাছ থেকে ক'রে দিয়েছেন কোতোয়ালী থানার অফিসার ইন্‌চার্জ স্বয়ং। হালদার গজর গজর করে বলেছে, এভাবে অন্যায় জুলুম যদি গরীবের ওপর হয় স্যার।

দারোগা ধমকে দিয়েছেন: বেশি কথা বাড়াবেন না মশাই। গুণ্ডা এনে হাম্‌লা করেছিলেন, মারামারির ব্যবস্থা করেছিলেন। ফের বকবক করেন তো ট্রেসপাস্‌, গুণ্ডা আইন আর রায়টিঙের চার্জে চালান করেন দেব। শহরের মানী ব্যবসায়ী বলে এ যাত্রা আপনাকে ছেড়ে দিলাম কিন্তু ভবিষ্যতে আপনি হুঁশিয়ার হবেন।

তারপরেই সরে পড়েছে হালদার। তবে যাবার সময় কাঁকড়া বিছের ল্যাজের মতো ভ্রূজোড়া নাচিয়ে বলে গেছে, যদি দিন পাই তবে ওই তরুণ সমিতির ছোকরাদেরও একবার আমি দেখে নেব। এ অপমান ভোলবার বান্দা নই আমি।

তবে দারোগার নিরপেক্ষতা আছে। বেণুদাকেও তিনি থানায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে নিষেধ করে দিয়েছেন এসব অনধিকারচর্চা করতে। যদি কোথাও কোন অন্যায় ঘটে, তার জন্যে পুলিশ আছে এবং এই কারণেই গভর্ণমেণ্ট পুলিশ ডিপার্টমেণ্টকে পোষণ করে থাকেন। কিছু করণীয় থাকলে থানাতেই একটা খবর দেওয়া উচিত, নিজেদের হাতে আইনের ভার নেওয়াটা বে-আইনী।

বেণুদা হাসিমুখে বলছেন, আচ্ছা মনে থাকবে।

দারোগা আরো দু চারটে কথা বলেছেন বেণুদাকে, কিন্তু গলা নামিয়ে

অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে। হিতৈষী বন্ধুর মতো তিনি বেণুদাকে জানিয়েছেন যে তরুণ সমিতির কার্যবিধি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট নানা কারণে সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং এই ক্লাবটির পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে শুভার্থী হিসেবে তিনি বেণুদাকে সংযত এবং সাবধান থাকবার অনুরোধ জানিয়েছেন।

বেণুদা বলেছেন, অনুরোধ তিনি ভুলবেন না।

মোটামুটি ভাবে ঘটনার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে ওখানেই। আর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় রঞ্জন বাড়িতে এসে পৌঁছাতে যে একটা তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গিয়েছিল, ঠাকুরমা গলা ছেড়ে আর্তনাদ জুড়ে দিয়েছিলেন, তার সব সুরাহা করে দিয়েছে পরিমল। বেশ চমৎকার করে বুঝিয়ে দিয়েছে এবং কথাটা সত্যিও বটে, যে এই নিরীহ ভালোমানুষটির কোনো দোষই ছিল না। পথে দুদলের মধ্যে মারামারি হচ্ছিল, তারই একটা ঢিল ছিটকে এসে রঞ্জনের কপালে লেগে যায়, তাই—

তাই দুরন্ত ছেলের ওপর একপ্রস্থ বকুনি বর্ষণ করেই বড়রা ক্ষান্ত হয়েছেন। কপাল ভালো, বাবা এক সপ্তাহ থেকে মফঃস্বলে, তাই জেরার সামনে পড়তে হয়নি। নইলে হয়তো পরিমলের সঙ্গে মেশা কিংবা তরুণ সমিতিতে যাতায়াত করাটাও বন্ধ ক'রে দিতেন তিনি।

পরিমল পরের দিন সকালেই খবর নিতে এল। মাথাটায় অল্প অল্প যন্ত্রণা, তখনো নির্জীবভাবে বিছানায় পড়েছিল রঞ্জন। পরিমল চলে এল একেবারে শোয়ার ঘরেই—ছোট বোন্ আধুলী ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে।

পরিমলকে দেখে খুশিতে চঞ্চল হয়ে উঠল রঞ্জন: আয়, আয়।

বিছানার সামনে একটা চেয়ারে টেনে নিয়ে বসল পরিমল: আছিস কেমন?

রঞ্জন ততক্ষণে গায়ের চাদরটা সরিয়ে উঠে বসেছে। অপ্রতিভভাবে বললে, ভালোই আছি।

—যন্ত্রণা-টন্ত্রণা বিশেষ কিছু নেই তো?

—না।

—যাক্, বাঁচালি—একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল পরিমল: দস্তুরমতো আমাদের দুশ্চিন্তায় ফেলেছিলি তুই। যা করে পড়ে গেলি আর যে ভাবে রক্ত ছুটল—দেখে তো আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া! শেষকালে—

লজ্জিত রঞ্জন নীরবে কড়ে আঙুলের নোখটাকে কামড়াতে লাগল।

পরিমল বললে, ওই জন্যেই তো তোকে বলি চলে আয় আমাদের জিমনাস্টিক ক্লাবে। শরীর শক্ত হবে, বুকে বল আসবে। একটা ঘা খেয়েই অমন অজ্ঞান হয়ে পড়বি না।

—হ্যাঁ, আমি ক্লাবের মেম্বার হবো—আস্তে আস্তে, যেন ঘোরের মধ্যে পরিমলের কথার জবাব দিলে রঞ্জন। শুধু শরীরটা শক্ত করবার জন্যে নয়, শুধু একটা ঘা খেয়ে অতি সহজেই অজ্ঞান হয়ে পড়বার অপবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যেও নয়। একটা প্রকাণ্ড দশাসই জোয়ান—ভীমভবানী কিংবা রামমূর্তি হওয়ার বাসনাও নেই। সত্যি বলতে কি, হাত পায়ের ডুমো ডুমো মাস্‌ল ফুলিয়ে, বুকের ওপর একটা পাঁচটনী রোলার চাপিয়ে কিংবা দুহাতে দুখানা চল্‌তি মোটর টেনে ধরে যারা কসরৎ দেখায়, সেই সব অতিকায় জোয়ানেরা কোনো মোহ জাগায় না রঞ্জনের মনে। কেমন স্থূল মনে হয়, নিজের শরীরকে অত করে দেখানোর মধ্যে কোথায় যেন একটা অশালীনতা বোধ করে সে। আসলে তরুণসমিতি তার ভেতরে কেমন একটা বিচিত্র প্রলোভন জাগিয়েছে—সৃষ্টি করেছে একটা নেশার মাদকতা। ওখানকার ছেলেরা, ওখানকার জীবন, ভূতুড়ে জমিদার বাড়ির পরিবেশে ওই আখড়াটা, বেণুদা, বেণুদার একটি কথার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ছেলের লাইন বেঁধে এসে দাঁড়ানো—আর তারপরে মার্চ করে চলা—এদের সবগুলি এক সঙ্গে মিলে কিসের একটা রোমাঞ্চিত চাঞ্চল্য জাগিয়েছে তার চেতনায়। অ্যাডভেঞ্চারের নেশা? ঠিক কী সে জানে না, অথচ এটা জানে যে তরুণ সমিতির ছেলেদের সঙ্গে তার মনের চমৎকার সহযোগিতা ঘটে গেছে তার অজান্তেই।

আস্তে আস্তে বললে, লাইব্রেরীতে যাওয়া হল না যে।

—তুইই তো বাগড়া দিলি। নইলে চমৎকার যাওয়া যেত আজকে।

—বেশ তো, তাই চলো না হয়।

ধ্যেৎ, আজ কী করে হয়। তুই তো উঠতেই পারবি না।

জোর গলায় রঞ্জন বলল—আমার কিচ্ছু হয়নি, আমি ঠিক আছি।

—তুই ঠিক থাকলে কী হবে, বাড়ি থেকেই তো যেতে দেবে না তোকে।

—ঠিক দেবে—সে ব্যবস্থা আমি করব এখন।

—আচ্ছা দেখি—চুপ করে খানিকক্ষণ কী ভাবল পরিমল। তারপর অল্প একটু হেসে বললে, আজ সকালেই বেণুদা এসেছিলেন তোর খোঁজ নিতে—করুণাদি পাঠিয়েছিলেন তাঁকে।

—করুণাদি? রঞ্জুর মনটা হঠাৎ যেন ছলছল করে উঠল। মনে পড়ল

অচেনা ঘর, লণ্ঠনের আলো, শাড়ীর পাড়, কয়েকগাছা চুড়ি আর মায়ের মতো স্নেহভরা মিষ্টি কণ্ঠ।

—বেণুদাকে নিয়ে এলে না কেন?

—আর একদিন আসবেন বললেন।

রঞ্জুর আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সামলে নিলে। করুণাদি কি আসতে পারেন না তাকে দেখতে! এলে কিন্তু বড় ভালো হত। অল্প জ্বর হয়েছিল রাত্রে, আর সেই জ্বরের ঘোরেই করুণাদি সম্পর্কে একটা বেদনাসিক্ত কৌতূহল সমস্ত রাত মনের মধ্যে গুঞ্জন করে ফিরেছে তার। করুণাদির জীবন নাকি বড় কষ্টের, ভারী দুঃখের। কিন্তু কিসের কষ্ট, কিসের দুঃখ তার? বেণুদার বোন—করুণাদির মতো মানুষ—সংসারে এমন কী আছে যা তাঁকে ব্যথা দিতে পারে?

করুণাদির যোগাযোগে আর একটি নামও চমকে উঠল চেতনায়—সে মিতা, সংঘমিত্রা। দু হাত তুলে যে প্রথম নমস্কার করেছিল তাকে। আচ্ছা, মিতা কি জানে তার এই আঘাতের ইতিহাস? একটু কি দুঃখিত হয়নি, একটুখানিও কি চিন্তিত হয়নি তার জন্যে?

কিন্তু মিতার কথাটা জিজ্ঞাসা করা তো আরো অসম্ভব। কেন কে জানে, একবার একটুখানি দেখা ওই মেয়েটির কথা মনে পড়লেই কেমন যেন কষ্ট হয় তার। ড্রাগনের প্রাসাদে বন্দিনী রাজকন্যা। অচেনা অস্বস্তির দেশ থেকে তাকে মুক্ত করে চেনার মাটিতে ফিরিয়ে আনতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আনবে কে? সে নিজেই?

মিতার প্রসঙ্গটা মনের ভেতর উঁকি মারতেই অকারণে লজ্জা পেল সে। তার পরেই সে চিন্তার মোড়টা ঘুরিয়ে নিলে, জিজ্ঞাসা করল মারামারির কী হল ভাই?

পরিমল বললে। হালদারের কথা, দারোগার কথা, বেণুদার কথা। আর পরিমলের সংক্ষিপ্ত কথাগুলোর ভেতর দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন উঁকি দিয়ে উঠল: তরুণ সমিতি সম্পর্কে কী সন্দেহ করেন দারোগা? আর এর উদ্দেশ্যকেই বা এমন বিপজ্জনক বলে মনে করেন কেন গভর্ণমেণ্ট?

কিন্তু এ প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করা নিরর্থক। রঞ্জন জানে কী বলবে পরিমল। তেমনি ঘুরিয়ে জবাব দেবে, আজ থাক, আর একদিন বলব সে কথা।—আর একদিন! রঞ্জন ক্লান্ত হয়ে উঠেছে এই আর একদিনের উৎপীড়নে। মাটির তলায় পাতালপুরীর সুড়ঙ্গ পথ খুলবার মন্ত্রটা নিশ্চয় জানা আছে

পরিমলের কিন্তু সে বলবে না, খালি প্রতীক্ষায় আকুল করে রাখবে, অস্বস্তিতে বিতৃষ্ণ করে রাখবে মন। তার চাইতে কৌতূহলকে সংযত করে রাখাই ভাল।

শুধু বললে, নতুন বই দিবি না আমাকে ?

পরিমল চোখ তুলে সতর্কভাবে তাকিয়ে নিলে ঘরের চারদিকে। আস্তে আস্তে বললে, চুপ। সে হবে পরে, কিন্তু সত্যিই আজ বিকেলে যাবি তুই লাইব্রেরীতে ?

—হুঁ, যাব।

—ডাকতে আসব ?

—না। কেউ টের পেলে বেরুতে দেবে না। তার চাইতে আমিই এক ফাঁকে যাবো তোদের বাড়িতে—তোকে ডেকে নেবখন।

—কিন্তু না বলে গেলে বাড়িতে তো বকাবকি করবে।

রঞ্জন হাসল। সত্তোপড়া রবীন্দ্রনাথের একটা লাইন আউড়ে বললে,

পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে,
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালো ছেলে করে—

পরিমল হাসল প্রসন্নভাবে। ওর মুখের ওপর কেমন একটা মেঘ আড়াল দিয়ে ঘনিয়ে ছিল, সেটা যেন উড়ে গেল একটা হালকা বাতাসে। বললে, কবি, জীবনে সবটাই কাব্য নয়। আঘাত যখন আসে তখন ওই কাব্যের ওপর দিয়েই তাকে কাটিয়ে দেওয়া যায় না।

—তা জানি।—আবেগভরে রঞ্জন বললে, তার সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতেও পারব।

পরিমলের চোখে কৌতুক চকচক করে উঠল কানাইলালের ওপর কবিতা লিখেই ?

—না। দরকার হলে কানাইলালের মতো পিস্তলও ধরতে পারব।

—বটে বটে !—একটা আঙুল ঠোঁটের ওপর দিয়ে পরিমল বললে, স্‌স্‌। অত জোরে নয়। পিস্তল ধরবার অত সাহসই যদি থাকে, তা হলে সময় মতো তারও পরীক্ষা নেওয়া যাবে।

শরীরের মধ্যে যেন ঝড়াৎ করে খানিকটা বিদ্যুৎ বয়ে গেল—ভীষণভাবে ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে মাথার চুলগুলো পর্যন্ত। খোঁচা খাওয়া সাপের গর্জনের মতো একটা তীব্র উত্তেজিত শব্দ করে উঠল রঞ্জন।

—পরিমল !

কিন্তু ততক্ষণে পরিমল উঠে দাঁড়িয়েছে। অনেকটা বেশি বলে ফেলেছে অসংযত হয়ে অনধিকারচর্চা করে ফেলেছে অনেকখানি। বললে, থাক ওসব। আমি চললাম।

নিরুত্তাপ কঠিন গলা। রঞ্জন টের পেল একটু আগেকার অসংযত শিথিলতার ওপরে পাথরের মতো নিষ্ঠুর কঠিনতা এসেছে ঘনিয়ে। একে ঠেলে দেওয়া যাবে না, কোনো অনুরোধ-উপরোধেও স্থানভ্রষ্ট করা যাবে না একে।

দাঁতে দাঁত চাপল সে শক্তভাবে, যেন অত্যন্ত বেগে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ সামনে বাধা পেয়ে আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে। পরিমল আবার বললে, আমি চলি।

—আচ্ছা।

—বিকেলে যাবি তো?

—যাব।

—আচ্ছা—

পরিমল বেরিয়ে যাচ্ছিল, পেছন থেকে রঞ্জন ডাকল: শোন?

—কিছু বলবি?

একটা ঢোক গিলে নিয়ে রঞ্জন বললে, বেণুদা আর করুণাদিকে বলিস আমি ভালোই আছি।

—বলব।

বেরিয়ে গেল পরিমল, একটা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল পেছনের দরজাটা।

কিন্তু তখন মনের মধ্যে যেন ভাঙ-চুর শুরু হয়ে গেছে রঞ্জনের। সারা শরীরে রক্ত উছলে উছলে উঠছে, তার ঝাঁঝ যেন ছড়িয়ে পড়ছে তার নাক মুখ থেকে, একটা জ্বরের মতো উত্তাপ যেন অকস্মাৎ দেখা দিয়েছে তার ত্বকের ওপর। পেয়েছে—যা চেয়েছিল, তার সন্ধান পেয়েছে, মিলেছে বহু প্রত্যাশিত আর প্রতীক্ষিত গোপন মণিকোঠার সন্ধান। পাথরের বাধা চকিতের মধ্যে আড়াল করে দিয়েছে দৃষ্টিকে; কিন্তু ওইটুকুর ফাঁক দিয়েই সে দেখে নিয়েছে সেই আশ্চর্য জগতের একটুখানি আভাস। কোথায় দুর্নিরীক্ষ্য আকাশগঙ্গার মতো—সহস্র কোটি মাইলেরও ওপারের প্রসারিত ছায়া-সরণির মতো ধরাছোঁয়ার বাইরে সেই বিচিত্র পথ। সেখানে বোমার ফুলঝুরি ফুলের মতো ফুটে পড়ল, পিস্তলের আগুন ছুটে গেল নীলিমোজ্জ্বল একটা সুতীক্ষ্ণ ছুরির ফলকের মতো—ফাঁসি কাঠে দুলে উঠল জ্যোতির্ময় শহীদদের ছায়ামূর্তি!

এবার সে পথ তারও পথ। শুধু আর একটু অপেক্ষা করতে হবে—আরো

একটু তৈরী করে নিতে হবে নিজেকে।

মায়ের নজর কিন্তু যেমন কড়া, তেমনি সজাগ। খিড়কি দরজা দিয়ে নিরাপদে সরে পড়ছিল, মা ঠিক ধরে ফেললেন যথাসময়ে।

—এই ছেলে, মাথায় ফেট্টি বেঁধে যাওয়া হচ্ছে কোথায় ?

—একটু মনসাতলায় যাবো মা—তো-তো করে জবাব দিলে রঞ্জন।

—ঠিক মনসাতলায় তো ? একটুও এদিক ওদিক নয় ?

জোর করেই মিথ্যে কথা বললে। সাধারণত তার মুখে আসে না, কেমন ধরা পড়ে যায় বোকার মতো। কিন্তু আজ বলে ফেললে, আর বললে যেন অবলীলা-ক্রমেই। মনের মধ্যে অন্য রকম জোর এসেছে, একটা, বুকের মধ্যে কী একটা জিনিস টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে, চিরদিনের নিরীহ ভালো ছেলেটির ভেতরে ঘূর্ণি হাওয়ায় মাতলামির মতো ঘটে গেছে কেমন বিপর্যয় ব্যাপার।

—না মা—সজোর গলায় রঞ্জন বললে, আর কোথাও যাব না।

—মনে থাকে যেন। আর সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ফিরতে হবে—কেমন ?

—আচ্ছা !

পথে বেরুতেই খাঁচার পাখির মতো ছাড়া পেল মন। শরীরটা একটু আড়ষ্ট বোধ হচ্ছিল, আঘাতের গ্লানিটা সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে যায়নি এখনো। তবু এই আড়ষ্টতাটা কাটাবার জন্যেই যেন সে হেঁটে চলল আরো জোর পায়ে।

—উকু—উকু—উকু—

ঠিক যেন বানরের ডাক। শূন্য থেকে ভেসে এল বলে মনে হল। থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে, তাকালো চারদিকে।

—উকু—উকু—হুক্কা—হুয়া—

বানর আর শেয়াল এক সঙ্গে ডাকছে। কিন্তু তারা তো পাখি নয় যে আকাশ থেকে ডাকবে। তা হলে নিশ্চয় মানুষ। কিন্তু ডাকছে কোত্থেকে ?

হতভম্বভাবে চারিদিকে তাকাতেই প্রশ্নটার জবাব মিলল। রেলওয়ে গুমটিটার পাশে ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটার মাথা সজোরে দুলছে। তার ওপর দিয়ে গুটি তিনেক বানরের মতো মুখ কাঁচা তেঁতুল চিবুতে চিবুতে দাঁত খিঁচোচ্ছে রঞ্জুকে। ভোনা অ্যাণ্ড্ পার্টি ! বেশ আছে।

ভোনা চীৎকার করে 'বাহে' ভাষায় বললে, কুন্ঠে থাকি মাথা ফাটাই আইলু বাহে ? ও গঙ্গাফড়িং, শুনিছেন ?

নষ্টচন্দ্রের ব্যাপারে মনঃক্ষুন্ন হয়ে চটে আছে ওর ওপরে। তাই অকারণ পুলকে এই পেছু-লাগা। জবাব দেওয়া অনাবশ্যক মনে করে হন্‌হনিয়ে চলে গেল রঞ্জন।

—হুক্কা—হুয়া—হুয়া—ধ্বনিটা যেন পেছন থেকে তাড়া করে আসতে লাগল।

আসল সমস্যাটা দেখা দিল এর পরে। এতক্ষণ মনে ছিল না কিন্তু ভারী অস্বস্তি লাগল এবারে। একে তো বড়লোকের বাড়ি, আদব-কায়দা নিয়ম-কানুন সম্পূর্ণ আলাদা। এ সব বাড়ির সামনে আসতে ভয় করে রঞ্জনের, কেমন নার্ভাস বোধ হয় নিজেকে। তার ওপর আবার ডাকতে হবে পরিমলকে। পরিমলের বাবা মোটা চেহারার লোক, দুর্দান্ত মেজাজ, হঠাৎ চাকর লেলিয়ে দেবেন কিনা কে জানে। কেন বড়লোক হল পরিমল? হল ভিন্ন জাতের? তাই তো খাপ খাওয়াতে পারে না, খটকা থেকে যায়। তাই মিতাও বন্দী রাজকন্যার মতো—

শেষ কথাটা ভাবতেই রাঙা হয়ে উঠল কপাল, কুঁকড়ে গেল সমস্ত উৎসাহ। বড় দূরে মিতা—বিশ্রীরকম একটা বেড়া দিয়ে ঘেরা। তাই তার সঙ্গে মিতালির লোভ থাকলেও হওয়া অসম্ভব। এমন একটা প্রাচীর—যা পার হওয়া যায় না, এমন একটা ব্যবধান—অতিক্রম করা দুঃসাধ্য যেটাকে।

রাস্তার ওপরে ল্যাম্প-পোস্টটার তলায় দাঁড়িয়ে ঘামাতে লাগল সে।

সামনে ফুলেভরা বাগান। প্রজাপতি উড়ছে, অল্প অল্প বাতাস লেগে একটা গোলাপের পাপড়ি ঝরে পড়ল ঝুরু ঝুরু করে। ঢেউ-তোলা পাঁচিলটার ওপরে একটা দোয়েল যেন তার বিব্রত অবস্থা দেখে কৌতুকে লেজ নাচাতে লাগল।

বিরক্তিভাবে সাজানো আর ওদের সঙ্গে বিশ্রী ব্যবধান গড়ে রাখা বাড়িটার দিকে মধ্যে মধ্যে অনুসন্ধিৎসু আর আকুল দৃষ্টি ফেলতে লাগল সে। ওই তো দোতলায় পরিমলের পড়বার ঘর, জানালাটা খোলা, তার সামনেকার টেবিলটাকেও এখান থেকে স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে! রঞ্জন ভাবল, ওখানে যদি একবার পরিমল এসে দাঁড়ায়, তবে একটা হাতছানি দিয়েও অন্তত—

নাঃ, বৃথা। পরিমল যেন পণ করেছে জানালার সামনে এসে দাঁড়াবে না। এত বড় বাড়িতে কি একটা জনমানুষও নেই! একবার দরজা খুলে বেরিয়ে এল একটা পশ্চিমা চাকর, উৎসাহভরে তাকে ডাকতে যাবে, কিন্তু বরাত খারাপ, কী মনে করে লোকটা সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে গেল ভেতরে।

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায় বেকুবের মতো? ইতিমধ্যে আবার উকিল সারদাবাবুর ঢ্যাঙা ফোর্ড গাড়িটা ঘটর ঘটর করে চলে গেল রাস্তা দিয়ে—লাল ধুলোয় একেবারে স্নান করিয়ে গেল।

খক্-খক্-খক্। নাকে মুখে একরাশ ধুলো এসে ঢুকেছে।

আর তো পারা যায় না। এগিয়ে গিয়ে একবার দেবে নাকি বুক ঠুকে? নাকি ফিরে চলে যাবে, অথবা সোজা চলে যাবে তরুণ-সমিতির জিমন্যাস্টিক ক্লাবের উদ্দেশ্যে? কিন্তু সেও পরাজয়—আত্মসম্মানে ভয়ঙ্কর বাধছে। মহা ঝামেলাতেই পড়া গেল যা হোক।

কিন্তু এই ত্রিশঙ্কু অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া গেল যেন যাদুমন্ত্রের বলে।

—নমস্কার—

কানের কাছে যেন কাঞ্চন-নদীর ছোট্ট একটি ঢেউ ছলাৎ শব্দে ভেঙে পড়ল।

পরণে নীল রঙের শাড়ী, কপালে কাঁচপোকার টিপ, পায়ে শাদা স্ট্র্যাপের বর্মা চটি। হাতে উল আর ক্রুশ-কাঁটা, কোথা থেকে যেন সেলাই শিখে এল—কুমারী, সংঘমিত্রা লাহিড়ী!

চমকটা সামলে নিলে রঞ্জন, দ্বিতীয় বারের সাক্ষাতে খানিকটা সহজভাব এসে পড়েছে নিজের মধ্যে। প্রতিনমস্কার জানিয়ে পাশ কেটে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু কিশোরী মেয়েটি আসতে আসতে দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করেছে। হাসিমুখে বললে, এখানে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি। কেন বলুন তো!

—এই, এই—মানে—

—দাদাকে ডাকছিলেন, না?

একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল, কিন্তু কেমন একটা লজ্জায় চোখ তুলে তাকানো যাচ্ছে না মিতার দিকে। রঞ্জন তেমনি বিব্রতভাবে বললে, হ্যাঁ, এই—

—তবে রাস্তাতে দাঁড়িয়েছিলেন কেন? ডাকলেই পারতেন।

—এই ভাবছিলাম—

—চলুন, চলুন, আসুন আমার সঙ্গে—

বার্মা চটির একটা মৃদু শব্দে খোয়া ওঠা পথটা মুখর করে মিতা বাড়ির দিকে চলল, রঞ্জন অনুসরণ করলে তাকে।

—আপনি ভারী লাজুক।

মেয়েদের কাছ থেকে লাজুক অপবাদ পৌরুষে ঘা দেয়। কিশোর মনের ওপর থেকে বোঝা সরে গেল। এবারে সে সোজা দৃষ্টি তুলে ধরল মিতার দিকে: কেন বলছেন এ কথা?

বাঃ, সেদিন কী রকম ছুটে পালিয়ে গেলেন। আজ আবার এসে রাস্তার ধারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছেন!—গেটের কবাটটা খুলতে খুলতে মিতা বলে ফেলল: কবিদের বুঝি এইরকম লজ্জা থাকে?

—কবি !—থমকে দাঁড়িয়ে গেল পা।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ,—কবি!—মিতা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল : কিছু জানি না ভাবছেন ? শুনেছি দাদার কাছে। চমৎকার কবিতা লেখেন আপনি—একদিন আপনার কবিতা শোনাতে হবে।

—বাজে কথা—ঘাবড়ে জবাব দিলে সে।

—বাজে কথা বই কি। আপনি তো স্বীকার করবেনই না—যা আপনার লজ্জা! আমিই না হয় একদিন আপনাদের বাড়ি গিয়ে কবিতার খাতা চুরি করে আনব। জানেন, কবিতা পড়তে ভালোবাসি আমি।

জানে। 'কথা ও কাহিনী'র পাতা উলটেই তা বুঝতে পেরেছে।

মিতা বললে, বসুন এই বাইরের ঘরে। দাদাকে ডেকে দিচ্ছি আমি।

হলঘরের মাঝখানে বিহ্বল রঞ্জনকে দাঁড় করিয়ে রেখে সিঁড়ি দিয়ে চটুল ছন্দে উঠে গেল ওপরে—চটির শব্দটা ক্রমে ক্ষীণ হতে মিলিয়ে এল তার!

দাঁড়িয়ে থাকবে কি বসে পড়বে ভাবতে ভাবতে দেখল কখন এক ফাঁকে একটা গদীমোড়া চেয়ারেই বসে পড়েছে। নিজেকে এলিয়ে দিয়ে মনে হল যেন অনেকক্ষণ কঠিন পরিশ্রমের পরে এই মাত্র বিশ্রাম পেল সে। তারপর তাকিয়ে দেখতে লাগল ঘরটাকে। তেমনি করেই সাজানো, বাইরের বাগানটায় ফুল-পাতার বিন্যাসের সঙ্গে ঘরের সজ্জাও যেন সুর মিলিয়েছে। আজকে সেই ধূপের গন্ধটা ভেসে বেড়াচ্ছে না—কিন্তু তার রেশ যেন থম্‌কে আছে চারদিকে। পাথরের মূর্তিগুলো তেম্‌নি শোভা পাচ্ছে ছোটবড়ো টিপয়ের ওপরে। এ বাড়ি তার ভালো লাগে না, তবুও আজ ভালো লাগলো। এককোণে একটা নতুন মূর্তি—যেটা আগের দিন চোখে পড়েনি। ও মূর্তিটা চেনা—নটরাজ, একটা মাসিকপত্রে ওর ছবি দেখেছে। অপূর্ব লাগে ওই মূর্তির ভঙ্গিটা, কেমন রোমাঞ্চ জাগে ওর চারিদিকের শিখা বিচ্ছুরিত বহ্নিবলয়ের দিকে তাকিয়ে। 'হে নটরাজ নৃত্য করো'—। প্রলয়ংকর—ওদের সংকল্পের অধিদেবতা।

কিন্তু মিতা যেন কী করে ফেলেছে ওর,—জলে দোলা লাগবার মতো কেমন ছলছলিয়ে উঠছে শরীর। কবি রঞ্জনের পরিচয় পেয়েছে, কৌতুক করেছে তাই নিয়ে। যেটা তার একান্ত নিজের জিনিস, যা খানিকটা লজ্জাভরা ব্যথার মতো সে অতি যত্নে আগলে রেখেছে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করলে কেমন নিষ্ঠুরতা বলে বোধ হয়, যেন আশা করাই যায় না মিতার কাছ থেকে। কিন্তু ইচ্ছা করেই কি এই নিষ্ঠুরতা করেছে মিতা, না সত্যি সত্যিই সে কবিতা লেখে

শুনে শ্রদ্ধাবোধ করেছে তার সম্পর্কে ?

আবার মিতার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আনতে চেষ্টা করল রঞ্জন। একসঙ্গে ভাবতে চেষ্টা করল অনেক কিছু। আসবার সময় তো আজ বাগানে হরিণটাকে চোখে পড়ল না। নিশ্চয় বাড়ির ভেতরে আছে। কী নীল ওর চোখ দুটো—ভোরবেলাকার আকাশের সঙ্গে মিল আছে সে চোখের, ভিজে ভিজে নীল—যেন সকালের শিশিরধোয়া আকাশের রঙ। ওই নটরাজ মূর্তির যে ছবি দেখেছিল পত্রিকার পাতায়—কী যেন একটা কবিতার লাইন লেখা ছিল তার নিচে ? 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে'—। এত দেরী করছে কেন পরিমল ?

মিতা—না মিতার সম্পর্কে আর ভাববে না রঞ্জন। হঠাৎ ছেলেবেলার একটা ছবি দেখা দিল চোখে। উষা। আঙুলের ডগায় তেঁতুলের আচার চাটতে চাটতে আসছে। বিয়ে দিয়েছিল অশ্বিনী, কচুবনে ছাতনাতলা করে বিয়ে দিয়েছিল তার সঙ্গে—আর মন্ত্র পড়েছিল। কী চমৎকার সে মন্ত্র। তারপর বিয়ের শোভাযাত্রা, আর তার বিয়োগান্ত পরিণতি !

আবছা একটুখানি হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। তার বৌ। এখন তারই মতো বড় হয়েছে নিশ্চয়, আর কারো বৌ হয়েছে কিনা কে বলবে। আচ্ছা, উষার রঙও বেশ টুকটুকে ফর্সা ছিল। মনে হয় যেন তার সঙ্গে মিতার মিল আছে, যেন সেদিনের উষাই আজ কুমারী সংঘমিত্রা হয়ে—

ছিঃ ছিঃ ছিঃ ! ভাবতে ভাবতে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে মন ! নিজেকে বোধ হতে লাগল অত্যন্ত অসভ্য, অপরিসীম বর্বর। সেকি ভোনার স্তরে গিয়ে নামল, রায়-বাড়ির বিমলাকে নিয়ে যে কুৎসিত কথা ওরা বলাবলি করেছিল, ও যেন প্রায় ওই ছেলেগুলোর পর্যায়েই নেমে এসেছে। ছিঃ ছিঃ— এ বাড়িতে আসবার সে অযোগ্য, ভদ্রসমাজে মেশাই তার উচিত নয়। ভোনাদের সঙ্গে ওই তেঁতুল গাছের ডগায় উঠে বসাই উচিত ছিল তার।

আত্মধিক্কারের পর্বটা শেষ হওয়ার আগেই সিঁড়ির মাথায় শোনা গেল পায়ের আওয়াজ। ধক করে উঠল বুক—মিতা ? যেন তলিয়ে যেতে ইচ্ছে করল চেয়ারের কুশনের ভেতরে—যে ভাবনা মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে তার— কেমন করে কথা বলবে সে মিতার সঙ্গে ? কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে শব্দটা আরো নিচে নামতেই পরম তৃপ্তিতে খানিকটা বাতাস টেনে নিল ফুসফুসে। এ মিতার পায়ের আওয়াজ নয়, সে লঘুতা নেই এতে। পরিমল নামছে বোধ হয়।

সত্যিই পরিমল।

জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে নামল সে : একটু দেরী হল। কিন্তু মিতা যে বললে তুই রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলি সত্যি নাকি রে ?

—ধ্যেৎ।

—শোন্, লজ্জার কিছু নেই। এখানে এসে সোজা ডাক দিবি আমাকে—কেউ কিচ্ছু বলবে না। কিন্তু উঠে পড়লি যে ? বোস, চা খেয়ে নিই।

—না ভাই, আজ আর চা খাব না—

—কেন, আপত্তি কী ?

—এমনিই।

কিন্তু এমনিই নয়। এ বাড়িতে আর বসতে ইচ্ছে করছে না রঞ্জনের, বেরিয়ে যেতে পারলেই খুশি হয়। একটু আগেকার বিশ্রী ভাবনাটার রেশ কিছুতেই মিলিয়ে যাচ্ছে না, এখানে যতক্ষণ থাকবে যাবেও না।

—তবে চল্—

দুজনে রাস্তায় এসে পা দিল। আঃ, বাঁচা গেল যেন। চেনা, অভ্যস্ত নিজস্ব জগৎ। মাথার ওপরের আকাশটা। ধুলো আর খোয়ার ভরা পথ। কাঠের উইয়ে-খাওয়া পোস্টের ওপরে ফাটা আর কালিমাখা কেরোসিনের আলো।

—লাইব্রেরীতে যাবি তো ?

—সেই জন্যই তো এলাম।

—বাড়িতে কেউ কিছু বলেনি ?

—মা ধরেছিলেন। ফাঁকি দিয়ে এলাম।

পরিমল হাসল, কিন্তু বিষণ্ণভাবে।

—আমার মা নেই, তাই ফাঁকি দেওয়ার দরকার হয় না কাউকে।

মা নেই শুনলে কষ্ট হয় ! আরো পরিমলের মা। রঞ্জু পড়ার ঘরে তাঁর ছবি দেখেছে। অমন সুন্দর মাকে হারানো সত্যি সত্যি দুর্ভাগ্যের কথা, সহানুভূতি বোধ হল পরিমলের জন্যে।

—কতদিন মারা গেছেন তোমার মা ?

—অনেক দিন। ভালো করে মনেও পড়ে না।—পরিমল ছোট একটা নিশ্বাস ফেলল।

ব্যথিত হয়ে চুপ করে রইল রঞ্জন। নিজের মায়ের মুখখানা ভেসে উঠল মনের সামনে, সঙ্গে সঙ্গে করুণাদিও। আজ একবার গেলে কেমন হয় করুণাদির ওখানে ? কিন্তু কে জানে কী ভাববেন তিনি।

পথ চলতে লাগল দুজনে। একটা খয়েরী-রঙের কোট-পরা লোক পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল সাইকেলে, অনর্থক ক্রিং ক্রিং করে বেলটা বাজালো একবার। পরিমলের চলার ভঙ্গিটা শিথিল হয়ে এল, কঠিন তীব্রদৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল সাইকেলটার দিকে—যতক্ষণ না পথের একটা মোড় ঘুরে মিলিয়ে গেল সেটা।

পরিমলের দৃষ্টিটা লক্ষ্য করলে রঞ্জন।

—চিনিস লোকটাকে?

—হুঁ।

—কে ও?

পরিমলের দৃষ্টি এবার সম্পূর্ণভাবে এসে পড়ল রঞ্জনের মুখে। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বললে, কুকুর!

—কুকুর! সে কি?

—পরে বুঝবি—পরিমল দাঁতে দাঁত কিড়মিড় করে শব্দ করলে: একদিন ওই বুলডগগুলোকে ঠাণ্ডা করতে হবে। চিরকাল এভাবে তো চলবে না, আমাদের দিনও আসবেই। সেদিন সব চাইতে আগে ধনেশ্বরর পালা।

—ধনেশ্বর কে?

—সবচেয়ে ধেড়ে কুকুরটা।

—কিছুই বুঝলাম না ভাই—হতাশভাবে রঞ্জু জবাব দিলে।

—তুই কবিতা লিখলে কী হবে, ভারী মোটা মগজ তোর—কথার সুরে মৃদু তিরস্কার মিশিয়ে পরিমল বললে, ওরা টিকটিকির দল—দিনরাত শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে। দেশের কথা যারা এতটুকু ভাবতে চেষ্টা করে, তাদের গলা টিপে ধরাই এদের পেশা। আর প্রভু ভক্তির পুরস্কার পায় কিছু হাড়-মাংস, দুনিয়ার সব চাইতে কুৎসিৎ জানোয়ার।

এতক্ষণে কথাটা বুঝল রঞ্জন। কেমন ছমছম করে উঠল মন। তাদের পেছনেই লাগেনি তো লোকটা? বাজেয়াপ্ত বই পড়াশুনো করে সে—'ফাঁসির ডাক' 'শহীদ সত্যেন'। আইনের দিক থেকে এগুলো অপরাধ—পরিমলই বলে দিয়েছে, ধরা পড়লে খুব সুখের দাঁড়াবে না অবস্থাটা।

যেমন ভয় করল, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি একটা প্রখর বিদ্বেষ বিষিয়ে উঠল মুখ-না-দেখা খয়েরী রঙের কোট-পরা সেই অপরিচিত সাইকেলের আরোহী সম্পর্কে। লোকটা যেন শনিগ্রহের মতো মনের দিগন্তে সঞ্চার করে দিয়ে গেল অশুভ-সংকেত।

—বাংলা দেশের বিপ্লবীরা তো কত লোককে মেরেছে, ঠাণ্ডা করে দিতে পারে না এদের ?

—দেবে, দেবে।—নির্জন পথটাকে ভালো করে লক্ষ্য করে নিলে পরিমল : সকলের হিসেবেই তৈরী আছে, কেউ বাদ যাবে না। ওদের বিচারের সময়ও আসবে।

রঞ্জন আস্তে আস্তে বললে, যদি আজ কানাইলাল থাকত—

—কানাইলাল শুধু কি একজন ? চারদিকে হাজার হাজার কানাইলাল তৈরীই আছে—শুধু সময় আর সুযোগের অপেক্ষা। কিন্তু—পরিমল নিজের উত্তেজনাটাকে সংযত করে নিলে : রাস্তায় এসব আলোচনা নয় রঞ্জু, মুস্কিল হতে পারে।

বুকের ভেতরে লাফাতে লাগল হৃৎপিণ্ড। ভুল নেই আর, সংশয়ের অবকাশ নেই কণামাত্র। একটু একটু করে নিজের অজ্ঞাতেই পরিমল ধরা দিচ্ছে তার কাছে, আত্মপ্রকাশ করছে। এইবার শুধু আস্তে আস্তে জেনে নিতে হবে চিচিং ফাঁকের মন্ত্রটা। তাড়াতাড়ি করলে হবে না, পরিমল বলবে, আর একদিন। তা ছাড়া তরুণ সমিতি সম্বন্ধে দারোগা যা বলেছেন—

সদর রাস্তা ছেড়ে দুজনে পাড়ার মধ্যে ঢুকল। প্রায় অচেনা পাড়া, কালে ভদ্রে এসেছে দু একবার, বারোয়ারী সরস্বতী কিংবা দুর্গাঠাকুর দেখতে। পাড়ার দুটি চারটি ছেলের চেনা মুখও চোখে পড়ল, কিন্তু আলাপ নেই তার। এমনিতেই তার নিরালা আর ভীরু স্বভাব—নিজের পাড়াতেই তার ঘনিষ্ঠতাটা সীমাবদ্ধ। তরুণ-সমিতির চার পাঁচটি ছেলেও তার ওই রকম মুখ-চেনা, তাদের দুজন রঞ্জনদেরই স্কুলে পড়ে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে।

কয়েকখানা বাড়ি পেরোতেই চোখে পড়ল সাইনবোর্ড। তরুণ-সমিতি পাঠাগার, স্থাপিত : ১৩৩৬ সাল।

মাটির দেওয়াল, টিনের চাল। ভেতরে খানকয়েক বেঞ্চি আর একটা লম্বা টেবিল দেখা যাচ্ছে বাইরে থেকে। সেই টেবিলটার দুদিকে বসে একদল ছেলে হল্লা জমিয়েছে।

পরিমল বললে, এই আমাদের লাইব্রেরী। আয় ভেতরে।

ভেতরে ঢুকল ওরা। ভীরু চোখে রঞ্জু একবার দেখে নিলে এই নতুন পরিবেশটাকে। ঘরের দুদিকে দেওয়াল ঘেঁষে গোটা চারেক বড় বড় বইয়ের আলমারি। একদিকে একখানা ছোট টেবিলের সামনে চশমা-পরা আধবুড়ো একজন ভদ্রলোক খাতায় লিখে লিখে বই দিচ্ছেন দু তিনটি ছেলেকে।

জনকয়েক সামনের লম্বা টেবিলটায় বসে খবরের কাগজ আর মাসিক পত্রিকা পড়ছে, একজন একখানা পত্রিকা উঁচু করে ধরে জোর গলায় কী পড়ে শোনাচ্ছে আর একজনকে। পত্রিকাটার প্রচ্ছদপট রঞ্জন দেখতে পেল,তার নাম 'স্বাধীনতা'। একটি বলিষ্ঠদেহ পুরুষ—বেণুদার মতো চেহারা—দুহাতে বাঁধা লোহার শিকল ছিঁড়ে দুটুকরো করে ফেলছে। 'স্বাধীনতা'—আজ রঞ্জন জানে, সেদিন ওই 'স্বাধীনতা'ই ছিল 'যুগান্তর' দলের অগ্নিময় মর্মবাণী।

দেওয়ালে কতগুলো ছবি।—মানুষের ছবি। তাদের কাউকে কাউকে রঞ্জন চিনেছে, একজন ছেলেবেলা থেকেই তার সঙ্গে পরিচিত, অবিনাশবাবু চিনিয়ে দিয়েছিলেন—মহাত্মা গান্ধী। আর একজনকেও চিনেছে, সত্যবতী গোয়েঙ্কা, দিনকয়েক আগে খবরের কাগজ তাঁর ছবিতে ছবিতে ছেয়ে গিয়েছিল —সত্যাগ্রহ আন্দোলনে প্রথম কারাবরণ করেছিলেন বাংলা দেশ থেকে। তা ছাড়া দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র বসু, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, রবীন্দ্রনাথও আছেন। বাকী যাঁরা, তাঁদের না চিনলেও তাঁরা যে সবাই মস্ত বড় মানুষ এটা বুঝতে কষ্ট হল না।

ছবি ছাড়াও লাল-নীল কালিতে লেখা নানা রকমের পোস্টার।

—বন্দে মাতরম্—

—ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে

মোদের বাঁধন টুটবে—

—ওরে তুই ওঠ্ আজি,

আগুন লেগেছে কোথা, কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি ?

—অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,

তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ-সম দহে।

—স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার—

—আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা,

মানুষ আমরা নহি তো মেষ—

—দিন আগত ওই,

ভারত তবু কই ?

এম্নি সব লেখা—দেওয়াল একেবারে ছেয়ে রেখেছে। আধ ঘণ্টা ধরে ওগুলোই পড়া যায় মন দিয়ে।

—Freedom is our birthright

—Equality, Liberty and Fraternity—

Arise, awake and stop not till
the goal is reached—

প্রত্যেকটি লেখার ভেতরেই একটা নিশ্চিত দৃঢ়তা, নিষ্ঠুর সংকল্প যেন ব্যঞ্জিত হয়ে পড়ছে। ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই তরুণ-সমিতি যেন চোখে আঙুল দিয়ে বলে দিচ্ছে, শুধু গল্প আর উপন্যাস পড়া, শুধু বসে বসে আড্ডা দেওয়া আর বখামি করা—এইটেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। সত্যও নয়। মানুষ হতে হবে, বীর হতে হবে, দেশের জন্যে প্রস্তুত করে নিতে হবে নিজেকে। জিম্‌ন্যাস্টিক ক্লাবে গিয়ে দেখেছিল শরীরকে ভালো করবার আয়োজন, এখানে এসে দেখল মনকেও স্বচ্ছ প্রশস্ত করে নেওয়ার ব্যবস্থা।

বড় ভালো লাগল।

ওরা ঘরে ঢুকতে কেউ কেউ ওদের দিকে তাকালে, কিন্তু কোনো কথা বললে না। শুধু দু একজনের জিজ্ঞাসু চোখের জবাবে মৃদু হাসল পরিমল, তারপর বললে, চল রঞ্জু, তোকে আলাপ করিয়ে দিই আমাদের লাইব্রেরী-য়ানের সঙ্গে।

চশমা-পরা ভদ্রলোকটি তখন ছেলেদের বিদায় করে দিয়ে খাতার পাতা উল্‌টে উল্‌টে কী দেখছিলেন গভীর মনোযোগে। পরিমল সামনে গিয়ে দাঁড়াতে চোখ না তুলেই বললেন—হুঁ, কী বই ?

পরিমল হেসে উঠল : বই নয় ক্ষিতীশদা, মানুষ।

—মানুষ—অ্যাঁ ?—ক্ষিতীশদা এবারে চোখ তুললেন, বললেন, ও পরিমল ? বেশ, বেশ। তারপর, সঙ্গে এ কাকে এনেছ ? কোনোদিন দেখিনি তো একে—বন্ধু নাকি তোমাদের ?

—হ্যাঁ, আমার বন্ধু রঞ্জন চ্যাটার্জি ! মেম্বার হবে।

—মেম্বার হবে ? বেশ বেশ।—ক্ষিতীশদা সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের এক পাশ থেকে একখানা রসিদ বই টেনে আনলেন : ভর্তি ফী আট আনা, আর এ মাসের চাঁদা দু আনা—এই দশ আনা লাগবে।

পরিমল এবার জোরে হেসে উঠল : আচ্ছা মানুষ তো আপনি ক্ষিতীশদা ! খালি বই আর চাঁদা, চাঁদা আর বই ! ওকে নিয়ে এলাম কোথায় আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে, আর সঙ্গে সঙ্গে আপনি কাবলীওয়ালার মতো চাঁদা চেয়ে বসলেন !

—ওহো, তাও তো, তাও তো—

যেন অপ্রতিভ হয়ে গেলেন ক্ষিতীশদা। বললেন, বোসো বোসো, ওই

টুলদুটো টেনে নিয়ে বোসো তুজনে। বেশ বেশ।

বোঝা গেল 'বেশ বেশ' কথাদুটো ক্ষিতীশদার মুদ্রাদোষ। ওরা বসতেই তিনি কেমন শান্ত আর নিরীহ চোখে চশমার মধ্য দিয়ে ওদের দিকে তাকালেন। কিছু একটা বলতেও যাচ্ছিলেন, কিন্তু একটা উত্তেজিত উগ্র কণ্ঠস্বরে থেমে গেলেন তিনি, পরম বিরক্তিভরে ভ্রূকুটি করে তাকালেন আর একদিকে।

'স্বাধীনতা' পত্রিকার পাঠক সেই ছেলেটি। পড়তে পড়তে তার উৎসাহ যেন আর বাগ মানছে না। গলা একেবারে সপ্তমে চড়িয়ে বক্তৃতার ঢংয়ে শুরু করেছে :

'সত্যাগ্রহ আন্দোলনের এ শিক্ষা আমরা ভুলব না। ভুলব না জাতির প্রাণশক্তির এই অকারণ অপব্যবহার। মহাত্মা গান্ধীর ভ্রান্ত নেতৃত্ব দেশকে দিনের পর দিন কাপুরুষতার পথেই ঠেলে দেবে। I have committed a Himalayan blunder বলে যিনি আজ নিজের অপরাধের বোঝা স্খালন করতে চাইছেন—

—ওরে থাম্ থাম্, কানের পোকা তাড়িয়ে ছাড়লি যে মণ্টু!

মণ্টু থামল। বললে, খুব জোর লিখেছে কিন্তু ক্ষিতীশদা।

—জোর লিখেছে বলেই অত জোরে জোরে পড়তে হবে নাকি? একটু মনে মনে পড় বাপু, ঝালাপালা করে দিলি যে!

মণ্টু মনে মনে পড়ল না বটে কিন্তু স্বর নামিয়ে নিলে। আর ক্ষিতীশদা লোকটিকে বেশ লাগল রঞ্জনের, যেমন নিরীহ তেমনি গোবেচারা। ইস্কুলের ড্রয়িং মাস্টার ড্রয়িং মাস্টার ভাব, তরুণ সমিতির এই আগ্নেয় আর উগ্র পরিবেশের ভেতরে কেমন যেন আকস্মিক আর বেমানান বলে বোধ হয় তাঁকে।

ক্ষিতীশদা পকেট থেকে নস্যির ডিবে বার করে এক টান টেনে নিলেন। বললেন, কী নাম বললে যেন? রঞ্জন চ্যাটার্জি, না?

—হুঁ—রঞ্জনের হয়ে পরিমল জবাব দিলে: ও ভারী বই পড়তে ভালোবাসে। আপনাকে ভালো বই দেখে দিতে হবে।

—তা দেব। বেশ বেশ। অক্ষয় দত্তের বই আছে, ভূদেবের পারিবারিক প্রবন্ধ আছে—

—আঃ, আপনি একেবারে হোপ্‌লেস ক্ষিতীশদা!

ক্ষিতীশদা নস্যির আমেজে সর্দি টানার মতো একটা আরামের শব্দ করলেন নাকে।

—আমি একেবারে হোপ্‌লেস? বেশ বেশ। তা ওসব বই পছন্দ না

ছলে অন্য জিনিষও আছে—মেঘনাদবধ, বৃত্র-সংহার—

—উঃ, ক্ষিতীশদা থামুন। আপনি যে কেন মধুসূদনের যুগে জন্মাননি তাই ভাবি। ওসব ছাড়া একালে বুঝি আর পড়বার মতো বই নেই কিছু?

—একাল?—ক্ষিতীশদা একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলেন: ওই রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র? ওদের লেখা আমি পড়ি না, ওরা লিখতেই জানে না। যাই বলো, বঙ্কিম-বিবেকানন্দের পরে বাংলা দেশে সাহিত্য বলে আর কিছু লেখাই হল না।

এমন করে কথাটা বললেন ক্ষিতীশদা যে, পরিমলের সঙ্গে রঞ্জনও হেসে উঠল এবারে। আচ্ছা মজার মানুষ তো। তরুণ-সমিতির মতো কড়া লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান হয়েও একেবারে সেকালে পড়ে আছেন—আশে-পাশে সমস্ত পৃথিবীটাই যে বদলে যাচ্ছে দিনের পর দিন, খেয়ালই করেননি সেটা।

—হয়েছে, থাক—সদয়ভাবে পরিমল বললে, আপনাকে আর সাহিত্য-চর্চা করতে হবে না। কিন্তু রঞ্জু তো চাঁদা আনেনি, আমার কার্ডেই ওকে দুটো বই দিন।

—তোমার কার্ডে? তা বেশ বেশ।—ক্ষিতীশদা বড় খাতাটার পাতা উল্টে চললেন: কোনো বই-টই ইস্যু করা নেই তো?

—না, দেখুন না—

—খাতাটা উল্টে পাল্টে নিশ্চিন্ত হলেন ক্ষিতীশদা: বেশ বলো, কী বই নেবে? পরিমল ক্যাটালগ খুলে চোখ বুলোতে লাগল।

—এটা আছে? শরৎচন্দ্রের 'তরুণের বিদ্রোহ?'

—না, ইস্যুড্।

—বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী?

—ওটাও বাইরে।

—নির্বাসিতের আত্মকথা?

ক্ষিতীশদা একটা হাই তুলে বললেন, দিলীপ নিয়ে গেছে।

—ধ্যেৎ, ভালো বইগুলো সব বাইরে।—পরিমল বিরক্ত গলায় বললে, এটা—সিন্‌ফিন্?

—হুঁ, আছে।

—যাক্, মন্দের ভালো। আর এটা পাওয়া যাবে—বিমল সেনের 'মা?'

—এইমাত্র ফেরৎ এল। একটু দেরী হলে আর পেতে না।

বই দুটো নিয়ে পরিমল বললে, নে রঞ্জু।

—বাঃ, তুই নিবি না একখানাও ?

—আমার ওসব পড়া।

ক্ষিতীশদা আবার একটা হাই তুললেন, তারপর আর এক হাতে তুড়ি বাজিয়ে বাড়িয়ে নিলেন নিজের আয়ুটাকে। অসন্তুষ্ট গলায় বললেন, কী যে সব বাজে বই পড়ো—কিচ্ছু হয় না। তার চাইতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণ চরিত্র' নিয়ে যাও, পড়লে কাজ হবে !

—ও জ্ঞানটা আপনার জন্যেই তোলা থাকল ক্ষিতীশদা—পরিমল খোঁচা দিলে।

—আমার জন্যে ? তা বেশ বেশ। কিন্তু আজকালকার ছেলেদের দোষই এই—ভালো কথা কানে নিতে চায় না।

হুঁ—দুঃখের কথাই বটে—সায় দিয়ে পরিমল বললে, চল রঞ্জু, এবার জিমন্যাস্টিক ক্লাবের দিকে যাওয়া যাক।

—জিমন্যাস্টিক ক্লাবে—এক মুহূর্তের জন্যে চিন্তা করে নিলে রঞ্জন : কিন্তু আজ আর নয় ভাই। মাকে মিথ্যে কথা বলে চলে এসেছি, দেরী করে গেলে ধরা পড়ে যাব নিশ্চয়।

—তাও বটে। কিন্তু করুণাদির সঙ্গে দেখা করবি না একবার ? তোকে যেতে বলেছিলেন কিন্তু।

করুণাদি ! সঙ্গে সঙ্গে মনটা যেন আবেগে আর আগ্রহে আকুল হয়ে উঠল। মায়ের মতো সেবা করেছিলেন, স্নেহ-ঝরা নরম আঙুল আহত কপালে বুলিয়ে দিয়ে যেন সমস্ত যন্ত্রণা তার মুছে নিয়েছিলেন। কী আশ্চর্য ভাবে দুজন দেখা দিয়েছে তার কিশোর জীবনের দিকচক্রে। একজন মিতা, আর একজন করুণাদি। অতটুকু মেয়ে মিতা, বয়েসে তো তারই সমান, তবু মিতাকে কেমন ভয় করে—কেমন যেন নিজেকে অপ্রস্তুত আর বিপন্ন বলে মনে হয় ওর সামনে দাঁড়ালে। আর করুণাদি। প্রথম পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই একটা অন্তরঙ্গতা হয়ে গেছে মনের, ছোড়দির মতো চেহারা, মায়ের মতো মন।

ক্ষিতীশদাকে নমস্কার জানিয়ে উঠে পড়ল ওরা। ক্ষিতীশদা বললেন, চললে, বেশ বেশ। আবার কাল এসো। আর মনে করে দশ আনা পয়সা এনো, আট আনা ভর্তি ফী আর দু আনা চাঁদা।

—উঃ, কী দুর্দান্ত লাইব্রেরীয়ান ! এর চাইতে কাবুলীওয়ালাও ভালো। মন্তব্য করলে পরিমল।

ক্ষিতীশদা জবাবে এক মুখ প্রসন্ন হাসি হাসলেন।

পথে বেরিয়ে রঞ্জন বললে, অনেক বই আছে তো লাইব্রেরীতে।

—তা মন্দ নয়, আরো বাড়বে—অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল পরিমল।

পথ চলতে চলতে হাতের বইটা দেখেছিল রঞ্জন। জিজ্ঞাসা করলে, সিন্‌ফিন্ কী ভাই?

—পড়েই ছাখ না। তোর ওই দোষ রঞ্জু, ভারী অধৈর্য।

বেণুদার বাসার দরজায় কড়া নাড়ল পরিমল।

—কে?

তীক্ষ্ণস্বরে সাড়া এল বাইরের ঘর থেকে। বেণুদার গলা।

পরিমল সবিস্ময়ে বললে, ব্যাপার কী, বেণুদা এখনো ক্লাবে যান নি?

—কে?—আবার সাড়া এল তীক্ষ্ণ গলায়।

—আমি পরিমল, আর রঞ্জু।

—ওঃ একটু দাঁড়াও।

মিনিট তিনেক চুপচাপ বাইরে দাঁড়ানোর পর দরজা খুলে গেল। বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে বেরুল তিন চারজন ছেলে, ওরা এতক্ষণ কিছু আলোচনা করছিল ওখানে। ওদের দুজনকে চিনল রঞ্জন, জিমন্যাস্টিক ক্লাবে দেখেছে। বাকী দুজন একেবারের অচেনা। নীরবে বেরিয়ে এল ওরা, কোনোদিকে তাকালো না হনহন করে এগিয়ে চলে গেল।

বেণুদা বললেন, এসো, ভেতরে এসো।

সেদিন শোবার ঘর দেখেছিল, আজ দেখল বাইরের ঘর। ঘরে চেয়ার টেবিল নেই, চওড়া খাটে ময়লা চাদর পাতা। কিন্তু খাটটা দেখে বোঝা যায় আর যাই হোক ওর ওপরে কেউ শোয় না, কারুর শোয়াও চলে না। রাশি রাশি বই আর খবরের কাগজ। খাটের বারোআনী বইতে ঢাকা, কতক ছড়িয়ে আছে মেঝেতে। ঘরের একদিকে হেলান দেওয়া পিতলের তার দিয়ে গিঁটে গিঁটে বাঁধানো কালো কুচকুচে একখানা অতিকায় লাঠি। দেওয়ালে একটা হুকের সঙ্গে ঝকঝকে উজ্জ্বল একখানা ভোজালী ঝুলছে।

বইয়ের স্তূপ সরিয়ে বেণুদা ওদের বসতে দিলেন। কিন্তু প্রসন্নমুখে বেণুদার আজকের চেহারা দেখে দুজনেই চমকে উঠল একসঙ্গে। তাঁর চোখে একটা লালের আভা—আগ্নেয় দীপ্তির মতো কী যেন ঝকমক করে খেলে যাচ্ছে সেখানে। চাপা দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে, গেঞ্জীর নিচে দুলে দুলে উঠছে চওড়া বুকটা। যেন এই মাত্র খানিকটা কঠিন পরিশ্রম করেছেন তিনি—সমস্ত মুখে

একটা তীব্র উত্তেজনা জলজল করছে।

—কী হয়েছে বেণুদা?

—উঁ? বেণুদা তীক্ষ্ণ চোখে পরিমলের দিকে তাকালেন।

—কী হল?

গভীর একটা নিশ্বাস টেনে নিয়ে বেণুদা বললেন, দরজাটা বন্ধ করে দাও।

মুখের চেহারা বদলে গেল পরিমলের। দরজা বন্ধ করবার জন্যে সে উঠে দাঁড়ালো, আর সেই সঙ্গে কেমন তির্যকভাবে তাকালো রঞ্জনের দিকে। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারল রঞ্জন। কোনো বিশেষ গোপনীয় কথা আছে, সে কথার ভেতরে তার থাকা উচিত নয়। অতএব—

রঞ্জন সূক্ষ্ম অভিমান আর আহত আত্মমর্যাদা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো: আচ্ছা, আমি বাইরে যাচ্ছি।

—দরকার নেই—বোসো।

মৃদু বিস্ময়ে পরিমল বললে, ও থাকবে?

—থাকুক।

চোখের কোণা দিয়ে পরিমল ইঙ্গিত করলে রঞ্জনকে। ভাবটা বুঝতে পারা গেল। সে ভাগ্যবান, পরীক্ষার প্রথম ধাপটা সে অত্যন্ত সহজেই পার হয়ে গেছে।

করুণাদির কথা মনে মাথা চাড়া দিচ্ছিল—প্রশ্নও জেগেছিল। কিন্তু এখানে এসে স্বাভাবিক একটা সংকোচ বোধ হচ্ছে তার। তাছাড়া বেণুদার মুখের এই থমথমে ভাব, এই কঠিন গাম্ভীর্য তাকে বিহ্বল করে ফেলেছে। ঠিক এই রকম মুখের চেহারা সে দেখেছিল অবিনাশবাবুর—যেদিন তিনি নিজের প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্যেই যেন তাঁর কড়াইয়ের নৌকো ভাসিয়েছিলেন বানে ভাসা আত্রাইয়ের ঘোলা স্রোতে। আর সেই রাত্রি—যেদিন উঠোনে স্তূপাকার বিলিতী কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব করেছিলেন বাবা, আগুনের শিখাগুলো থেকে থেকে তাঁর শ্বেত পাথরে গড়া প্রাণহীন মূর্তির মতো চেহারার ওপর দিয়ে পিছলে পিছলে খেলা করে গিয়েছিল।

বেণুদা বললেন, খবর শুনেছ?

—না তো। কী হয়েছে? বিস্মিত আর উদগ্রীব শোনালো পরিমলের স্বর।

—শোনো, অনন্ত সিং সারেণ্ডার করেছেন।

—তাহলে কী হবে এখন?—পরিমল জানতে চাইল।

ওরা দুজনে বেণুদার মুখের দিকে অসংলগ্ন ভাবে তাকিয়ে রইল।

বেণুদা বললেন, সেজন্য ওদের ভাবনা নেই। অনন্ত সিং ভালোই করেছেন—অনেক রিপ্রেশন থেকে বাঁচবে কতগুলো নিরীহ মানুষ। তা ছাড়া মাস্টারদা রয়েছেন এখনও—ওদের আগুন কেউ নেবাতে পারবে না। শুধু আমরাই কিছু করতে পারছি না—

বেণুদার কথা থেকে যেন একটা অজ্ঞাত আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে ঠিকরে পড়তে লাগল রঞ্জনের মনে। ব্যাপরটা বোঝা যাচ্ছে না, অথচ অনন্ত সিং নামটা চেনা হয়ে গেছে এর মধ্যে। ঝড় আসবার আগে যেমন আকাশের এককোণায় খানিকটা নিকষ কালো মেঘ ঘোষণা করে গেছে তার অনিবার্য সূচনা।

হঠাৎ রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে বেণুদা বললেন, তুমি সব জানো রঞ্জন?

—কাগজে পড়েছি।

—না কাগজে সব খবর নেই। আরও অনেক জানবার আছে। শোনো।

বেণুদা বলতে শুরু করলেন। এ সেই আকাশগঙ্গার ইতিহাস—কল্পনার ছায়া-পথের এক অপূর্ব কাহিনী। কিন্তু কোথায় লাগে এর কাছে শহীদ সত্যেন, ক্ষুদিরাম আর কানাইলাল? 'ফাঁসির ডাকে' যে আগুন-ঝরা আহ্বান—সে আহ্বানের চাইতেও লক্ষ গুণ প্রবল হয়ে এ ডাক কানে এল যেন কামানের গর্জনের মতো। আকাশগঙ্গার ছায়াপথে জ্যোতির্ময়তা নয়—সেখানে আগুনের তরঙ্গ উঠছে। তিরিশ সালের বন্যা নয়, উনিশ শো তিরিশ সালে সত্যাগ্রহের প্রাণবন্যাও নয়, এ যা এল তার নাম প্রলয়।

টর্চের আলোয় আর পিস্তলের গর্জনে মুখরিত হল অস্ত্রাগার। শাদা অফিসার রিভলভার হাতে বিপ্লবীদের বাধা দিতে এলেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই ফুসফুস ছিঁড়ে বুলেট গেল বেরিয়ে, বাধা দেবার আশা মিটে গেল তাঁর। তারপর সমস্ত রাত্রি ধরে শহরের বুকের ওপর চলতে লাগল স্বাধীনতার শিকল-ভাঙা তাণ্ডব। টেলিগ্রাফ-টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, উপড়ে গেল রেলপথ। পলাশীর পাপের পর আর সিপাহীবিদ্রোহের ভুলের পর এই আবার নতুন করে জাগল আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী বীর্যবান বিপুল ভারতবর্ষ—জাগল তার প্রাণশক্তি! একরাত্রের মধ্যে চট্টগ্রামের বুকের ওপর থেকে পরাধীনতার কালো অপমান মুছে গেল—স্বাধীন, স্বতন্ত্র। 'ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা'—এ মন্ত্রকে সার্থক করল চট্টলা, তার পাহাড়ের চূড়োয় উড়তে লাগল মুক্তির রক্ত-পতাকা, আর তার ছায়া কাঁপতে লাগল কল্লোচ্ছলা কর্ণফুলীর জলে।

প্রাণ নিল, প্রাণ দিল তারা। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে জীবনের জয়গান গেয়ে

গেল। অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, মাস্টারদা। কিন্তু তারা কোথায়—কেন তারা পেছিয়ে ?

তীব্র চাপা গলায় কথাগুলো বলে গেলেন বেণুদা। গমগম করতে লাগল ঘর। তরল অন্ধকারের মতো ঘন ছায়া ঘরের মধ্যে। শুধু দেওয়াল আর ছাদের সংযোগে জাফ্‌রি কাটা ছোট স্কাইলাইট থেকে একটা অস্পষ্ট আলো এসে ঝিলমিল করতে লাগল ভোজালীর উজ্জ্বল ফলায়, তেল চকচকে লাঠির পিতলবাঁধানো গাঁটে গাঁটে।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর হঠাৎ যেন প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলেন বেণুদা, ফিরে এলেন তাঁর স্বাভাবিকতায়। ওদের দুজনকে অবাক করে দিয়ে তিনি হেসে উঠলেন, কালো মুখের ভেতরে অদ্ভুত শাদা দেখালো দাঁতের সারি। একটা ম্যাজিক যেন পলকে বদলে দিয়েছে মানুষটিকে।

—ওই যাঃ—আসল কথাটাই জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম যে। তারপর, রঞ্জন ?

আচমকা একটা ধাক্কা লেগে ঘুম ভেঙে যাওয়ার মতো শিউরে উঠল সে।

—আমায় বলছেন ?

—হাঁ—হাঁ।—একটু আগে যে বেণুদা কথা কইছিলেন একটা বারুদঠাসা কামানের মতো, তিনি যেন সম্পূর্ণ অন্য লোক: মাথা কেমন তোমার ? সব ঠিক হয়ে গেছে ?

ঘাড় নাড়ল। ঠিক হয়ে গেছে।

—করুণা তোমার খবরের জন্যে ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, আর খালি খালি বকাবকি করছিল আমাকে। যাক—এবারে আমি দায় থেকে রেহাই পেলাম। করুণাকে ডেকে দেখিয়ে দিই তার ফার্স্ট এইড্‌ বেশ কাজ দিয়েছে।

বেণুদা চেঁচিয়ে ডাকলেন, করুণা, করুণা—

—আসছি—করুণাদির সাড়া পাওয়া গেল। তারপর মিনিটখানেকের মধ্যেই আঁচলে হাত মুছতে মুছতে করুণাদি ভেতরের দরজা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন।

বেণুদা বললেন, এই নে তোর আসামী হাজির। কিছু ভয় নেই, একেবারে ঠিক হয়ে গেছে।

—ঠিক হয়ে গেছে ? বাঃ লক্ষী ছেলে।—সস্নেহে করুণাদি হাসলেন। মাথা নিচু করে রইল রঞ্জন। করুণাদির স্নেহ ভালো লাগে, কিন্তু সেই সঙ্গে অস্বস্তিও লাগে যেন। তেরো বছর বয়স হল তার—একেবারে ছেলেমানুষ সে নয়; সে নমস্কার পেয়েছে মিতার কাছ থেকে, মনের ভেতরে এসেছে বড় হয়ে

উঠবার গর্ববোধ—পৃথিবীর কাছে এখন সে দাবী করতে চায় পৌরুষের স্বীকৃতি। কিন্তু করুণাদির স্নেহে সে স্বীকার কোথাও নেই। আছে ছেলেমানুষের অসহায়তা আর দুর্বলতার ওপরে একটা নিবিড় মমতা মাত্র।

করুণাদি বললেন, যা রক্ত পড়ছিল তাতে একদিনেই এমন তাজা হয়ে উঠবে ভাবতে পারি নি।

কথাটা কেড়ে নিলেন বেণুদা: হতেই হবে। কার জিমন্যাস্টিক ক্লাবের মেম্বার সেটা দেখতে হবে তো। একদিন লাগালে শরীর শক্ত হয়ে যায়।

—থাক, হয়েছে। ওকে আর হাওয়া লাগাতে হবে না তোমাকে। রঞ্জন, এসো তো ভাই।

বেণুদা বললেন, ওকেকোথায় নিয়ে যাচ্ছিস?

—আমার জুরিসডিক্শনে। তোমার সংসর্গ থেকে ওকে বাঁচানো দরকার।—করুনাদি হাসলেন: কাল রাত্রে চা খায়নি, আজ গরম গরম সিঙ্গাড়া ভাজছি, খেয়ে যাবে।

পরিমল কলরব করে বললে, বা-রে, একি পার্শিয়ালিটি? মাথা ফাটিয়েই ও সিঙ্গাড়া খাওয়ার সার্টিফিকেট পেয়ে গেল? আর আমরা যে—

—দুষ্টু ছেলেদের আমি খেতে দিই না—দুষ্টুমি করে হাসলেন করুণাদি: তবে ভালো ছেলের বন্ধু হিসেবে দু একটা পেলেও পেতে পারো।

—ভেতরে আসব?

—উঁহু—রান্নাঘরে শুধু আমি আর রঞ্জন। এসো ভাই—

রঞ্জন অনুসরণ করল করুণাদিকে। ভুলে গেল দেরী হয়ে যাচ্ছে, মনে পড়ল না মাকে ফাঁকি দিয়ে আজ পালিয়ে এসেছে এখানে। তা ছাড়া চট্টগ্রামের যে আগুন একটু লকলক করছিল এই ঘরের মধ্যে, তার উত্তাপ যেন সমস্ত শরীরটাতে জ্বলছিল তখনো। একটু ছায়া চাই—বিশ্রাম চাই একটুখানি। সে ছায়াবিশ্রামের আভাস স্নিগ্ধ হয়ে আছে করুণাদির চোখে।

পরিমল পেছন থেকে ডাক দিয়ে বললে, তোকে হিংসে হচ্ছে রঞ্জু। তিন বছরে আমি যা পারিনি, তুই যে একদিনেই তা করে নিলি।

করুণাদি বললেন, তার জন্যে ভালো মানুষ হওয়া দরকার।

—আচ্ছা, আচ্ছা, মনে থাকল।

—হুঁ মনে থাকবে বই কি।—করুণাদি হাসলেন: কিন্তু এসো ভাই রঞ্জন, কড়াতেই ঘি পুড়ে যাচ্ছে আমার।

ভেতরের উঠোনটায় পা দিতে শেষবারের জন্যে কানে এল পরিমলের

অসহায় গলায় আকুতি: ওরে পেটুক, সব সিঙ্গাড়াগুলোই যেন খেয়ে ফেলিসনে, ছুটো চারটে রাখিস, আমাদের জন্যে—

সংঘমিত্রা আর করুণাদি। একজন সরিয়ে দেয়, একজন মায়ের মত কাছে টেনে আনে। শিলালিপির কঠিন পাথরের ওপরে রেখায়িত হয়ে ওঠে অপ্রত্যাশিত কবিতার ছন্দ।

—বারো—

দেখতে দেখতে পুরো ছটা মাস হাওয়ায় ডানা মেলে দিয়ে উড়ে গেল। উড়ে গেল নতুন উড়তে শেখা বিস্ময় আর উত্তেজনায় আনন্দে চঞ্চল একটা হলদে পাখির মতো।

ছমাসের ভেতর দিয়ে পার হয়ে গেছে ষাটটা বছরের অভিজ্ঞতা। তরুণ-সমিতি আর তার জিমন্যাষ্টিক ক্লাবের ব্যাপার ছুর্বোধ্য রহস্য নয় এখন আর। সুড়ঙ্গ-পথের গোপন দরজাটি মুক্ত হয়ে গেছে দৃষ্টির সম্মুখে, আকাশগঙ্গার ছায়াপথে সেও আজ জ্যোতির্ময় মানুষগুলির সহযাত্রী।

ভোনা, কালী, খাঁছু—এদের সম্বন্ধে করুণা হয় এখন। চোখের সামনেই চলে ফিরে বেড়াচ্ছে এরা; কিন্তু কোন সত্যিকারের সত্তা নেই এদের, কোন স্বীকৃত মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব। তোমার আমার এই দেশ—কিন্তু এ কোন্ দেশ? এর বুকের ওপর দিয়ে হাড়পাঁজরা গুঁড়ো করে গড়িয়ে চলছে একটা হাজার মনী রোলারের মতো ইংরেজের শাসন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য আর শক্তি হরণ করে নিয়ে এরা দেশজোড়া কোটি কোটি নিষ্প্রাণ দেহপিণ্ড সৃষ্টি করেছে; আর কোথায় ছুটি একটি জাগ্রত প্রাণ বেঁচে আছে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ নিয়ে, তাদের সন্ধানে লাগিয়েছে টিকটিকির বাহিনীকে। বোবা দেশ—পুতুলের দেশ। দিন আসে দিন যায়, পাপের বোঝার মতো জীবনের ভার হয়ে বেড়ায়। ইস্কুলের ক্লাশে পড়ানো হয় 'ইংরেজের সুশাসন' ভারত-সম্রাট আর লাট-সায়েবদের সুখ্যাতির কোলাহলে ইতিহাস পাল্লা দেয় পরস্পরের সঙ্গে। পাড়ার ছেলেরা খেলার মাঠে হৈ হৈ করে। অশ্লীল আলোচনা করে, শাদা দেওয়ালে লেখে কুৎসিৎ কথা। প্রেমপত্র ডাল পাকিয়ে ছুঁড়ে মারে পাশের বাড়ির মেয়ের দিকে আর গার্লস্ স্কুলের ঘোড়ার গাড়ি দেখলে আকুল কণ্ঠে লায়লা-মজনুর গান ধরে।

এই কি দেশ? এ কাদের দেশ? অবিনাশবাবুর শেখানো গানের কলিটা স্মৃতির নিস্তরঙ্গতার ওপর বহুদূর থেকে দোলা-লাগা মৃদু ঢেউয়ের মতো কাঁপে:
"স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে এদেশ-তোদের নয়—"

কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার যখন ছিল তখন রাস্তায় একদিন গান গাইতে গাইতে বেরিয়েছিল, "মানুষ আমরা নহি তো মেষ।" আজ তার উল্‌টোটাই মনে আসে। মনে আসে সমস্ত দেশের দিকে তাকিয়ে, ভোনা-কালী-খাঁদুর সমান উৎসাহে বিম্‌লি-প্রসঙ্গ আলোচনা আর মনসাতলায় মার্বেলে ফাটানো দেখে।

—উড্ডু কিপ—

—হাত-ইস্টেট —

পাশাপাশি ছবি ভেসে থাকে: Freedom is our birthright!

—জন্ম হইতেই আমরা মায়ের জন্য বলি-প্রদত্ত—

যেতে যেতে যখন দলটার দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে যায়, তখন একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ, একটা আলাদা গৌরবে সমস্ত প্রাণটা জলজল করতে থাকে রঞ্জনের। ওরা জানে না, ওদের পাশাপাশি থেকেও আজ কোন্ একটা আশ্চর্য অগ্নিশতদলে রঞ্জনের অধিষ্ঠান, কোন্ দুর্গম দুরূহ পথ দিয়ে আজ তার জয়যাত্রা, মৃত্যু অতিক্রান্ত হয়ে, নবজীবনের তীর্থতোরণের অভিসারে। ওপরে আগুন-ঝরা আকাশ, সামনে রক্তের ফেনিল সমুদ্র। মনে হয় একটা নতুন, অতি প্রখর দীপ্তিতে আজ মণ্ডিত হয়ে উঠছে যেন। সে বিদ্রোহী, সে বিপ্লবী। ওদের ক্ষুদ্রতার পাশাপাশি সীমাহীন গৌরবে আকাশে তুলে ধ'রেছে তার জয়োদ্ধত মস্তক। তার পায়ের চাপে পাতালে টলমল করে উঠেছে বাসুকীনাগের সহস্রশির। কাজী নজরুলের 'বিদ্রোহী' আবৃত্তি করে বলতে ইচ্ছে করে:

"মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ রাজটীকা দীপ্ত-জয়শ্রীর'
বল বীর,
চির উন্নত মম শির।"

কিন্তু এ গৌরব সহজেই অর্জিত হয়নি তার।

পড়ার টেবিলে বসে ছয় মাসের হিসাব করছিল সে—বাতাসে অ্যাল্‌জেব্রার খোলা পাতাগুলো উড়ে চলছিল। 'পথের দাবী' এল, 'সত্যাগ্রহ ও পাঞ্জাব কাহিনী' এল, এল 'মৃত্যুবিজয়ী গদর দল'—এল আরো অজস্র, আরো রাশি রাশি বই। তারপর সেই বইগুলো নিয়ে আলোচনা করতে লাগল পরিমল, যেন বাজিয়ে দেখতে চাইল তাকে। তারও পরে একদিন সন্ধ্যার সময় জিমন্যাষ্টিক

ক্লাবের ছেলেরা যখন ফিরল বাড়ির দিকে, তখন বেণুদা বললেন, একটু দাঁড়িয়ে যেয়ো রঞ্জন, তোমার সাথে কথা আছে।

ভূতুড়ে জমিদার বাড়ির সেই নির্জনতায়, অন্ধকার হয়ে আসা চাল্‌তে গাছের তলায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন বেণুদা। মনে আছে, বুকের ভেতরে যেন হাতুড়ি পিটছিল, শরীরের প্রতিটি কণাকেও সজাগ আর প্রখর করে রেখেছিল রঞ্জন, একটি কথাও শুনতে ভুল না হয়, একটি শব্দও হারিয়ে না যায় এক পলকের অমনোযোগে।

—আমাদের এই যুগান্তর পার্টি। মানিকতলা বোমার মামলার ইতিহাস পড়েছ তো? সেদিনের সেই বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই তো শেষ হয়ে যায় নি। অরবিন্দ, বারীন্দ্র, উল্লাসকর, ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন, বাঘা যতীনের পার্টি। যে মরতে পারে না, আমরা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছি, যতদিন স্বাধীনতার যুদ্ধ শেষ না হয় ততদিন বাঁচিয়ে রাখবই। এই পার্টির সভ্য হওয়ার গৌরব কি তুমি চাও না?

—নিশ্চয়ই চাই।

—ভয় পাবে না?

—না।

—মনে রেখো, এ শুধু বোমা-রিভলভার নিয়ে মৃত্যুর রোমান্স নয়। এর দুঃখ অনেক, দায় অনেক। চারদিকে শত্রু, বাতাসেরও কান আছে বিশ্বাসঘাতকতা পদে পদে! পুলিশের হাতে পড়লে টর্চারের সীমা থাকবে না, বেত থেকে শুরু করে নাকের ভেতরে পাইপ বসিয়ে পাম্প করা পর্যন্ত কোনো কিছু বাদ দেবে না ওরা। সে নির্যাতন সয়ে থাকতে পারবে, দলের খবর বলে দেবে না?

—না।

—আচ্ছা, পরীক্ষা হবে। ছেলেমানুষ, ছোটখাটো কাজই দেব এখন। আর মনে রেখো, অকারণ কৌতূহল প্রকাশ করবে না, যতটুকু তোমাকে জানতে দেওয়া হবে তার বেশি কখনো জানতে চাইবে না। যে কাজ তোমাকে দেওয়া হবে তার অতিরিক্ত কোনো কিছুতে হাত দিতে চেষ্টা করবে না। আর সবচেয়ে বড় কথা হল ব্রহ্মচর্য—বিপ্লবীদের চরিত্র থাকবে খাঁটি সোনার মতো উজ্জ্বল। চরিত্রহীন আর বিশ্বাসঘাতকের একই বিচার করি আমরা, একই দণ্ড দিই—সে হল মৃত্যু!

মৃত্যু। এক টিপ নস্যি নিয়ে আঙুলের ডগা থেকে গুঁড়োগুলো উদাসীনতায়

সঙ্গে উড়িয়ে দিয়ে কথাটা উচ্চারণ করেছিলেন বেণুদা। কিন্তু যে ক্ষুরধার নেশা তখন রক্তের মধ্যে দপদপ করছে, হৃৎপিণ্ড ফুলে ফুলে উঠছে যে ক্ষ্যাপা উত্তেজনায়, তার কাছে মৃত্যু কথাটার কোনো গুরুত্বই বোধ হয় নি তো। 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন'—এই তো এ পথের সংকল্প বাক্য। ফাঁসির দড়িতে ঝুলে পড়া কিংবা পুলিশের গুলিতে ক্ষত-বিক্ষত মৃত্যুশয্যাশায়ী বীর নলিনী বাগচীর মতো বলতে পারা : "Don't disturb please, let me die peacefully"—এ তো সব চেয়ে বড় প্রলোভন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যুর প্রশ্ন তার কাছে অর্থহীন, চরিত্র সম্পর্কে সাবধান বাণী সম্পূর্ণই অনাবশ্যক।

আসলে ছেলেমানুষ কথাটাই আপত্তিজনক। ছেলেমানুষ বলেই কি শুধু ছোটখাটো কাজের আধিকারী? সামসুল আলমকে মেরেছিল যে বীরেন গুপ্ত সে তার চাইতে কবছরের বড়ই বা? চট্টগ্রামের টেগ্‌রা তো তারই সমবয়সী। তবে হাতে একটা রিভলভার পেলে সেই বা কেন ওদের মতো একটা অক্ষয়কীর্তি রেখে যেতে পারবে না? একটা পাঁচঘরা রিভলভার উজাড় করে শেষ করে দিতে পারবে না টিকটিকিদের সর্দার বিপ্লবীদের চিরশত্রু সেই পেটমোটা আর হুলোমুখো ধনেশ্বর শর্মাকে? অথবা তাদের জিলাস্কুলে যখন কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে শাদা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসে উপস্থিত হন, তখন সেও কি নিতে পারে না জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিশোধ? নিতে পারে না বিদ্রোহী চট্টগ্রাম আর কাঁথি লবণ-আন্দোলনে সত্যাগ্রহী মেদিনীপুরে অকথ্য নির্যাতনের প্রতিহিংসা?

কিশোর রঞ্জন, ছেলেমানুষ রঞ্জন। তার মনের সামনে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দেয় চট্টগ্রামের রক্তাক্ত শহীদের মূর্তি, কানে আসে তাদের মায়েদের উতরোল কান্না। ছবি চোখে আসে পাঞ্জাবের প্রকাশ্য রাজপথে কাঠের ফ্রেমে হাত-পা বেঁধে ছেলেবুড়োকে নির্বিচারে বেত মারা হচ্ছে—যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেলে চোখে মুখে জল দিয়ে সচেতন করে আবার বেত মারবার পালা—ছিঁড়ে ছিঁড়ে উঠে আসছে শরীরের চামড়া; রাস্তা দিয়ে পুরুষমেয়েকে জানোয়ারের মতো হামাগুড়ি দিয়ে হেঁটে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে, আপত্তি করলেই পিঠে পড়েছে কাঁটাওলা বুটের লাথি। মাঘের প্রচণ্ড শীতের রাত্রে মেদিনীপুরের গ্রামশুদ্ধ নিরীহ নরনারীকে তাড়া করে নিয়ে উলঙ্গ অবস্থায় ডুবিয়ে রাখা হচ্ছে পচা পুকুরের জলে, বারো বছরের ছেলেকে বস্তায় পুরে নদীর জলে চুবিয়ে চুবিয়ে হত্যা করা হচ্ছে।

এই শাসন—এরা শাসক! ছেলেমানুষ রঞ্জনের মনে হয়, তার সমস্ত শরীর

যদি বিস্ফোরক দিয়ে তৈরী হত তাহলে একটা বোমার মত ফেটে সে চৌচির হয়ে যেত, উড়িয়ে নিয়ে যেত এদের ঝাড়শুদ্ধ। সে ছেলেমানুষ! তার হাতে যদি একটা রিভলভার থাকে তাহলে সেও প্রমাণ করে দিতে পারে যে সে আর কারোও চাইতেই কোনো অংশে ছোট নয়, হেয়ও নয়!

তাহার বিকারগ্রস্ত চোখের দিকে তাকিয়ে বেণুদা হেসেছিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা দেখা যাবে সব।

—আমাকে আগে রিভলভার ছোঁড়া শিখিয়ে দিতে হবে বেণুদা।

—রিভলভার?—বেণুদা আবার একটিপ নস্যির গুঁড়োগুলো ছড়িয়ে দিলেন হাওয়ায়: সে তো অত সহজ নয় ভাই। বিপ্লবীদল বলেই কি অমন কথায় কথায় রিভলভার জোগাড় করা যায়? অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় একটা রিভলভার সংগ্রহ করতে, ঢের রিস্‌ক নিতে হয়, বিস্তর তার দাম। আচ্ছা, সময় হলে দেখা যাবে সে সব, ও শিখিয়ে দিতে আধঘণ্টা সময়ও লাগবে না। এখুনি তো আর মানুষ মারতে যাচ্ছ না, অন্য কাজ শেখো তার আগে।

অন্য কাজ! হ্যাঁ, দিন তিনেক পরেই কাজ পেয়েছিল রঞ্জন। বেণুদার আদেশ পরিমলই জানিয়ে গেল এসে। আজকের কাজ পারা না পারার ওপরেই সমস্ত পরিচয় নির্ভর করছে রঞ্জনের।

বেণুদা চিঠিখানা দিয়েছেন খামে করে। এই চিঠিখানা নিয়ে রাত সাড়ে বারোটা থেকে একটার মধ্যে সাহানগরের পুরানো সাহেবী কবরখানাটায় যেতে হবে তাকে। ঠিক মাঝখানে যে শাদা কবরটার ওপরে শ্বেত পাথরের বাইবেল খোলা আছে, তারই ওপরে বসে প্রতীক্ষা করতে হবে অন্তত দুঘণ্টা সময়। এর মধ্যে কোনো লোক যদি এসে তার কাছে চিঠি চায় তবে রঞ্জন সে চিঠি তাকে দেবে, আর নইলে বইয়ের ওপরে একটুকরো ইট চাপা দিয়ে রেখে আসবে। ইচ্ছে করলে একটা আলো নিতে পারে সঙ্গে—কিন্তু পারতপক্ষে সে আলো জ্বালাতে পারবে না।

রাত সাড়ে বারোটায় সাহানগরের কবরখানায়! সে কবরখানাকে সে দেখেছিল গোষ্ঠের মেলায় যাওয়ার পথে, এমনিতেই কী ভুতুড়ে, কী থমথমে তার চেহারা! মৃত্যু-বিলাসী বীরের বুকও ছম ছম করে উঠল একবার, গেঞ্জীর তলায় ঘাম ফুটে বেরুতে চাইল শরীরে।

পরিমল মুখ টিপে হাসল, কি-রে পারবি না? ভয় করছে নাকি? তাহলে বরং আমি বেণুদাকে গিয়ে বলি—

পৌরুষ দপ দপ করে জ্বলে উঠল রক্তের মধ্যে: নিশ্চয় পারব।

মৃত্যু ব্যঙ্গভরা গলায় পরিমল বললে, থাক্ না, কাজ কী বাপু! ও কবরখানাটা ভূতের আড্ডা, বহু লোকে ওখানে ভয় পেয়েছে।

—তা পাক, আমি পাবো না!

—বলা ওরকম সোজা কিনা! আমি শুনেছি বছর তিনেক আগে একটা চৌকিদার যাচ্ছিল ওরই পাশের রাস্তা দিয়ে। হঠাৎ দেখল মেটে মেটে জ্যোৎস্নায় ওই কবরখানায় দাঁড়িয়ে উঠল তালগাছের সমান উঁচু একটা সাহেবের মূর্তি! আরে কি ভয়ানক, তার কাঁধের ওপরে মাথাই নেই! তারপর একটা লম্বা হাত সে বাড়িয়ে দিলে, সে হাতে একটা কালো টুপি আর সেই টুপির মধ্যে তার মুণ্ডুটা বসানো—

অনর্থক কতগুলো আবোলতাবোল গল্প বলে ভয় ধরিয়ে দিতে চাইলে পরিমল। বুকের ভেতরে একবার ছ্যাঁৎ করে উঠলেও ভয়ের একটুকুও ফুটতে দিলে না রঞ্জন। জোর গলায় বললে, টুপিতে মাথা থাক বা না থাক তাতে আমার বয়েই গেল।

—কিন্তু তোর মাথাটা যেন থাকে—ভেবে দেখিস্ ভালো করে—

চলে গেল। যাওয়ার সময় নাক কুঁচ্‌কে এমন বিশ্রী করে হাসল যে অপমানে পিত্ত পর্যন্ত তেতে উঠল রঞ্জনের। যেন ওর মুখ দেখেই পরিমল বুঝে নিয়েছে এ কাজ ওকে দিয়ে সম্ভব নয়?

না, ভূত মানবে না সে, ভয় করবে না। কিসের ভূত, কোথায় ভূত? ওসব কতগুলো আজগুবী গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। দৃষ্টির বিভ্রম থেকেই এই সব এলোপাথাড়ি গল্প মানুষ ছড়িয়ে বেড়ায় চারদিকে! আর যদি সত্যি সত্যিই ভূত বলে কিছু থাকে, তাহলে সাহসী মানুষকে সে চিরকাল সেলাম ঠুকেই এড়িয়ে চলে। আরে, ভূতেরও তো প্রাণের ভয় বলে জিনিস আছে একটা! নিজের রসিকতা দিয়ে নিজেকেই আশ্বস্ত করতে প্রয়াস পেলো সে।

তারপর সেই রাত্রি। তার কথা ভোলবার নয় জীবনে।

বাইরের পড়ার ঘর থেকে বেরুতে রাত্রে অবশ্য অসুবিধে হল না। সে আর দাদা—দুজনে এঘরে শোয়। দিন তিনেক আগে কী একটা কাজে দাদা কলকাতায় গেছে, কাজেই পালাতে কোনো বিঘ্ন নেই। আরো বাইরের ঘর—ভেতরের দরজায় খিল দিয়ে রাখলে বাড়ির কাকপক্ষিতেও টের পাবে না কাণ্ডটা।

আস্তে আস্তে বাড়ির ভেতরকার সাড়া-শব্দ থেমে এল, শব্দ এল ঘরে ঘরে হুড়কো পড়ার। মা একবার ডাক দিয়ে গেলেন: খাওয়ার জল লাগবে রঞ্জু?

—না মা।

ঘরে টিম টিম করে লণ্ঠন জ্বলছে, তার উত্তেজিত মনের অনিশ্চয়তার মতো। রঞ্জন তার সজাগ প্রখর দৃষ্টি মেলে রেখেছে টেবিলের ওপরকার টাইমপিস্‌টার দিকে। টিক্ টিক্ টিক্। ঘড়ি চলছে, সময় লাফিয়ে যাচ্ছে যেন ক্যাঙারুর মতো! সাড়ে এগারোটা ছাড়িয়ে ছোট্ট কাঁটাটা ঝুঁকেছে পৌনে বারোটার দিকে, বড় কাঁটাটা যেন ছিটকে ছিটকে এগিয়ে যাচ্ছে সম্মুখের দিকে।

ঘড়িটার শব্দটা মিশছে হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে—তাড়া খাওয়া কাঙারুর মতো লাফিয়ে চলছে সময়!

—টিক্ টিক্ টিক্—টিক্ টিক্ টিক্—

বারোটা বাজতে দশ মিনিট।

বালিশের নিচে হাত দিলে রঞ্জন। চ্যাপ্টা ফ্ল্যাশ লাইটটা ঠিক আছে সেখানে, ইস্কুলের টিফিনের পয়সা জমিয়ে সখ করে কিনেছিল সেটা। আজ ব্যাটারী বদলেছে, একটা নতুন বাল্‌ব সেই সঙ্গে। এই কঠোর দুর্গম অভিযানে এইটেই তার পথের সাথী—তার নির্ভরযোগ্য একমাত্র সহচর।

—টিক্ টিক্ টিক্—

নেমে পড়ল বিছানা থেকে। ভয়ের থেকে উত্তেজনা এখন বেশি হয়ে উঠেছে, রক্তের মধ্যে মাতলামো শুরু করেছে অ্যাডভেঞ্চারের অন্ধ কামনা। সন্ধ্যের সময়েই বড় ঘরের আল্‌না থেকে এক ফাঁকে নিজের জামাটা হাতসাফাই করে এনেছে, তার পকেটে হাত দিয়ে দেখল চিঠিটা ঠিক আছে সেখানে। তারপর অতি নিঃশব্দে সে জামাটা সে গায়ে পরে নিলে, ফ্ল্যাশ লাইট নিলে হাতে; আরো সাবধানে লণ্ঠনটাকে একেবারে কমিয়ে দিয়ে বেড়ালের মতো মখমলমসৃণ পায়ে চলে এল বাইরে।

থমথমে অদ্ভুত রাত। একটা ডাইনি যেন অন্ধকারের চুল মেলে বসে আছে উবু হয়ে। একটু দূরেই যে কেরোসিনের আলোটা ছিল, সেটা কখন নিবে গেছে। মিউনিসিপ্যালিটির ধুলোভরা পথ অন্ধকারে লুটিয়ে আছে মূর্ছিতের মতো। জলজলে তারায় ভরা কালো আকাশ—চাঁদ নেই। সন্ধ্যার সময় একটা ফালি উঠেছিল, কখন যেন ডুব দিয়েছে পশ্চিমের গাছগাছালির আড়ালে।

নির্জন রাস্তা, যেন নিদ্রালি মন্ত্র পড়ে দিয়েছে ডাইনিটা। নিজের জুতোর শব্দেও বুক ছাঁৎ ছাঁৎ করে উঠছে। পথের ধারে গাছগুলোর ভুতুড়ে ছায়া বাতাসে দুলছে। তার পায়ের আওয়াজ খ্যাচ্‌খেঁচে ঝগড়াটে আওয়াজ তুলে টেলিগ্রাফের তার থেকে প্যাঁচা উড়ে গেল একটা। পথের এদিক থেকে ওদিক ছুটে চলে গেল শেয়াল। একবার থেমে দাঁড়িয়ে যেন জিজ্ঞাসাভরা দৃষ্টিতে

তাকালো রঞ্জনের দিকে, অন্ধকারে কী ভয়ঙ্কর একটা নীলচে আলোয় চোখদুটো জ্বলছে তার, কত বড় বড় যে দেখাচ্ছে।

শহরের এদিকটা ফাঁকা ফাঁকা। এলোমেলো ছড়ানো শাদা শাদা কোঠা বাড়িগুলো, টিনের চালা—অন্ধকারের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে আছে সমস্ত, কোথাও একটা আলো জ্বলছে না পর্যন্ত। শুধু এখানে ওখানে ঝলমলে জোনাকির রাশ। তারই মাঝখান দিয়ে নেশাগ্রস্তের মতো হেঁটে চলল রঞ্জন; কোথা থেকে শুধু একটা কুকুর তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠে যেন তাকে সতর্ক করে দিলে।

কিন্তু আজ পৃথিবীকে ভয় হচ্ছে না, প্রকৃতিকেও না। আজ ভয় মানুষকেই। কোটপরা সাইকেলে চড়া সেই লোকটাকে। ওরাও নিশাচর, ওরাও রাত্রির আড়ালে শেয়ালের মতো শিকার খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু শেয়ালের চোখের চাইতে ওদের দৃষ্টি আরো তীক্ষ্ণ, ওদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় আরো স্পর্শসজাগ। পাথর-চাপা দেশের বুকের আড়ালে কোথাও একটুখানি আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলে উঠেছে, কোথায় একটি প্রাণের ভেতর জেগেছে প্রতিবাদ, দিনরাত তাই তাদের একমাত্র সন্ধান। সেই আগুনকে নিবিয়ে দেবে, সেই প্রাণটিকে রোধ করে দেবে ফাঁসির দড়িতে। তার বিনিময়ে পাবে কিছু কালো রঙের টাকা, আর রক্তমাখানো কয়েক টুকরো রুটি! যীশুহন্তা জুডাসের স্বর্ণমুদ্রা!

খোয়া-ওঠা পথ শেষ হয়ে গেছে—দৃষ্টির আড়ালে সরে গেছে মিউনিসি-প্যালিটির শেষ ল্যাম্প-পোস্টটাও। এবার শুধু ধুলো-ভরা রাস্তা, দুপাশে ঘন জঙ্গলের মতো বাগান। বাতাসে কট্ কট্ শর্ শর্ করে একটা অস্বস্তি-জাগানো শব্দ উঠছে বাঁশবনে। রাত্রির অন্ধকারে বাঁশবনগুলোকে কেমন খারাপ লাগে। ছেলেবেলায় শোনা গল্প মনে পড়ে। রাস্তার ওপর লম্বা হয়ে এলিয়ে আছে মস্ত একটা বাঁশ, অসতর্ক পথিক যেই সেটা ডিঙোবার উদ্যোগ করে, অমনি ভুতুড়ে বাঁশটা তীব্র বেগে উঠে পড়ে ওপর দিকে, মানুষটাকে ধনুক থেকে ছুটে বেরুনো একটা তীরের মতো ছুঁড়ে দেয় আকাশে, তারপর—

দুত্তোর—ভয় পাচ্ছে নাকি সে? বিপ্লবী রঞ্জন—'ঝড় বাদলে আঁধার রাতে' একলা চলার পথিক রঞ্জন। পরিমলের সেই উদ্ভট গল্পগুলোর রেশ কি এখনো ছড়িয়ে আছে মনের মধ্যে? জোরে, আরো জোরে হাঁটো। 'Cowards die many a times'—

শোঁ—শোঁ—শোঁ—

শরীর-কাঁপানো কন্‌কনে বাতাস এল একটা। কোনো মড়ার শীতল দেশ থেকে ফুসফুসভরা মৃত্যুহিম বাতাস এনে যেন তীব্র নিশ্বাসে ছড়িয়ে দিলে

ডাইনিটা। পথটা হঠাৎ শেষ হয়ে গিয়ে একটা বিস্তীর্ণ বালির ডাঙায় নেমে পড়েছে। তারার আলোয় ঝিকঝিক করছে বালি, চিকমিক করছে অভ্রের কুঁচি। ঘন বঁইচির বনে জোনাকির রোশনাই। জলের একটা জলন্ত সর্পিলতা উঠছে ঝিলিক দিয়ে। কাঞ্চন।

কাঞ্চন! এর জলে কালী বাস করেন। নরবলির তৃষ্ণা এখনো মেটেনি তাঁর। ফাঁপা একটা লোহার চোঙ গুম গুম করে বসে যাচ্ছে জলের অতল গভীরতায়—শেষবারের মতো ভেসে এল কতগুলো মানুষের বিশৃঙ্খল আর্তি। গায়ের হাড়গুলোতে হঠাৎ ঝমর ঝমব করে ঝাঁকানি বাজল রঞ্জনের।

না—এত দুর্বলতা। 'আমরা করব না ভয়, করব না—' জিমন্যাস্টিক ক্লাবের ছেলেদের মার্চিং সং মনে পড়ল। আরো জোর-পায়ে হাঁটতে হবে। বিপ্লবীকে ভয় পেলে চলবে না।

এত অন্ধকার, তবু আশ্চর্যভাবে স্বচ্ছ হয়ে গেছে চোখের দৃষ্টি। বেশ চেনা যায় পথ, অনেকটা অবধি চোখ চলে। দূরে পাহাড়ের মতো কী যেন স্তব্ধ হয়ে আছে, জমা হয়ে আছে যেন পুঞ্জিত খানিকটা অমাবস্যা। বুঝতে বাকী রইল না। সাহানগর কবরখানার উঁচু প্রাচীর।

আর একবার কলরব জেগে উঠল হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। আর একবার শুরু হয়ে গেল রক্তের চঞ্চলতা। দিনের বেলাতেও গা ছমছম করে ওঠে ওখানে। পরিমলের সেই বিশ্রী গল্পটা। ছেলেবেলায় তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে-ছিলেন অবিনাশবাবু—

স্থির দাঁড়িয়ে গেল রঞ্জন। অবিনাশবাবু! কিন্তু আজ তো সেই মানুষটিকে চিনেছে সে! আজ তো বুঝেছে তাঁর কথার অর্থ। সেদিন তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তা তো এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে সম্পূর্ণভাবে। না—ভয় নেই। আজ যদি তার পথের সঙ্গী কেউ থাকে তবে অবিনাশবাবুই আছেন।

আরো জোর পা—আরো জোরে চলো। ভয়ের শেষ সীমাটা পৌঁছেছে বলেই আর ভয় নেই তার। এগিয়ে চলল রঞ্জন।

যেন ঘুমন্তের মতোই চলেছিল এতক্ষণ! চলেছিল একটা নেশার মধ্যে। যখন থামল তখন একেবারে সেই ভয়ঙ্কর কবরখানার ভাঙা গেটটার সামনে এসে সে দাঁড়িয়েছে।

চারদিকে নানা আকারের ভাঙা সমাধি। কতদিনের কত মৃত্যু এখানে নিস্তব্ধ হয়ে আছে কে জানে। কাদের নিঃশ্বাস যেন গায়ে লাগে। প্রতিটি কবরের মধ্য থেকে যেন এখনি উঠে আসবে কারা।

ওখানে ওগুলো কী জ্বলছে? জোনাকি না কতগুলো চোখ?

—'আমরা করব না ভয়, করব না'—

জপ করতে লাগল রঞ্জন। কিন্তু শ্বেতপাথরের সে কবরটা কোথায়? আর কোথায় সেটা—যেখানে পিটার হপ্‌কিন্স্‌ যীশুর শান্তিময় ক্রোড় লাভ করেছিলেন? এই ভয়ঙ্কর রাত্রে সেখানে কি আশ্রয় পেতে পারে না সেও?

হাতের ফ্ল্যাশ-লাইটটা জ্বালাতে গিয়ে হাত কেঁপে উঠল। মাথার চুল-গুলো খাড়া হয়ে গেল চকিতের মধ্যে।

একটা সাদা কবরের ওপর থেকে সাদা একটা মূর্তি আস্তে আস্তে উঠে আসছে। হ্যাঁ, কোনো ভুল নেই। আর—আর—তার হাত দুটো সামনের দিকে—রঞ্জুর দিকেই প্রসারিত!

কী বলে চীৎকার করে উঠেছিল, কী ভাবে টলে পড়ে যাচ্ছিল সে, মনেও পড়ে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কে তাকে পেছন থেকে বলিষ্ঠ বাহুর আশ্রয় দিলে।

—ভূত?

না, বেণুদা।

পাঁচ সাত মিনিট পরে যখন প্রকৃতিস্থ হল সে, তখন লজ্জায় আর অপমানে সে যেন মিশে গেছে মাটির সঙ্গে। বিপ্লবী রঞ্জনের চোখ দিয়েও জল নেমে এসেছে।

—বেণুদা, আমি কাপুরুষ।

বেণুদা হাসলেন, তাই নাকি?

—আমি ভীরু, ভয় পেয়েছিলাম। আমাকে দল থেকে তাড়িয়ে দিন।

অন্ধকারকে উচ্চকিত করে দিয়ে বেণুদা হেসে উঠলেন: দূর পাগলা।

—আমার লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করছে বেণুদা।

বেণুদা সস্নেহে রঞ্জনের ঘাড়ে হাত রাখলেন: ভয় পাওয়াটা লজ্জার নয় ভাই, মানুষমাত্রেই ভয় পায়। যে বলে আমি কখনো ভয় পাইনি, সে মিথ্যেবাদী।

—কিন্তু—

ততক্ষণে ফিরে চলেছে দুজনে। বেণুদা বললেন, তোমার ভয় আছে কিনা এ আমি পরীক্ষা করতে চাইনি, কতটা সাহস আছে তাই পরখ করতে চেয়েছিলাম। পরীক্ষায় উতরে গেছ তুমি। লজ্জার কিছু নেই, তোমার মতো বয়েসে এতটা পথ আমিই এভাবে আসতাম না।

কথাটার ভেতরে সান্ত্বনা আছে, আশ্বাসও। তবুও কোথায় খোঁচা লাগে যেন। সে ছেলেমানুষ, আর তারই একটা নির্দিষ্ট সীমা মেনে নিয়ে বেণুদা

বিচার করেন তাঁকে। তাই তার এতটুকু ভয়ের জন্তে তিনি ক্ষমা করতে পেরেছেন রঞ্জনকে। কিন্তু তিনি নিজে যে এভাবে একা চলে এসেছেন, কই, তাঁর তো ভয় করেনি। ছেলেমানুষি কবে কেটে যাবে তার, কবে সে পাবে টেগ্‌রার মতো বীরের মর্যাদা? কবে সে টেগার্টের মতো শত্রুর ওপরে গুলি ছুঁড়ে অমর মৃত্যুর গৌরব লাভ করতে পারবে?

অনেকটা পা নিঃশব্দে এগিয়ে এল দুজনে। হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল: বেণুদা?

—অ্যাঁ?

—চট্টগ্রামের মতো কি আমরাও পারি না?

—পারি বইকি।—বেণুদা সস্নেহে বললেন, কিন্তু তার জন্তে তো তৈরী হওয়া চাই। অকারণে কতগুলো প্রাণ দিয়ে তো কোনো লাভ নেই ভাই। দেশের জন্তে মরতে পারা নিশ্চয় গৌরব, কিন্তু মরাটাই তো আমাদের আসল লক্ষ্য নয়। ভালো করে আমরা বাঁচতে চাই বলেই তো বেছে নিয়েছি এই রক্তের পথ।

আবার চুপ করে গেল রঞ্জন। বেণুদাকে ঠিক ধরতে পারে না, মাঝে মাঝে কেমন উল্‌টোপাল্‌টা মনে হয় তাঁর কথাগুলো।

হঠাৎ বেণুদা বললেন, গান জানো রঞ্জু?

—গান!—আশ্চর্য লাগল রঞ্জনের। ঠিক এমনি একটা অবস্থায় গান জানা না জানার প্রশ্নটা যেন অশোভন আর খাপছাড়া বলে মনে হল তার।

বেণুদা আবার বললেন, হাঁ গান। রাত্রির অন্ধকারে এমনি পথ চলার সময় গানের চেয়ে বড় পাথেয় আর কী আছে? একেবারেই গাইতে পারো না তুমি?

তেমনি বিহ্বল বিস্মিতভাবে রঞ্জন বললে, না।

—আচ্ছা, তবে আমিই গাই। আমার গলা ভাল নয়, তাই বলে সমালোচনা কোরো না কিন্তু।—চাপা কণ্ঠে বেণুদা গান ধরলেন:

সকল কলুষতামসহর
জয় হোক তব জয়,
অমৃতবারি সিঞ্চন কর
নিখিল ভুবনময়—

এবার তার বিস্ময় আর সীমা মানল না। অন্ধকার পথ। কাঞ্চন নদীর দিক থেকে শোঁ শোঁ করে আসছে বাতাসের ঝলক। পথের দুধারে গাছের ঘন ছায়ায় রাত্রি আছে সঞ্চিত হয়ে। নিষিদ্ধ পথচারণার একটা রোমাঞ্চ-

জাগানো অপূর্ব উন্মাদনা দুলে দুলে ফিরছে রক্তের মধ্যে—এমন সময় একি গান, এ কেমন গান?

আবেগ-আকুল কণ্ঠে বেণুদা গেয়ে চললেন :

করুণাময় মাগি শরণ
দুর্গতিভয় করহ হরণ
দাও দুঃখ বন্ধ-তরণ
মুক্তির পরিচয়—

একটা আশ্চর্য গভীরতা এই গানে, একটা নিবিড় আর গভীর মাদকতা। যেন অভিভূত হয়ে এল রঞ্জনের চেতনা। অন্ধকারে বেণুদাকে ভালো করে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে না তাঁর কালো পাথরে গড়া পেশল দীর্ঘ শরীরকে, সংকল্পে আগ্নেয় চোখের দৃষ্টিকেও। একি সেই মানুষ, যিনি তরুণ-সমিতির বাছা বাছা ছেলেগুলোকে গড়ে তুলেছেন অসঙ্কোচে মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে, দুর্গম সংকটে-ভরা রক্তাক্ত পথে এগিয়ে চলবার জন্যে?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল অবিনাশবাবুকে। এমনি বিভোর হয়ে গান গাইতেন—ঝাপ্‌সা ছবির মতো মনে আসে এমনি করে গভীর আর নিবিড় হয়ে আসত তাঁর গলা। তাঁর মুখেই তো শুনেছিল, 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে'। সে গানের সঙ্গে কী অদ্ভুত মিল আছে এই গানের। শুধু এইটুকুই নয়, আরো মিল আছে। সেই অবিনাশবাবুই যখন স্বেচ্ছায় মরণের দিকে এগিয়ে গেলেন তখন কোনো ভয়, কোনো সংকট তো তাঁকে ফেরাতে পারেনি।

যেন চমকে গেল রঞ্জন। কার পাশে পাশে, কার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলেছে? অবিনাশবাবুর পুনর্জন্ম হয়েছে কি বেণুদার মধ্যে, স্বরাজের নতুন পথ খুঁজে পেয়েছেন তিনি?

—কী ভাবছ?

ঘোরটা কেটে গেল। লজ্জিতভাবে জবাব দিলে, কিছু না।

—গানটা ভালো লাগল না তো?

—চমৎকার।

বেণুদার কী যেন হয়েছে আজ। অত গভীর, অমন কঠিন মানুষটার মধ্যে এসেছে একটা ছেলেমানুষি খুশির জোয়ার। বললেন, তুমি কম্‌প্লিমেণ্ট দিলেই কি আমি বিশ্বাস করব? নিজের ভীমসেনী গলা নিজেই চিনি আমি।

—না, সত্যিই চমৎকার।

—যাক, অন্তত একজন গুণগ্রাহী পাওয়া গেল—বেণুদা তরল গলায় বললেন : বাড়িতে তো গান গাইবার উপায় নেই। আমি সুরু করলেই করুণা তেড়ে আসে। তবু সুযোগ পেয়ে তোমাকে একটা শুনিয়ে দেওয়া গেল।

—করুণাদি বুঝি ভালো গাইতে পারেন?—রঞ্জন উৎসাহী হয়ে উঠল।

—আমার চাইতে ভালো নিশ্চয়ই। ও আমার শত্রু হলেও সেটা অস্বীকার করা যায় না—বেণুদা হাসলেন, হাসিতে যোগ দিলে রঞ্জন।

—মিউ মিউ—

রাস্তার পাশ থেকে ভীরু কান্নার মতো আওয়াজ ভেসে এল একটা। বেণুদা থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

—মিউ মিউ—

রঞ্জন বললে, ও কিছু না, বেড়াল ছানা।

বেণুদা বললেন, দাও তো তোমার টর্চটা।

টর্চ জ্বালতেই চোখে পড়ল পথের ধারে শুকনো একটি কাঁচা ড্রেনের মাঝখানে ছাইরঙের একটি বেড়ালের বাচ্ছা। একেবারেই শিশু, এখনো মায়ের দুধ ছেড়েছে কিনা বলা শক্ত। টর্চের আলোয় কেমন অভিভূত হয়ে গেছে, তাকিয়ে আছে কেমন করুণ অসহায় দৃষ্টিতে। ক্ষীণভাবে আবার কান্নাভরা গলায় যেন বললে, মিউ! চারিদিকের এই অন্ধকার, এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে বুঝেছে নিজের নিরুপায় অবস্থা, ক্ষিদেয় আকুল হয়ে হয়তো বা নিষ্ফল কান্নায় খুঁজে ফিরছে নিজের হারানো মাকেই। যে মার বুকের ভেতর ওর আশ্রয় আছে, আশ্বাসও আছে।

বেণুদা ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়ালেন বাচ্চাটার দিকে। পালাতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। বেণুদা ধরে তাকে একেবারে নিজের বুকের কাছে তুলে আনলেন।

—আহা, একেবারে কচি বাচ্ছা! শেয়ালে কেন যে এতক্ষণ খায়নি তাই আশ্চর্য!

রঞ্জন বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে প্রশ্ন করল, আপনি কী করবেন ওটা দিয়ে?

—বাড়িতে নিয়ে যাব।—যে গলা সে কখনো শোনেনি, সেই গলা : অন্তত বাঁচাবার চেষ্টা করব। কিন্তু এখন আর নয় ভাই। শহরের কাছাকাছি এসে পড়েছি, এক রাস্তা দিয়ে দুজনে পাড়ায় ঢোকাটা ঠিক হবে না। আমি এই বাগানটা দিয়ে যাচ্ছি, তুমি সোজা চলে যাও।

পরক্ষণেই সে দেখল—বাগানের কালো ছায়ার মধ্যে আরো কালো একটা

ছায়ার মতোই বেণুদা মিলিয়ে গেলেন।

কিন্তু—

ছ মাস পরে আজ টেবিলে বসে রঞ্জন ভাবছে—পাথরে গড়া বোধ হয় বেণুদার মন। স্নেহ নেই, প্রীতি নেই, দুর্বলতাও নেই এক বিন্দু। চোখের দিকে একবার তাকালেই আর বলে দিতে হয়না যে সামান্য অপরাধেও এর কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়া যাবে না। বেণুদাকে সম্পূর্ণ করে জানবার আগে যে প্রীতি জেগেছিল তাঁর সম্পর্কে, জেগেছিল কিছুটা মোহ, এখন সেগুলো সব কেটে গিয়ে যেন বৈশাখী সূর্যের খানিকটা ধারালো আলো এসে পড়েছে চোখে। এখন ভয় করে বেণুদাকে। মনে হয় একটা অদ্ভুত আর অসহ্য অস্থিরতা জেগেছে তাঁর মধ্যে। দুর্নিবার খানিকটা শক্তির উচ্ছ্বাস আর বাগ মানতে চাইছে না তাঁর বুকের ভেতরে, যেন অন্ধ আবেগে ঘুষি মারতে চাইছে একটা পাথরের দেওয়ালে। হয় সেটাকে ভাঙবে, নইলে এই আপ্রাণ প্রয়াসে রক্তাক্ত করে দেবে নিজের হাতের মুঠোটাকেই। চট্টগ্রামের রক্ত ডাক পাঠাচ্ছে, উনিশ শো তিরিশ সালের অহিংস সত্যাগ্রহ পরাজয়ের একটা কুৎসিত অপচ্ছায়া—এই ছায়াটাকে দূর না করা পর্যন্ত শান্তি নেই, বিশ্রামও নেই।

গোষ্ঠের মেলায় একখানা সাবান চুরির অপরাধ একদিন সমস্ত বোধকে রেখেছিল বিষাক্ত করে। অথচ আজ—এই তো মাত্র সাতদিন আগেকার কথা। মনে পড়লে এখনো বুক ধ্বক করে ওঠে। দৈবাৎ রক্ষা পাওয়া গেছে, আর একটু হলেই কেলেঙ্কারী হয়ে যেত।

বিকেলবেলা কাজীপাড়ার পথ দিয়ে আসবার সময় বিধুবাবু ডাকলেন। বললেন—কিরে, পথ দিয়ে যাস অথচ বাড়িতে একবার পা দিতে নেই তোদের ?

কেমন দূর-সম্পর্কের আত্মীয় হন বিধুবাবু। তিরিশ বছর ধরে মোক্তারী করেছেন এই শহরে, পশারও যে করেছেন তার প্রমাণ মেলে পরিপুষ্ট ভুঁড়ি আর তৈলাক্ত গোলালো মুখে। নতুন কোঠাবাড়ি একখানা তুলেছেন সংপ্রতি—বেশ সুখেই আছেন। কিন্তু পারিবারিক যোগাযোগটা ওঁদের সঙ্গে ক্ষীণ— বাবা মনের দিক থেকে বিধুবাবুকে পছন্দ করেন না।

রঞ্জনও না। কেমন হা হা করে হাসেন বিধুবাবু, কেমন বিশ্রী করে চেঁচিয়ে কথা বলেন। সাহেব আর আদালত ছাড়া কোনো আলোচনা করতে চান না, করতে পারেনও না। তা ছাড়া মোটা নাকের ভেতর দিয়ে সব

সময়ে নস্যির লালচে লালচে রস গড়ায়, সেদিকে তাকালে কেমন গা বমি বমি করতে থাকে তার।

তবু বিধুবাবু ডাকলেন এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও রঞ্জনকে তাঁর বাড়িতে পা দিতে হল।

বিধুবাবু বললেন, আসতে হয়, খবরটাও নিতে হয়। পথ দিয়ে প্রায়ই তো যাস দেখি। আমরা বেঁচে আছি না মরে গেছি সেটাও তো জানা দরকার।

অভিমানভরে কথাটা বলে কোঁচার খুঁটে নস্যির রস মুছে ফেললেন বিধুবাবু, গা ঘিন ঘিন করে উঠল রঞ্জনের।

—আয় আয়, ভেতরে আয়—

ভেতরে ঢুকতেই কানে এল ভয়ঙ্কর একটা শব্দ—যেন আছাড় দিয়ে দিয়ে কাঁসার বাসন ভাঙছে কেউ। কিন্তু না—বাসন ভাঙছে না। চীৎকার করছেন বিধুবাবুর স্ত্রী—ওর মাসিমা।

বিধুবাবুর স্ফীতি দেখে যদি তাঁর পশার অনুমান করা চলে, তবে তাঁর স্ত্রীর চেহারা ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের বহরটারই ইঙ্গিত করে বোধ হয়। ভদ্রমহিলা মুটিয়েছেন একটা গজহস্তীর মতো, দরজা দিয়ে অনেক কষ্ট করে বোধ হয় ঘরে ঢুকতে হয় তাঁকে। গলার আওয়াজে হৃৎকম্প হয়।

সম্প্রতি আছেন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে। তাঁর নতুন কোঠাবাড়ির দেওয়াল থেকে খানিকটা চূণ বালি খসে পড়েছে, কী করে ভেঙে ফেলেছে চাকর। মাসিমা হিন্দী করে বলছেন, তোমরা তন্‌খা কাট্‌কে চূণ ঔর বালিকা দাম হামি আদায় করেঙ্গা—

গলার স্বর নামল রঞ্জনকে দেখে। খাটো কাপড়ের আঁচলটা টেনে মাথায় একটা ঘোমটা দেবার বৃথা চেষ্টা করলেন, তারপর সস্নেহে বললেন, এতদিন পরে বুঝি মাসিমাকে মনে পড়ল? আয় আয়—বোস্‌—

'বোস্‌' তো বটে, কিন্তু বসবার জায়গা কই? খাটখানার প্রায় সবটা জুড়েই যে তিনি বসে আছেন। ইতস্তত করে পাশে একটুখানি জায়গা করে নিলে রঞ্জন।

বাইরে মক্কেল বসেছিল, রঞ্জনকে ঘর-জোড়া স্ত্রীর কাছে জিম্মা করে দিয়ে বিধুবাবু তাদের শিকার করতে গেছেন। সুতরাং আপাতত চাকরকে রেহাই দিয়ে মাসিমা রঞ্জনের দিকে মনোনিবেশ করলেন।

—বাড়ির সবাই কেমন?

রঞ্জন সংক্ষেপে জবাব দিলে, ভালো।

—সরোজের শরীর কেমন আজকাল ?

—মা ? ভালোই আছেন।

মাসিমা গজর গজর করতে লাগলেন : একদিনতো আসতেও পারে বেড়াতে। আমি না হয় গতর নিয়ে নড়তেই পারি না, তাই বলে কি আত্মীয়-কুটুমকে অমন করে ভুলে থাকে। বলিস সরোজকে, একদিন যেন আসে।

—আচ্ছা বলব।

—আর তা ছাড়া—মাসিমা আবার আরম্ভ করলেন এবং ফিরে এলেন নিজের স্বধর্মে : এই তো নতুন বাড়ি করলাম। কর্‌করে পাঁচটি হাজার টাকা বেরিয়ে গেল—বুকের রক্ত জল করা টাকা। অথচ একটু কি দয়া মায়া আছে হতচ্ছাড়া চাকর-বাকরগুলোর ? এর মধ্যেই সিমেণ্টের চটা উঠিয়েছে, চূণ-বালি খসিয়েছে, পানের পিক ফেলেছে পাঁচিলে ; দেওয়ালে লাগিয়েছে মাথার তেলের দাগ। আমার কি আর মরণ আছে, সব সময় চোখে রাখতে হয়।

—হুঁ।

মাসিমা বললেন, ওই—আবার ওই পোড়ারমুখো কয়লা ভাঙতে গিয়ে দিলে বুঝি উঠোনটা শেষ করে। তুই একটু বোস বাবা, আসছি আমি। সুস্থির হয়ে কথাবার্তা বলব তোর সঙ্গে।

এরাও বড়লোক বটে। তবু কোথায় একটা কুশ্রী কাঙালীপনা আছে এদের, টাকা যেন আরো প্রকটকরে তুলেছে সেটাকে। এই জন্যেই কি বাবা এদের দেখতে পারেন না ?

কিন্তু চিন্তাটা হঠাৎ চমকে গেল। শুধু দুটো চোখই নয়, সমস্ত মনটাও যেন আকুল লুব্ধতায় গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল ঘরের কোণে বড় আলমারীর নিচেকার খোলা বড় টানাটার ওপরে।

টানার মধ্যে খোলা অবস্থায় পড়ে আছে একটা দোনলা বন্দুক—পালিশ করা নলটা ঝকঝক করছে তার। খোলা বন্দুকটার চারপাশে ছড়ানো আছে 'ইলি' আর 'ম্যাণ্টনের' একরাশ কার্তুজ।

রক্তাক্ত উত্তেজিত মুখে চারদিকে তাকালো রঞ্জন। ঘরে কেউ নেই। দূরে উঠোনে রঞ্জনের দিকে পিঠ দিয়ে প্রকাণ্ড একটা কাপড়ের দেওয়ালের মতো দাঁড়িয়ে মাসিমা—হাত নেড়ে বাসন-ফাটানো গলায় বক্তৃতা দিচ্ছেন চাকরকে। বাইরের ঘর থেকে চ্যাঁচানো গলাও ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাচ্ছে বিধুবাবুর : দেওয়ানী মামলায় একটা ছেড়ে অমন দশটা তারিখ নিতেই হয়। আরে, সাক্ষীসাবুদকে তৈরী করতে হলেও—

মনের সামনে ভয়ঙ্কর একখানা মুখ দেখা দিল যেন বায়স্কোপের ছবির মতো। চোখে আগুন, চাপা ঠোঁটে বিপ্লবী চট্টগ্রামের রক্তাক্ত প্রতিশ্রুতি।

—অস্ত্র চাই আমাদের, প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র চাই। বন্দুক, রিভলভার, কার্ট্রিজ। প্রত্যেকটি বিপ্লবীর হাতে অস্ত্র তুলে দিতে না পারলে দুটো একটা চোরা-গোপ্তা খুন করে লাভ নেই কোনো। সারা ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামে যদি আমরা চট্টগ্রাম গড়ে তুলতে পারি তা হলে দু ঘণ্টায় ইংরেজ পালাতে পথ পাবে না। দরকার শুধু অস্ত্র, যেমন করে হোক সে অস্ত্র আমাদের জোগাড় করতেই হবে।

হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে। নিজের রক্ত ফুটেছে, তার শব্দও যেন শুনতে পাচ্ছে সে। অতি সন্তর্পণে দেরাজের দিকে এগিয়ে গেল সে, দু-হাতে মুঠো করে দশ বারোটা টোটা তুলে নিয়ে জামার দু পকেটে ফেলল। তারপর তেমনি নিঃশব্দে নিজের জায়গায় এসে বসল। মাথার ভেতর রক্ত গরম হয়ে উঠেছে, অথচ মনে হচ্ছে একটা আশ্চর্য ঠাণ্ডায় হাত পা যেন এলিয়ে আসছে তার।

মাসিমা ফিরে এলেন। এখুনি হয়তো দেরাজের দিকে নজর পড়বে তার, এখুনি হয়তো বলে বসবেন টোটাগুলো কেমন কম কম বলে বোধ হচ্ছে না? তারপর তার পকেটের দিকে তাকিয়ে যদি—

এর পরে মাসিমা কী বলেছিলেন এবং কী জবাব দিয়েছিল, ভালো করে সে কথা মনেও নেই তার। প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কটা ঠেলে ঠেলে উঠছে, যেন একটা শক্ত থাবার মতো তার গলাটাকে টিপে টিপে ধরবার চেষ্টা করছে—কথা কইতেও কষ্ট বোধ হচ্ছে তার।

হঠাৎ এক সময় সে নিতান্তই আচমকা উঠে দাঁড়ালো: আচ্ছা, আজ যাই—

—একটু চা খেয়ে যাবি না? জল চাপাতে বললাম যে।

—চা তো আমি খাই না।

—ওঃ, খাস্ না?—মাসিমা যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। যেন এক পেয়ালা চায়ের বাজে খরচের হাত থেকে বেঁচে গেলেন তিনি, চুন বালির নতুনঃ আস্তর বসানোর খানিকটা খরচ উঠে আসবে এর থেকে। বললেন, তা বেশ, ছেলেবেলায় ও সব বদ্অভ্যেস না থাকাটাই ভালো।

—আমি চলি তা হলে—

—আচ্ছা আয় তবে। সরোজকে আসতে বলিস—

—বলব—

দুর্বল পায়ে বেরিয়ে এল রঞ্জন। শরীরটা কেমন ঝিম ঝিম করছে উত্তেজনায়, প্রথম সন্ধ্যায় সবে জ্বলে ওঠা মিউনিসিপ্যালিটির কেরোসিনের আলোটাকে কেমন ঝাপসা লাগছে, যেন ওর ওপরে জমেছে বৃষ্টির গুঁড়ো। জামার নিচের পকেটদুটোকে অতিরিক্ত ভারী মনে হচ্ছে, কার্তুজগুলোর পেতলের ক্যাপে ক্যাপে ঘষা লেগে কেমন একটা অস্পষ্ট ক্লিচ্ ক্লিচ্ শব্দ শোনা যাচ্ছে, খর্ খর্ করে অল্প অল্প আওয়াজ দিয়ে উঠল ভেতরকার ছর্‌রাগুলো। সভয়ে দুটো পকেটকে চেপে ধরে এবার জোরে চলতে আরম্ভ করল রঞ্জন। বিধুবাবু মক্কেল নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে আছেন, ওকে দেখতে পেলেন না। দেখা দেবার মতো অবস্থাও নয় তার—দীর্ঘজীবী হোক বিধুবাবুর দেওয়ানী মামলার মক্কেলেরা।

পথের দুধারে ঘর বাড়ি মানুষগুলো যেন ছায়াবাজীর মতো নাচছে, গাছ-পালার ছোপলাগা আকাশটা দুলছে নাগরদোলায়। কারো চোখের দিকে চোখ তুলতে পারছে না, মনে হচ্ছে সকলে যেন তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তারই পকেটদুটোর দিকে। হঠাৎ যেন শরীরের ওজনটা অতিরিক্ত হালকা হয়ে গেছে তার, পা দুখানা তার নিজের ইচ্ছের চলছে না—হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে কাগজের টুকরোর মতো। অতিরিক্ত উত্তেজনায় সমস্ত মস্তিষ্কটাই তার ফাঁকা হয়ে গেছে, তাই শরীর থেকে লোপ পেয়েছে মাধ্যাকর্ষণবোধ ?

সাইকেল চড়া সেই লোকটা। এতদিনে নামটাও জানা হয়ে গেছে তার, আই-বি কনস্টেবল ইয়াদ আলী। ভাগাড়ের সন্ধানে উড়ন্ত শকুনের মতো চোখের দৃষ্টি। হঠাৎ এসে যদি পথরোধ করে দাঁড়ায়, যদি বলে, দাঁড়াও, তোমার পকেট দুটো একবার সার্চ করে দেখব ?

দিশেহারার মতো রঞ্জন চলতে লাগল। ধাক্কা লেগে গেল একজন পথচারীর সঙ্গে, সে ধমক দিয়ে উঠল : অমন করে হাঁটছ কেন খোকা, একটু চোখ চেয়ে চলতে পারো না।

গোষ্ঠের মেলায় চুরির অংশ নিয়েছিল, আজ সে নিজেই চুরি করেছে। চুরি করেছে রঞ্জন—একটা মিথ্যা কথা বলতেও যার বুক থর থর করে কেঁপে ওঠে। আশ্চর্য, বদলে গেছে জীবনবোধ, বদলে গেছে জীবনের দৃষ্টি। আজ জেনেছে বৃহত্তর, মহত্তর সত্যের জন্যে এ সমস্ত ছোট কাজ করায় কোনো অপরাধ নেই। এ তার দায়িত্ব, এ তার কর্তব্যের অঙ্গ। হত্যার চেয়ে বড় পাপ নেই, কিন্তু 'পথের দাবী'র সব্যসাচী তো সেই হত্যারই রুদ্রবন্দনা গেয়েছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত দিয়েই স্বাধীনতার পূজাঞ্জলি। হাজার

হাজার মানুষের শবদেহ বিছিয়ে সেই রক্তধারার ওপরেই গড়ে ওঠে সেতু। তাই নিজের জন্যে যা অপরাধ, দেশের জন্যে তাই পরমপুণ্য। একদিন চুরি করে নিজেকে কলঙ্কিত বোধ করেছিল, আজ গৌরবান্বিত মনে হচ্ছে, আজ মনে হচ্ছে মহাসাগর তুফান তুলতে একটুখানি ঢেউয়ের দোলা সেও জাগিয়ে দিতে পারে হয়তো।

—এমন হন্ হন্ করে কোথায় চললি গঙ্গাফড়িং ?

পাথরের মতো পা থেমে গেল রঞ্জনের। সঙ্গে সনে স্বস্তিরও একটা নিঃশ্বাস পড়ল। ভোনা। গলায় একটা রুমাল বেঁধেছে গুণ্ডার মতো করে, একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে।

—কোন্ লঙ্কা জয় করতে যাচ্ছ বৎস ?

সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ালো ভোনা। পাকামি-ভরা মুখটা বুড়ো মানুষের মুখের মতো দেখাচ্ছে এখন, যেন একেবারে ভবেন মজুমদার। আশ্চর্য, আট ন মাস আগে এই ভোনাই বেরিয়েছিল নন্-কো-অপারেশন আর বিদেশী বয়কট করতে, এই ভোনাই সিগারেটের স্তূপে আগুন ধরিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। শুধু ভোনাই নয়, আবার তো লোকের মুখে মুখে তেম্নি করে সিগারেট জ্বলছে, মদের দোকানে তেম্নি তো চলেছে লোকের আনাগোনা। তা হলে ? বেণুদার কথাই ঠিক। সত্যাগ্রহ আন্দোলন নিজেকে ফাঁকি, দেশকেও ফাঁকি। বেনোজলের মতো তো এসেই মিলিয়ে যায়, চিহ্নও রাখে না। বানের ঘোলা জল নয়, রক্ত-সমুদ্রের দোলা চাই এবারে।

কিন্তু নিচের দুটো পকেটভরা তার টোটা। আর সাইকেলে চড়ে ইরাদ আলী সারা সহরটা চষে বেড়াচ্ছে। রঞ্জন আরো জোরে এগিয়ে চলল।

—বেণুদা, বেণুদা ?

বাড়ির দরজায় যখন পৌছুল তখন হাঁপাচ্ছে সে। সদর দরজা খুলে হাসিমুখে করুণাদি এসে হাজির: এমন ব্যতিব্যস্ত হলে যে ? ব্যাপার কী ?

—খুব জরুরি দরকার।

—কী দরকার ?

সত্যি কথাটা বলা যাবে না, কিন্তু মায়ের মতো দৃষ্টি যার চোখে সেই করুণাদির কাছে মিথ্যেও বলা চলে না। উত্তর দিল না, দাঁড়িয়ে রইল মাথা নিচু করে।

করুণাদি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কী দরকার ?

—বেণুদাকে বলব।

—ওঃ—করুণাদি কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ওর দিকে। বললেন, ভেতরে এসো ভাই।

ভেতরে ঢুকতে করুণাদি দরজাটি বন্ধ করে দিলেন। তারপর একখানা হাত রাখলেন ওর কাঁধের ওপর। আস্তে আস্তে বললেন, তোমাকে আমার ছোট ভাইয়ের মতো বলেই জানি। একটা সত্যি কথা বলবে?

সন্দেহে বুকটা টিপ টিপ করতে লাগল, কপালে ঘাম ফুটে বেরুল বিন্দু বিন্দু করে।

—বলুন।

—তুমি কি শেষ পর্যন্ত ওই দলে গিয়ে ভিড়েছ?

রঞ্জন নির্বাক।

—বলুন।

—ও পথে যেয়ো না, ও ছেড়ে দাও।

বেণুদার বোনের মুখে কথাটা শোনাল নতুন রকম। বিস্মিত চোখের দৃষ্টি তুলে ধরল রঞ্জন। এ কার কাছে কী শুনছে সে!

—হ্যাঁ ভাই, ছেড়ে দাও।—সন্ধ্যার অন্ধকারে, একটু দূরের লণ্ঠনের ক্ষীণ আবছায়া আলোতেও দেখতে পেলো করুণাদির চোখ অশ্রুতে চক চক করছে: কেন এ সর্বনাশা খেলায় নেমে পড়েছ? এ যজ্ঞে কি সবাইকে বলি দিতে হবে—কাউকে বাদ দেওয়া যাবে না?

ভয়ঙ্কর চমকে উঠল সে। কী একটা বলতে গিয়ে থর থর করে কেঁপে উঠল ঠোঁট। তার কপালের ওপর করুণাদির এক ফোঁটা চোখের জল এসে পড়েছে। একবিন্দু তরল আগুন যেন।

সীমাহীন বিস্ময় আর বেদনায় সারা বুকটা যেন মোচড় খেয়ে গেল: আপনি কাঁদছেন করুণাদি?

—হাঁ, কাঁদছি—করুণাদি আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন: কেন যে কাঁদছি আজ তুমি তা বুঝতে পারবে না। এই আগুনে কত ফুলের মতো ছেলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। যাদের বাঁচা উচিত ছিল, তারাই মরেছে সব চেয়ে আগে। কী লাভ হল এতে?

বিস্ময় ব্যাকুল হয়ে রঞ্জন বললে, করুণাদি, আমি তো—

—না, কিছু বুঝতে পারবে না! তুমি বুঝতে পারবে না আজ কেন আমার স্বামী থেকেও নেই, কেন আমি দিনরাত এমন করে দুখের জ্বালায় জ্বলছি। শুধু তোমাকে একটা কথা বলব ভাই। তুমি কবি—তুমি গুণী।

তুমি বাঁচবার চেষ্টা করো, মরার লোভকে জয় করতে চেষ্টা করো। ঢের বেশি কাজ হবে তাতে। এ তোমার পথ নয় ভাই, এ রক্তের পথে তুমি যেয়ো না।

আরে—এ কী হল! করুণাদি হঠাৎ আত্ম-বিস্মৃত হয়ে গেলেন। ওর সামনেই উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদতে শুরু করে দিলেন তিনি, কান্নার বেগে তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল।

আর পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল রঞ্জন। কিছুই বুঝতে পারছে না। শুধু বিধুবাবুর ড্রয়ার থেকে চুরি করা যে কার্তুজগুলোকে এতক্ষণ নিজের বিজয়ের প্রতীক বলে মনে হচ্ছিল, হঠাৎ যেন একটা অর্থহীন ব্যর্থতায় তারা সমাচ্ছন্ন হয়ে গেছে, আকীর্ণ হয়ে গেছে কলঙ্কিত শূন্যতায়।

—চোদ্দো—

সময় উড়ে চলেছে, পাখা মেলে দেওয়া সোনালি রঙের সময়। না—সোনালি নয়, আগ্নেয় রঙের সময়। বাংলা দেশের প্রতি প্রান্তে প্রান্তে অগ্নি-গিরির আত্মবিদারণের সূচনা। ডাকাতি, ষড়যন্ত্র আর অস্ত্র আবিষ্কার, শ্বেতাঙ্গ অফিসারের বুলেট-বেঁধা বুকের রক্তে রাঙা হয়ে যাচ্ছে মেদিনীপুরের খেলার মাঠের সবুজ ঘাস, রক্তে কলঙ্কিত হয়ে গেছে অহমিকার দুর্গ রাইটার্স বিলডিঙের ঝকঝকে মেঝে পর্যন্ত। হাওয়ায় ভেসে গেছে তিন বছর সময়। এর মধ্যে ম্যাট্রিক পাশ করেছে সে, পাশের পর শহরে গিয়ে ভর্তি হয়েছে কলেজে তারপর গরমের ছুটিতে ফিরেছে মুকুন্দপুরে।

অন্তরীণবন্দী রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় চোখ তুলে তাকায় সামনের দিকে। পদ্মার ঘোলা জল কালো হয়ে এল। দূরের সমস্ত উঁচু মাঠটার চূড়ো যেন ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টির সম্মুখ থেকে। গাং-শালিকেরা প্রবল কলরবে ঘরে ফিরে আসছে। দূর থেকে কার গানের সুর শোনা যায়, বোধ হয় ডাক্তার বাবুর মেয়ে সীতা!

অল্প অল্প বাতাস! সে বাতাসে যেন মনের পাণ্ডুলিপির পাতাগুলোও উড়ছে সঙ্গে সঙ্গে। কোলের ওপরে খোলা বইটার অক্ষরগুলো একটু একটু করে অস্পষ্ট হয়ে এল।…

—টক্ টক্ টক্—

দরজায় তিনটে টোকা দিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল। একেই বাড়িটা আমবাগানের নির্জনতার মধ্যে, বেশ রাত হয়েছে তার ওপরে। এত অন্ধকার যে নিজেকেই ভালো করে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

—টক্ টক্ টক্—

আবার টোকা দিলে। সামনের কালো দরজাটা কোনো শব্দ না করে যেন বাতাসে খুলে গেল।

—কে ?

—আমি রঞ্জন।

—ওঃ, ভেতরে আসুন।

নারীকণ্ঠ। কিন্তু যে বলছে—অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না তাকে। নিঃশব্দে আবার পেছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল, একটা টর্চের আলো হঠাৎ জ্বলে উঠে উঠোনের ওদিকটাতে একটা ঘর পর্যন্ত পথের মতো প্রসারিত হয়ে গেল। অদৃশ্য মেয়েটি আবার বললে, ওই ঘরে চলে যান।

যন্ত্র-চালিতের মতো ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল রঞ্জন। দরজা ভেজানো, ফাঁক দিয়ে মিটমিটে লণ্ঠনের আলো আসছে। কবাটে আবার গোটাকতক টোকা দিতেই বেণুদার চাপা গম্ভীর গলা কানে এল : কাম্ ইন্।

ঘরের মেঝেয় মাদুর পাতা। যারা বসে আছে, লণ্ঠনের আলোয় ভালো করে তাদের দেখা যায় না, কিন্তু তার ভেতরেও নির্ভুল আর নিঃসন্দেহভাবে চিনে নেওয়া যায় বেণুদাকে।

বেণুদা আবার জিজ্ঞাসা করলেন : কে ?

—আমি রঞ্জন।

—বেশ, বোসো।

শুষ্ক কঠিন গলা। স্বভাবসিদ্ধ স্নেহের আভাস তাঁর স্বরে কোথাও নেই। অল্প অল্প আলোয় সমস্ত ঘরটায় একটা রহস্যঘনতার আমেজ। এখানে, এই মুহূর্তে যারা বসে আছে, তারা পথে ঘাটে দেখা চেনা মানুষ নয় আর। পাতালের পথে, ছেলেবেলায় কল্পনার সেই মাটির তলাকার বোমার কারখানার এরা মানুষ—ক্ষুদিরামের কামানের উত্তরাধিকারী। এরা নিহিলিস্ট্—এরা মিচেল কলিন্সের সহকর্মী, সিম্‌স্কিনের কর্মী, সান্-ইয়াৎ-সেনের ইয়ং-চায়না আর বক্সার বিপ্লবীদের এরা প্রতিভূ। মুস্তফা কামাল এদেরই অনুপ্রেরণা।

অন্ধকারের মধ্যে এক কোণায় বসে পড়ল সে। বেণুদা চাপা গলায় সুরু করলেন : টাকা আমাদের চাই। আমাদের যার যা ছিল সাধ্যমতো

সবাই তা দিয়েছি। অথচ পরশু কলকাতায় জাহাজ আসবে, মালও আসবে। অন্তত আরো হাজার দেড়েক টাকা জোগাড় না করলেই নয়। পরিমল ?

ঘরের এক কোণ থেকে পরিমলের ছায়ামূর্তি জবাব দিলে, আমি যেমন করে হোক শ দুই জোগাড় করব।

—থ্যাঙ্ক ইউ। বেণুদা হাসলেন : পার্টি তো তোমাকে বরাবরই দোহন করে আসছে, তোমার ওপরে আর বেশি চাপ দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আর কেউ—

ঘরের সকলে মাথা নিচু করে রইল।

বেণুদা বললেন, সকলের অবস্থাই আমি জানি। সোনার বোতাম থেকে ঘটিবাটি পর্যন্ত বিক্রী করেও টাকা দিয়েছে অনেকে। কী যে করা যায়—! চারদিকে যে রকম ধরপাকড় আর গণ্ডগোল, কোনো ডাকাতির রিস্‌কও চট করে নিতে পারছি না এখন। কিন্তু এ অবস্থায়—

—আমি সামান্য কিছু দিতে চাই—

ঘরের সকলের দৃষ্টি ফিরে গেল একসঙ্গে—রঞ্জনেরও। এ সেই অদৃশ্য মেয়েটির গলা। লণ্ঠনের আবছায়া আলোয় চোখ এতক্ষণে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, এবার সে তাকে দেখতে পেলো।

লম্বা চেহারার রোগা মেয়ে। কালো পাড়ের একখানা শাদা শাড়ী তার পরণে। এগিয়ে এল নিঃশব্দ একটা ছায়ার মতো। কেমন যেন মনে হল অন্ধকারের মধ্য থেকে যেমন হঠাৎ সে বেরিয়ে এসেছে, তেমনি আকস্মিক-ভাবেই আবার কোথায় মিলিয়ে যেতে পারে।

—সুতপা ?—স্নিগ্ধ বিস্মিত গলায় বেণুদা বললেন, কী দেবে তুমি ?

হাত থেকে ছোট একটা আংটি খুলে সুতপা বেণুদার পায়ের কাছে এগিয়ে দিলে : এইটে।

—এই আংটি ?—বেণুদার স্বরে ব্যথা ফুটে বেরুল : এইটে তুমি দিতে চাও ?

ছায়ামূর্তি সুপতা ঘাড় নাড়ল—কথা বললে না।

—কিন্তু—বেণুদা বিব্রত স্বরে বললেন, এ তো নিতে পারব না।

মৃদু স্বরে প্রশ্ন করল সুতপা : কেন ?

তেমনি বিব্রতভাবে বেণুদা বললেন, এ তো তোমার মায়ের স্মৃতিচিহ্ন। আমি জানি এর সত্যিকারের দাম কত। এ বরং নাই নিলাম সুতপা।

সুতপার চাপা গলা অন্ধকারে যেন শিষ দিয়ে উঠল চাবুকের আওয়াজের মতো।

—তাহলে কি মনে করব পার্টিকে এটুকু দেবার অধিকারও আমার নেই? মনে করব, আমি পার্টির করুণার পাত্র?

ঘরের প্রত্যেকটি মানুষ নিঃশব্দ হয়ে বসে রইল, এমন কি বেণুদাও। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার সেই ধারালো গলা শোনা গেল: হয় তো দাম এর বেশি নয়, আর সেই জন্যেই—

এবার বেণুদা জবাব দিলেন। শান্ত, বিষণ্ণ আর গভীর তাঁর কণ্ঠ। বললেন, না, এর এত বেশি দাম যে এর ঋণ পার্টি কোনোদিন শোধ করতে পারবে না। হার দিয়েছ, চুড়ি খুলে দিয়েছ, জানি, নিজের বলতে শুধু এইটুকুই তোমার ছিলো। তবু আমি এ নিলাম স্তপা। আমরা আজ এর দাম দিতে পারব না, কিন্তু দেশ হয়তো দেবে একদিন।

অনুমান ভুল হয়নি রঞ্জনের। চক্ষের পালক না ফেলতেই দেখল ছায়ামূর্তি তেমনি নিঃশব্দ অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। যেন একটা কালো খাপের ভেতর থেকে ক্ষণিকের জন্যে আত্মপ্রকাশ করেই আবার আত্মগোপন করেছে একখানা তীক্ষ্ণধার তলোয়ার। কিন্তু তলোয়ার যে, কোনো সন্দেহ নেই সে বিষয়ে।

—নাঃ, একটা অ্যাটেম্প্‌ট্ নিতেই হয় তা হলে—বেণুদার স্বর। কিন্তু রঞ্জু ভাবছিল অন্য কথা। মিতা, করুণা, আর স্তপা। একজন রূপকথা, একজন মায়ের চোখ, আর একজন আগুনের একটা অপ্রত্যাশিত ঝলক। কাউকেই ধরা যায় না, অথচ তিনজনকে কেন্দ্র করেই কল্পনা খেয়াল খুশিতে তার জাল বুনে চলে, হারিয়ে যায় অসীম আর অর্থহীন কৌতূহলের গভীরে। আর মিতা—কী অদ্ভুতভাবে ছোট হয়ে যায় এদের কাছে—হয়ে যায় কী মূল্যহীন! তবু—তবু, মিতা কেন স্তপা হয় না?

কিন্তু কৌতূহলজনক কিছু একটা অপেক্ষা করছিল হালদারের জন্যও।

সেই হালদার। ফণীর মাকে বাড়ি থেকে তাড়ানোর ব্যাপারে সেই অত্যুৎসাহী লোকটি: সহরে সোনাচাঁদির ব্যবসা, বেশ কিছু টাকাকড়ি জমিয়েছে বলে গুণ্ডার দল ভাড়া করে আনে কথায় কথায়। আর 'তরুণ সমিতি'র ওপরে হাড়ে হাড়ে চটে আছে, শাসিয়ে দিয়েছে বাগে পেলে এদের সে দেখে নেবে।

কিন্তু তার আগে তার নিজেরই যে দিন এগিয়ে আসছিল সে কথা জানত না হালদার।

শীতের রাত নেমেছে। উত্তর বাংলার শীত—হাড় জমানো ঠাণ্ডায় গুঁড়ো গুঁড়ো বরফের ঝাপটার মতো উত্তুরে বাতাস বয়ে যাচ্ছে শোঁ শোঁ করে।

যেন ঘা দিয়ে যাচ্ছে কোনো প্রেত-ঈগলের মৃত্যু হিমাক্ত ডানা—রোমকূপগুলো তার স্পর্শে কাঁটার মতো খাড়া হয়ে ওঠে, শরীরের যে জায়গাগুলো খালি তারা যেন অসাড় হয়ে খসে পড়তে চায়, ঠোঁটমুখ ফেটে রক্ত পড়তে থাকে।

একটি লোক নেই রাস্তায়। শুধু খোয়া-ওঠা পথে খর্ খর্ খট্ খট্ আওয়াজ তুলে ঘোড়ার গাড়ি একটা চলে গেল ওদিকের চৌমাথা দিয়ে। কোথায় কেঁউ কেঁউ করে কেঁদে উঠছে একটা শীতার্ত কুকুর। যেন অদেহী কতগুলো ছায়ামূর্তি চল-ফেরা করছে, চারদিকে তাদের তুষারস্পর্শ সঞ্চার করে। মিউনিসিপ্যালিটির আলোগুলো যথা নিয়মে নিবে যাচ্ছে একটার পর একটা।

আর নেমেছে কুয়াশা। সন্ধ্যার কয়লার ধোঁয়া আর রাত্রির হিম একসঙ্গে মিশে কুণ্ডলি পাকাচ্ছে চারপাশে। ঝাপসা ধোঁয়াটে আবরণ চোখের দৃষ্টিতে দেয় জ্বালা ধরিয়ে। ফর্শীটার শেষ টান দিয়ে মস্ত একটা আরামের হাই তুলল হালদার, একবার অন্যমনস্কভাবে তাকালো পথের দিকে।

এত রাত্রে আর খদ্দের আসবে না।

—ওরে জগা, ক্যাশটা দে দেখি।

ক্যাশবাক্স এগিয়ে দিলে জগা। প্রলুব্ধভাবে নোটগুলো গুণতে গুণতে হালদার একবার তাকালেন নিজের আয়রণ সেফগুলোর দিকে। বললেন, দরজাটাও বন্ধ করে দে—

দরজা আর বন্ধ করতে হল না অবশ্য। সেদিকে দু'পা এগিয়েই জগা সঙ্গে সঙ্গে তিন পা পেছিয়ে এল। তার মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে আতঙ্কে।

হালদার ধমক দিলেন : কিরে, ভুত দেখলি নাকি?

জগাকে কিছু বলতে হল না, নিজেও দেখলেন হালদার। হাত দুটো থর-থর করে কেঁপে উঠল তাঁর, টাকা পয়সাগুলো হরির লুটের মতো ঝন্ ঝন্ করে ছড়িয়ে গড়িয়ে গেল মেজেতে।

দরজা দিয়ে খদ্দের ঢুকছে জনচারেক। মুখে তাদের কালো কাপড়ের মুখোসখানা। দুজনের হাতে দুখানা বড় বড় বারো ইঞ্চি ছোরা; বাকী দুজন দুটি ছোট ছোট কালো নল সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। নল দুটি দেখতে ছোট হলেও ওদের চেনে বইকি হালদার। ওই নল লণ্ডনের রাজদরবারের ওপরেও বেলশাজ্যার্স ফিস্টের অদৃশ্য হস্তলেখার মতো ছড়িয়েছে অশুভ অপচ্ছায়া।

জগা কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে কাউণ্টারের তলায় ঢুকেছে, ভয় পেয়ে লেজ

গুটানো কুকুর যেমন করে পালিয়ে আসে সেই রকম। হালদারের মুখের চেহারা অবর্ণনীয়, তার দাঁতে দাঁতে আওয়াজ উঠছে খট্ খট্ শব্দে। মুহূর্তের মধ্যে যেন তুষার-মেরুর শীতলতা সঞ্চিত হয়েছে ঘরটায়।

—একটা কথা বললেই গুলি করব।—চাপা তীক্ষ্ণস্বরে একজন বললে, দেখি ক্যাশবাক্স—

নিরুত্তরে ক্যাশবাক্স এগিয়ে দিলে হালদার।

—সিন্দুকের চাবি।

একটা বুকফাটা কান্না বেরিয়ে আসবার উপক্রম করেছিল হালদারের, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যেন লাফিয়ে একটা কালো নল এগিয়ে এল তার কপালের দিকে। মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল হালদার।

মাত্র মিনিট তিনেক সময়। দুহাতে মুখ ঢেকে রইল হালদার, এই শীতের দিনেও কপাল বেয়ে টস্ টস্ করে ঘাম ঝরে পড়ছে তার। কাউন্টারের তলায় কুকুরের ছানার মতো অব্যক্ত একটা কুঁ্যই কুঁ্যই শব্দ করছে জগা—অজ্ঞান হয়ে গেছে খুব সম্ভব।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় একজন আর একবার মুখ ফেরালো হালদারের দিকে। বললে, দরজার বাইরেই পাহারা দিচ্ছি আমরা। কোনো সাড়াশব্দ করেছ কিংবা বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেছ—কি সঙ্গে সঙ্গে শেষ করে দেব।

হালদার জবাব দিলে না। জগার মত সেও জ্ঞান হারিয়েছে বোধ হয়।

দরজার শিকলটা টেনে দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল চারজন। কোনোখানে কারো সাড়াশব্দ নেই, শুধু শীতার্ত কুকুরটার একটা কান্না উঠছে অবিশ্রাম। আর পথের ওপর কন্‌কনে শীতে শাদা কুয়াশা নিরবচ্ছিন্ন কুণ্ডলী পাকিয়ে চলেছে, ঝাপ্‌টা মারছে মৃত-ঈগলের প্রেত ডানা, খোয়া ওঠা পথের ওপর টপ টপ করে ঝরে যাচ্ছে বরফ গলা শিশির-বিন্দু।

ঘরের মধ্যে বিস্ফারিত চোখে হালদার ওই কালো কালো নলের ছায়া দেখতে লাগল।

আজ রাত্রে আর ঘুম আসবে না।

লেপের মধ্যে শুয়ে শুয়ে ছটফট করছে রঞ্জন। লণ্ঠনটা কমিয়ে রাখা হয়েছে, অন্ধকার ঘরে ওইটুকুই শুধু একটুখানি আলোকবৃত্ত। কিন্তু তার চোখের সামনে যেন আলোর কণা—ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে, ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। তারপর ধুলোর মতো আরো সূক্ষ্ম হয়ে রেণু রেণু হয়ে

পাক খাচ্ছে জ্যোতির ঘূর্ণির মতো। পা দুটো এখনো বড় বেশি ঠাণ্ডা—পেরিয়ে এসেছে মেরু-মৃত্তিকার তুহিনতা, পায়ের পাতা শরীরের একটু ওপর দিকে ছোঁয়ালেই ঠাণ্ডায় শিউরে উঠছে চামড়া।

ঘুম আসবে না। মাথার মধ্যে বিপর্যয় কাণ্ড চলেছে—ছিঁড়ে পড়তে চাইছে রগগুলো। একটা কালো শীতল সাপের মতো কী যেন চেতনায় শিউরে শিউরে উঠছে। আজ তার প্রথম হাতে-খড়ি। রক্ত-ঝরা দুর্গম পথে এই প্রথম অভিসার সুরু হল।

ডাকাতি!

সে ডাকাতি করেছে। হালদারের দোকানে হানা দিয়ে টাকায় গয়নায় হাজার তিনেক টাকার মতো সংগ্রহ করা হয়েছে আজ! এ ছাড়া উপায় ছিল না। জরুরি তাগিদ, জরুরি প্রয়োজন। কলকাতায় জাহাজ এসে পৌঁছেছে, আর অপেক্ষা করলে কতকগুলো ভালো ভালো জিনিস যেত হাতছাড়া হয়ে।

ডাকাতি করেছে সে। ভালো মানুষ রঞ্জন, লাজুক রঞ্জন। ছেলেবেলায় হাড়গিলা পাখির ডাক শুনে যে ভয় পেয়েছিল—সেই মানুষ। তাকে হাতছানি দিয়েছিল ডাহুক-ডাকা কালীসন্ধ্যায় অশরীরী অবিনাশবাবু, নির্জন কাঞ্চন নদীর ধারে একা একা আসতে তার আতঙ্কের সীমা ছিল না। এমনকি এই সেদিন, মাত্র দুবছর আগেও সে নির্ভয়ে গোমেজ সাহেবের কুঠি-বাড়ীর কবরখানায় আসতে সাহস পায়নি, সে আজ ডাকাতি করল।

কী জীবন ছিল! চোখ ভরা ছিল মালঞ্চমালা-পাশাবতীর স্বপ্ন; খিড়কির বাগানের ঠাণ্ডা ছায়ায় ছাইগাদার পাশে বসে একা একা ভাবতে ভালো লাগত, ভালো লাগত বুক ভরে বাতাবী-ফুলের গন্ধভরা বাতাস টেনে নিতে; রেললাইনের চলন্ত গাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কল্পনা-বিহ্বল মন কোথা থেকে কোথায় যে ভেসে যেত তার, ভূগোলের পাতায় পড়া কোন তুষার-মেরুর আশ্চর্য বিস্তারে, কোন্ আফ্রিকার নীল জঙ্গলে, পাহাড়ের বুকের মধ্যে গর্জে গর্জে ওঠা কোন্ দূর ফেনিল কলর্যাডো নদীর ধারে ধারে। তারপর সংঘমিত্রা। না—মিতা। হেনার কুঞ্জে সাজানো সেই বাগানটা—সেখানে একটা চিতি হরিণ, আর হরিণের মতো যার চোখের দৃষ্টি—

অথচ কী হল। সেইখানেই সে পেল মৃত্যুর দীক্ষা। পেল 'পথের দাবী'র পথ। আজ সেদিনের নিজেকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না, আজ সেদিনের মনটাকে ইচ্ছে যায় করুণা করতে। বিপ্লবী, নির্ভীক। রবীন্দ্রনাথের সেই পংক্তিগুলো মনে পড়ে:

"চাবোনা সম্মুখে মোরা, মানিব না বন্ধন-ক্রন্দন
হেরিব না দিক,
গণিবনা দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক-বিচার
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল-উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি—"

হাঁ, তাই। মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততাই আজ কণ্ঠ ভরে পান করে নিতে হবে। মদ সে খায়নি কিন্তু এর চাইতেও তীব্র কি তার নেশা, তার জ্বালা কি এর চাইতেও উদগ্র? সেদিনের সেই কিশোর স্বপ্ন-বিভোর রঞ্জু চিরদিনের জন্য তালিয়ে যাক, হারিয়ে যাক। মরণের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী রঞ্জন রচনা করে যাক তার আত্ম-কাহিনী: "মোদের মৃত্যু লেখে মোদের জীবন ইতিহাস—"

কিন্তু ডাকাতি?

বাইরে কিসের শব্দ? কেউ হাঁটছে না?

চকিত হয়ে সে বিছানায় উঠে বসল—বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস আরম্ভ হয়ে গেছে। শুধু পায়ে শব্দটা যেন হৃৎপিণ্ড থেকে উঠে আসছে, উঠে আসছে তার শ্বাসনালী চেপে ধরতে, তার নিশ্বাস রুদ্ধ করতে। রক্ত-মাখানো কয়েক টুকরো রুটি আর কয়েকটা কালো টাকার লোভ চারদিকে জাল ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে টিকটিকির সর্দার সেই ধনেশ্বরটা। আর ছাই রঙের কোটপরা ইয়াদ আলী, বর্ণচোরা আরো অজস্র—দেশের হৃৎপিণ্ডে যেখানে এতটুকুও প্রাণ ধুক ধুক করছে, উড়ন্ত শকুনের মতো চক্র দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারি ওপরে ছোঁ দিয়ে পড়বার জন্যে। তাদেরই কেউ বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে না তো।

—টপ টপ—

না। টিনের চালের ওপর থেকে বরফ-গলা জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে নিচের মরা ঘাসের ওপর। কিন্তু তবু ওদের বিশ্বাস নেই। শহরে এর মধ্যেই পাঁচ সাতটা বন্দুক চুরি হয়ে গেছে, দুটো ডাকাতিও হয়েছে গ্রামের দিকে। এখন যেন হন্যে কুকুরের মতো ঘুরছে ধনেশ্বর। কোনোটার কিছু কিনারা করতে পারেনি, তাই অনবরত সার্চ চলেছে শহরে, দুবার সার্চ করেছে বেণুদার বাড়িতেই। আর আছে সংশোধিত ফৌজদারী আইন, শহরের অনুশীলন দলটাকে প্রায় বেড়েন দিয়ে জেলে নিয়ে ঢুকিয়েছে। শুধু ওদের এখানেই এখনো নাক গলায়নি, সবশুদ্ধ এক সঙ্গে নিয়ে জাল টানবার মতলব আছে কিনা কে জানে। অন্তত বেণুদার যে আর খুব বেশি বাকী নেই একথা

নিজেই তো তিনি বলছিলেন সেদিন।

ধেৎ—কী বাজে ভাবনা এসব! ভয় পাচ্ছে নাকি রঞ্জন? ভয় পাচ্ছে জেলে যেতে? আজকে যে ডাকাতি করেছে, ধরা পড়লে তার শাস্তিটা কল্পনা করে কি আতঙ্কে বুকের মধ্যে রক্ত জমাট হয়ে আসছে তার? না—কোনো ভয় নেই, কোন আশঙ্কাই নেই তার। জেলকে ভয় করবে না, কেঁপে উঠবে না সি-আই-ডির হাজার অত্যাচারের আতঙ্ককর সম্ভাবনায়। দূর কালাপাণির ওপরে বিভীষিকাভরা আন্দামান। প্রাগৈতিহাসিক লস্ট ওয়ার্লডের মতো অমানুষিক বিভীষিকায় ভরা। অথচ আজ তাই নতুন একটা রামধনুকের দীপের মতো তাকে মায়াময় আহ্বান পাঠাচ্ছে। যেদিন ফাঁসির দাড় গলায় নিয়ে সে হাসিমুখে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াবে বিপ্লবী কানাইলালের মতো, অন্যান্য শহীদদের মতো তারও স্থান হবে কোনো জ্যোতির্ময় সপ্তর্ষিলোকে সেদিনের চেয়ে কোন্ বড় গৌরব আছে আর?

কোনো বন্ধন আছে কি? কোন মোহ? বিপ্লবীর পিছুটান থাকতে নেই। কতবার সে তো নিজের খেয়ালে আবৃত্তি করেছে—"ঝড়ের গর্জন মাঝে, বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে।" কবিতার খাতায় ছন্দে ছন্দে রূপ দিয়েছে, তার সেই অনুপ্রেরণাকে : বন্ধন নয়, ক্রন্দন নয়, মুক্তির স্পন্দন—

তবুও—

তবুও কে? মিতা?

হঠাৎ রঞ্জু চঞ্চল হয়ে উঠল। এই তিন বছরে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে এসেছে মিতার সংশ্রবে, মেশবার সুযোগও পেয়েছে। জেনেছে পরিমলের বোনও পিছিয়ে নেই, সেও ওদেরই একজন। সেও সূর্যমুখী—তারও তপস্যা আগ্নেয় তপস্যা। তবু—

মিতা বড় হয়েছে, উঠেছে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশে। ছেলেমানুষ রঞ্জু আজকে হয়েছে তরুণ, সেদিনকার ছোট মেয়েটি আজকের তরুণী। তার শান্ত চোখে ধার এসেছে এখন। চলায় যেন ঢেউ লাগে আজকাল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে ভালো লাগে, একটা পদ ভুলে যাওয়া গান যেন মনের ভেতরে রচনা করে সুরের কুয়াশা।

আস্তে আস্তে একটা ঘোর এসে মনকে আচ্ছন্ন করতে লাগল। এখানে নয়—এখানে নয়। এ পৃথিবীতে মিতা কেউ নয় ওর। এ সাজানো আলমারি থেকে মিতাকে বের করে আনতে হবে রক্তঝরা জীবনের মাটিতে। ভাবতে ইচ্ছা করে জালালবাদ পাহাড়ে কিংবা ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে বুড়ীবালাম নদীর

একটা পরিবেশ ; সমস্ত শরীর জলছে যেন মশালের মতো, টগবগিয়ে ফুটছে রক্ত। কারণ, ওদিকে টিলা আর জঙ্গলের আড়ালে এগিয়ে আসছে পুলিশ বাহিনী।

—আর্মস্ কম্‌রেড্‌স—

কম্‌রেড্‌স্! মাত্র দুজন। ও আর মিতা। পাশাপাশি দুজনে দাঁড়িয়েছে। একবার শুধু পরস্পরের দিকে তাকালো ওরা, তারপরেই ওদের রিভলভার গর্জন করে উঠল। প্রাণ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ লড়াই। হঠাৎ একটা গুলি এসে বুকে লাগল—হৃৎপিণ্ডটাকে ছিঁড়ে বেরিয়ে চলে গেল—মৃত্যুর তপ্ত পরোয়ানা। পরম শান্তিতে চোখ বুজবার আগে শেষবারের মতো দেখল নীল আকাশ আর মিতার চোখ একাকার হয়ে যাচ্ছে—

ধ্যাৎ—কোন মানে হয় না। কী যে হয়েছে, কিছুতেই ওই মেয়েটাকে মন থেকে বিসর্জন দিতে পারে না, একটা নেশা যেন ঝিনঝিন ঝিমঝিম করে রক্তের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। না—কোন সঙ্গী নেই বিপ্লবীর। একলা পথেরই সে যাত্রী : "এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা—"

কিন্তু ডাকাতি।

হালদারের মুখটা মনে পড়ছে। কী অদ্ভুত বিবর্ণ আর বিকৃত। যদি ধরা পড়ে? কাল সকালে যদি পুলিশ আসে?

উঠে বসল রঞ্জন। ভয় পাচ্ছে—দুর্বল হয়ে পড়েছে নিঃসন্দেহ। না—এ চলবে না। বিধুবাবুর বাড়ি থেকে যেদিন টোটা চুরি করেছিল, সেদিন কি এর চাইতেও বেশি বুক কেঁপেছিল তার? ধরা পড়ুক—দ্বীপান্তর হোক, ফাঁসি হোক। আর নয়। অমর-মরণ রক্ত-চরণে ডাক দিয়েছে' ভয়ের জঞ্জালে আগুন ধরিয়ে দাও আজকে।

ঘুম আসবে না নিশ্চয়ই। লিখলে কেমন হয়? মনের এই অস্থিরতা খানিকটা কেটে যাবে হয়তো। প্রথম ডাকাতির অভিজ্ঞতা যেন স্নায়ুগুলোকে তার এখনো বিপর্যস্ত আর বিশৃঙ্খল করে রেখেছে।

কাগজ কলম টেনে নিয়ে লিখতে বসল :

পুঞ্জিত হল ঘন দুর্যোগ
তিমিরে হারালো চন্দ্র,
মহারুদ্রের কাল-মন্দিরা
বেজে ওঠে মেঘমন্দ্র।
মত্ত-সিন্ধু করি ঝংকৃত,
কার ধনু আজ হল টংকৃত

থরো থরো করি কাঁপে দিগ্বধূ
রজনী বিগত-তন্দ্র—

বেশ লাগছে লিখতে। নিজের লেখার ঝঙ্কার নিজের কানেই উঠছে রনুরনিয়ে। মিতা তার কবিতা পড়ে বলেছে, বিপ্লবী বাংলার বিপ্লবী কবি সে। নজরুলের মতো সেও বাজাবে অগ্নিবীণা, প্রলয়-শিখা জ্বালিয়ে দেবে, ভাঙার গানে শতখান করে দেবে কারাগারের লৌহ কপাটকে। কবি—

কিন্তু—কবি।

—এ পথ তোমার নয় ভাই, এ রক্তের পথ তোমার নয়—

করুণাদির কথা। মায়ের মতো দুটি মমতা-শীতল চোখে তাঁর জল নেমে এসেছিল সেদিন। মুখখানা ভালো করে চেনা যাচ্ছিল না, তার ওপর যেন একটা অদৃশ্য মাকড়সা তার কুশ্রী পা টেনে টেনে জাল রচনা করেছিল একটা। সেই সন্ধ্যায় কেন কে জানে করুণাদি অদ্ভুতভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, হারিয়ে ফেলেছিলেন নিজের স্বাভাবিকতা। যে কথাগুলো বলেছিলেন তাদের বেশির ভাগেরই কোনো মানে বুঝতে পারেনি সে। যেন করুণাদিরই অর্থ বোঝা যায় না। আজ মনে হয় একটা স্বপ্নই বুঝি দেখেছিল সে।

স্বপ্ন ছাড়া আর কী। তারপরে তো করুণাদি কোনো কথাই বলেননি আর। শুধু ও সম্পর্কে নয়, কেমন হয়ে গেলেন আজকাল—বেশি কথাই বলেন না। সেই স্নেহ আছে, চোখের সেই স্নিগ্ধতাও আছে ঠিক আগের মতোই। তাঁর কাছে গেলে তেমনি করেই মাকে মনে পড়ে, মনে পড়ে যায় ছোড়দিকে। অথচ—অথচ, কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়। আর একদিনও মনে হয়েছিল একা একা বসে তিনি কাঁদছেন—রঞ্জুকে দেখেই চোখ মুছে ফেললেন।

—কী ভাই, দেশের স্বাধীনতা এনে ফেলেছো?

খুব হালকা আর সহজভাবে কথাটাকে বলতে চাইলেন কিন্তু সে সহজ সুর তাঁর কথায় বাজল না। নিজেরই কেমন অপ্রস্তুত লাগে আজকাল। করুণাদির সামনে বড্ড অপরাধী বলে বোধ হতে থাকে, চোখের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস হয় না।

—তুমি কবি, তুমি শিল্পী। এ সর্বনাশা খেয়াল তুমি ছেড়ে দাও—

কেন এই কথা? আর এ কথার সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনের ব্যর্থতার সম্পর্কই বা কী? কোথায় কী একটা লুকিয়ে আছে করুণাদির, একটা রহস্যময় গভীরতা ঘিরে আছে তাঁকে। সেটাকে জানা যায় না বলেই যেন তাকে কেন্দ্র করে একটা ব্যবধান মাথা তুলেছে আজকাল।

পরিমলকে জিজ্ঞাসা করেছিল একদিন।

—তুই বলেছিলি ভারী দুঃখের জীবন করুণাদির। কিসের দুঃখ রে?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল পরিমল। বললে, অল্প অল্প শুনেছি ঠিক জানি না। তবে যেটুকু জানি সেটা বলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না।

—তবে থাক।

কিন্তু কেমন যেন লাগে। নিজের লেখা কবিতাগুলোর পেছন থেকে যেন উঁকি দেয় কারো ভর্ৎসনাভরা দৃষ্টি। সত্যিই কি ভুল পথ! কবির জন্মে অস্ত্র নয়, কল্পনাবিলাসার জন্য নয় শিবিরের প্রস্তুতি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অসমাপ্ত কবিতাটা বন্ধ করে ফেলল রঞ্জু। বাইরে থেকে এল মোরগের ডাক। জানালার ফাঁকে ফাঁকে ঘরে এসে লুটিয়ে পড়ল ভোরের আলো।

দিন কয়েকের মধ্যেই জোর ধর-পাকড় শুরু হয়ে গেল শহরে।

হালদার কোম্পানার দোকান লুঠ সাড়া জাগিয়ে তুলেছে চারিদিকে। এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা আর কখনো ঘটেনি মুকুন্দপুরের জীবনে। কোতোয়ালী-খানা থেকে মাত্র তিনশো গজ দূরের মধ্যে এই ডাকাতি। তাড়াতাড়ি এর একটা সুরাহা করতে পারলে ওঃ লর্ড, দী ব্রিটিশ প্রেস্টীজ ইজ লস্ট ফর গুড্।

পুলিশের দাপটে দিন কতক একেবারে তটস্থ রইল সমস্ত। ধনেশ্বরের আহারনিদ্রা বন্ধ হয়েছে, সাইকেল দাবড়ে সারা শহর ঘুরে বেড়াচ্ছে দিন-রাত! লোকটাকে দেখলেই গায়ের মধ্যে নিসপিস করে। গুলি করে নয়, গলা টিপে খুন করতে ইচ্ছে হয় লোকটাকে। অথবা কোনো কালী মন্দিরের সামনে বাজনা বাজিয়ে নরবলি দিতে। কল্পনায় ভেসে ওঠে লোকটার আর্তনাদ, প্রাণের জন্যে ওদের পায়ের কাছে মাথা কোটা।

ধরেছে অনেককেই। কিন্তু আশ্চর্য, যাদের ধরা উচিত ছিল তাদের টিকিটি ছুঁতে পারে নি এ পর্যন্ত। 'তরুণ সমিতি'র লাইব্রেরী এসে খুঁজেছে তচনচ করে, জিন্‌ন্যাষ্টিক ক্লাবের কয়েকজন তাগড়া তাগড়া ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে। ধনেশ্বর নিজে এসে দেখা করে গেছে বেণুদার বাড়িতে। কী বলে গেছে সেই জানে। পরিমলকে জিজ্ঞাসা করেও জানতে পারেনি রঞ্জু।

মনের মধ্যে যতই জোর আনতে চেষ্টা করুক—বুক ধড়ফড় করে। রাত্রে ঘুমের মধ্যে চমকে ওঠে, যেন শুনতে পায় পুলিশের বুটের শব্দ। স্বপ্নে দেখে ধনেশ্বর ওর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিচ্ছে। ঘুম ভেঙে যায়, নিজের দুর্বলতায় নিজেরই লজ্জার সীমা থাকে না।

করুণাদির কথাই কি ঠিক? সে কি পথের অযোগ্য?

কিন্তু এ অযোগ্যতা মেনে নেওয়ার চাইতে আত্মহত্যা করাও ভালো।

'তরুণ সমিতি'র লাইব্রেরী আজকাল বন্ধ। জিমন্যাষ্টিক ক্লাবে একসারসাইজও হয় না আজকাল। এখন দেখাশুনো, কথাবার্তা সব আড়ালে, সব রাত্রির অন্ধকারে। আনন্দ, উত্তেজনা আর ভয়ের একটা গুরুভার যেন সব সময়ে হৃৎপিণ্ডের ওপর চেপে বসে থাকে এখন। ফাঁসিকাঠের জ্যোতির্ময় পথটা ক্রমশ যেন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে দৃষ্টির সামনে। পরিমলের সঙ্গে একবার দেখা করা জরুরি দরকার।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, শীতের আকাশে জমেছে খানিকটা থমথমে বাদলের সংকেত। বিদ্যুতের রক্তাক্ত কশা তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে একপাল পাগলা হাতীর মতো একদল ঝোড়ো মেঘকে।

বাড়ী থেকে বেরুনো দরকার। কিন্তু এখন আর শাসন নেই তেমন। ছ' মাস আগে বেদনাভরা বন্ধনমুক্তি হয়ে গেছে, তিন দিনের জ্বরে মা হারিয়ে গেলেন। সেই থেকে বাবারও কী হয়েছে—বাইরে বাইরেই ঘোরেন, বাড়ীতে আসেন মাসে দুদিন কি একদিন! দাদা তার থিয়েটারের রিহার্সাল নিয়ে ব্যস্ত, মেজদা বরাবর কলকাতায় মামার কাছে থেকে লেখাপড়া করে—সেও ছুটি-ছাটায় আসে এখানে। বাড়ীতে ছোট বোনেরা আর ঠাকুরমা ছাড়া তত্ত্বাবধানের লোক নেই কেউ। কিন্তু ঠাকুরমা। দুবেলা পা ছড়িয়ে বসে তাঁর কান্না চলে মায়ের জন্যে। মাকে হারানোর চাইতে ও কান্নাটাকে আরো বেশি অসহ্য, আরো দুঃসহ মনে হয়।

তবু একদিক থেকে এই ভালো। অবাধ মুক্তি—স্বাধীনতা। যতক্ষণ খুশি বাইরে থাকো, যেখানে খুশি যাও। তিরিশ সালের বন্যার ঘর থেকে বেরিয়ে যাত্রা করতে চেয়েছিল সমুদ্রের অভিসারে, বিপ্লবীর আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল সব কিছু বাঁধনকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে অজানিতের স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়তে। সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। মায়ের জন্য অসহ্য কষ্ট হয় মধ্যে মধ্যে, ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে এক একদিন রাত্রে—তবু এই ভালো। অনেকটা ক্ষতিকে মেনে না নিলে অনেক বড়কে পাওয়া যায় না, মহত্তর দুঃখই তো বয়ে আনে মহত্তম গৌরব।

তাই আকাশে মেঘ দেখেও বেরিয়ে পড়ল। ঠাকুরমা যথানিয়মে তাঁর বিলাপ আরম্ভ করে দিয়েছেন। ওই কান্নাটা যেন মাথার মধ্যে হাতুড়ি ঠোকার মতো আঘাত করতে থাকে। মানুষ মরলে আর ফিরে আসে

না। তবু ওই কান্নার জের টেনে কেন এই ব্যর্থ শোককে জীইয়ে রাখা? কী সার্থকতা আছে—যে ক্ষত আপনা থেকেই শুকিয়ে আসছে তাকে বারে বারে খোঁচা দিয়ে রক্তাক্ত করবার?

পথ অন্ধকার। শীতের ঠাণ্ডা হওয়া ভিজে ভিজে লাগছে—তারই ঝাপটায় বোধ হয় নিবে গেছে রাস্তার আলোগুলো। বিদ্যুতের হাসি চমকে চমকে উঠছে। গুর্ গুর্ করে মেঘের একটা ছোট ডাক কানে এল।

সব মৃত্যুই কি মনে রাখবার মতো? অন্যমনস্ক ভাবে চলতে লাগল রঞ্জন। জীবনে প্রথম মৃত্যুর অভিজ্ঞতা সে দেখেছে অবিনাশবাবুর ভেতরে, মৃত্যুর মৃত্যুহীন কাহিনী পড়েছে 'শহীদ সত্যেন', 'ফাঁসীর ডাক'—আরো অজস্র বইয়ের পাতায় পাতায়। সে মৃত্যু দেয় বাঁচবার প্রেরণা, দশজন দেশকর্মীর বুকের রক্ত দিয়ে গড়ে ওঠে দশলক্ষ পরাধীন মানুষের মুক্তির অমৃতরসায়ন। কিন্তু যার মৃত্যু শুধুই ব্যথা মাত্র, তাতে করে দুঃখ ছাড়া আর কোনো পাথেয়ই তো মেলে না।

ভুলে যাওয়াই ভালো। কিন্তু ঠাকুরমা ভুলতে পারে না, ভুলতে দেনও না কাউকে।

—টিপ্ টিপ্ টিপ্—

বৃষ্টি নামছে। শীতের বৃষ্টি, ভিজলেই নিমোনিয়া। প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ঢুকল পরিমলদের বাইরের ঘরে। আর ঘরে পা দিতেই বাগানের হেনার ঝাড়ের ওপর বৃষ্টির জোর ঝাপটা এসে আছড়ে পড়ল, একটু দেরী করলেই ভিজিয়ে একেবারে ভূত করে দিত।

বাইরের ঘরটা প্রায় খালি। উঁচু একটা লম্বা তেপায়ার মাথায় ঘষা-কাচে ঘেরা বিচিত্র চেহারার একটা আলো জ্বলছে—সেই আলোয় যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে নৃত্যরত নটরাজের ব্রোঞ্জ মূর্তিটা। আর বাইরের সদ্য বৃষ্টিভেজা ধুলোর গন্ধের সঙ্গে ঘরের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে মহীশূর চন্দনের সৌরভ। অস্বস্তি ভরা বাড়ি—পা দিতেই বিশ্রী লাগে।

আলোর ঠিক নিচে সেটিতে হেলান দিয়ে শুয়ে বন্দিনী রাজকন্যা; ওকে ঢুকতে দেখে বইটা নামিয়ে রেখে মিষ্টি করে হাসল।

—খুব বেঁচে গেছো, একটু হলেই ভিজিয়ে দিত।

—হুঁ—বড় জোর বৃষ্টিটা এসে পড়েছে—রঞ্জন পাশের একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

তেমনি হেসে মিতা বলল, তারপর এই বৃষ্টির মধ্যে কী মনে করে?

—কয়েকটা জরুরি কথা আছে। পরিমল কোথায়?

—দাদা তো বাড়িতে নেই।

—বাড়িতে নেই ? কোথায় বেরিয়েছে ?

—বাবার সঙ্গে। বাবা গাড়ি নিয়ে ওঁর এক মক্কেলের বাড়িতে গেছেন নরোত্তমপুরে—সেখানে নেমন্তন্ন আছে। দাদাকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। ফিরতে রাত হবে—বৃষ্টিবাদলা বেশি হলে আজ নাও ফিরতে পারেন।

—তাই তো !—চিন্তিত মুখে রঞ্জন বললে, কী করা যায় ?

—খুব বিপদে পড়েছ, তাই না ?—মিতা এবার খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল : বেশ হয়েছে। যা বৃষ্টি নেমেছে, সহজে পালাতে পারবে না। আবৃত্তি শোনাও বসে বসে।

—অত সখ নেই আমার—এক্ষুণি বাড়ি যেতে হবে।

—কেন, এত তাড়া কিসের ?

—বাঃ, তাড়া থাকবে না ? আর পনেরো ষোলো দিন বাদে কলেজ খুলছে—কিচ্ছু পড়িনি। ওদিকে একটা পরীক্ষা রয়েছে আবার।

মিতা ভ্রুভঙ্গি করলে : উঃ, কী প্রচণ্ড পাঠানুরাগ। তবু যদি লজিকের খাতায় এক দিস্তা কবিতা না থাকত।

—ফাজলেমি কোরো না এখন, মুড নেই—বিরস ভাবে রঞ্জন বললে, দোহাই লক্ষীটি, চট্‌পট্ একটা ছাতার ব্যবস্থা করো দেখি।

মিতা গম্ভীর হয়ে বললে, ছাতাটাতা নেই আমাদের। তবে আমার একটা প্যারাসোল আছে সেইটে নিতে পারো।

—তা হলে ভিজেই যাবো আমি—বীরের মতো উঠে দাঁড়ালো সে।

—থাক, অত বীরত্বে কাজ নেই—মিতা কৌতুকভরা গলায় বললে, ফলটা তো জানি। স্রেফ দশটি দিন বিছানায় পড়ে থাকতে হবে। কেমন বৃষ্টি নেমেছে দেখছ না ?

সত্যি কালো আকাশটা যেন গলে গলে পড়ছে আজ। বাইরের হেনার কুঞ্জে উদ্দাম মাতামাতি। জল আর বাতাসের গর্জন উঠছে ক্ষ্যাপা কতগুলো জানোয়ারের আর্তনাদের মতো। বিদ্যুতের আলোর কোটি অভ্রের তীরের মতো ঝলকে উঠছে বর্ষার ধারা। ছাতাও কোনো কাজ দেবে না এখন।

মিতা বললে, দেখছ তো ?

—হুঁ।

—তা হলে ?

—তাই তো।—মিতার মুখের দিকে বিব্রত জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকালো রঞ্জন,

আর তখনই দৃষ্টিটা সেইখানেই রইল স্থির হয়ে।

হঠাৎ যেন 'ফেয়ারি টেলসে'র একটা ছবি দেখল ঘষা কাচের বাতিটার আলোতে। পাতলা ঠোঁট দুটিতে ছোট হাসির রেখা, দুটি চোখে বিদ্যুতের চুরি করা আলো, স্বর্ণরেখা দুখানি হাত যেন ঘরের ভেতরে সাজানো ওই সব মূর্তিগুলোর মতো শ্বেত পাথরে নিখুঁতভাবে খোদাই করা। ফিকে লাল রঙের শাড়ী সে ছবিখানার পটভূমি।

পশমী ফিতে বাঁধা একটা বেণী গলার পাশ দিয়ে ঘুরে তার বুকের ওপরে এসে পড়েছে, দু আঙুলে সেই বেণীটা নিয়ে খেলছে সে।

বাইরের বৃষ্টির শব্দ। ঘরের ভেতরে ধূপের গন্ধ। রঙীন ছবি। এক মুহূর্তে সবটা মিলিয়ে যেন কেমন অবাস্তব বলে মনে হল তার। অকারণে ইচ্ছে করতে লাগল ওই ছবিটাকে যেন স্পর্শ করে, ওই হাত দুটো হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে দেখে সত্যিই তাদের প্রাণ আছে কি না। সত্যিই কি ওটা একটা ডল পুতুল না বন্দিনী রাজকন্যা?

ওর দৃষ্টি লক্ষ্য করে মিতা হঠাৎ লজ্জা পেল।

—রঞ্জনদা?

—উঁ,—ঘোর ভেঙে লজ্জিত মানুষটি জেগে উঠল।

—কী ভাবছিলে? নরম গলায় জানতে চাইলে মিতা।

কিন্তু এতক্ষণে নিজের অপরাধ সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছে সে। না—এ ভালো কথা নয়। মিতাকে দেখলে এ যে কী একটা বিপর্যয় ঘটে যায় নিজের ভেতর—নিজেই বুঝতে পারে না সে। মনে হয় পুলিশের ভয়ের চাইতেও আরো একটা বড় ভয় আছে কোথাও, আছে আরো কোনো ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা। কী যেন এসে শরীরটাকে আচ্ছন্ন করে ধরে, বছর দুই আগে না জেনে এক গ্লাস সিদ্ধি খাওয়ার পরে যেমন হয়েছিল, তেমনি ঘোর ঘোর লাগে সমস্ত চেতনায়। আর তাই থেকেই কি আসে ওই স্বপ্ন? ছেলেবেলার উষার সঙ্গে একাকার হয়ে যায় সংঘমিত্রার মুখখানা, কল্পনা জাগে বুড়ীবালামের ধারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রাণ দিতে?

অসীম লজ্জায় ভাবতে লাগল এ বাড়িতে আর আসবে না সে। আর কখনো মুখ তুলে চাইবে না ওই মেয়েটির দিকে। মনে হচ্ছে, কাজটা ঠিক নয়, কোথাও একটা অপরাধ লুকিয়ে আছে এর আড়ালে।

—রঞ্জনদা?

—অ্যাঁ?

—আবৃত্তি করবে না ?

—ভালো লাগছে না।

—ওঃ—মিতাও চুপ করে রইল। তারও যেন রঞ্জুর মনের ছোঁয়া লেগেছে, সেও বুঝি স্পষ্ট করে কিছু একটা বুঝতে পেরেছে। দুজনেই বসে রইল মাথা নিচু করে, শুধু থেকে থেকে আঙুলে বেণীটাকে জড়িয়ে চলল মিতা।

—ইস্—বৃষ্টির ছাট আসছে যে—

মিতা এগিয়ে এসেছে এ পাশের বড় জানালাটা বন্ধ করে দিতে। কিন্তু জানালার কব্জায় কেমন মরচে পড়ে শক্ত হয়ে গেছে, কিছুতেই সেটা বন্ধ হয় না।

—সরো আমি দেখছি—

উঠে পড়ল রঞ্জন : সরো—

জানালাটা এবার বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে গেল ঘটনাটা। কেমন করে তার হাতের মধ্যে যে আর একখানা হাত এসে পড়ল কে জানে। মুঠোর ভেতর সে হাতখানা যেন গলে গেল মাখনের মতো।

শরীরে বিদ্যুৎ চমকে গেল, আকাশে বিদ্যুৎ চমকে গেল মিতার মুখের ওপর ধারালো ঝলক দিয়ে। রঞ্জু টের পেল, তার হাতের মধ্যে ছোট পাখির মতো একখানা হাত কাঁপছে, মিতাও কি কাঁপছে ?

—ছিঃ—এ কি হচ্ছে !

মনের মধ্যে বেণুদার গর্জন শোনা গেল, আকাশে শোনা গেল মেঘের ধমকানি! এবার রঞ্জুও কেঁপে উঠল। হাত ধরেনি, একটা সাপ ধরেছে মুঠোর মধ্যে। চকিতে হাতটা ছেড়ে দিয়ে দরজা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল, দাঁড়ালো এসে বৃষ্টির ছাটলাগা অন্ধকার বারান্দাটায়। ঘরের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়াটা কী হয়েছে দেখবার জন্য পেছন ফিরে একবারও সে তাকাতে পারল না আর।

—পনেরো—

'সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।' পদ্মার পাড়ে নির্জন ক্যাম্পে বসে ভাবছে রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

নানা রঙের দিন। উদয়াস্তের সীমা-চিহ্ন দিয়ে আঁকা। এক একটি দিন যেন একটি করে পর্দা সরিয়ে নিয়েছে আরো গভীর, আরো নিবিড়, আরো

বিচিত্র এক একটি অজানিতের ওপর থেকে। প্রতিদিন নিজেকে আবিষ্কার করা হয়েছে তিলে তিলে, নিজেকে জানার সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশি করে জেনেছি পৃথিবীকেও। আমি এলাম, আমি দেখলাম, আমি জানলাম।

'আমার চেতনার পান্নার রঙে পৃথিবী হল সবুজ,' রবীন্দ্রনাথের কথা। শুধু চেতনার পান্নার রঙ নয়, চুণীর রঙও বটে। দিকে দিকে দেশে দেশে সবুজ মাটির ওপর ক্ষরিত হয়ে পড়েছে চুণীর মতো, পদ্মরাগের মতো মানুষের রক্ত। এশিয়ায়, আফ্রিকায়, ইয়োরোপের দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর ওপর। আমেরিকার কালো নিগ্রোদের কালো রক্তে তৈরী হচ্ছে পীচের পথ, ডেট্রয়েটের মোটরের পেট্রল যোগাচ্ছে রক্তের নির্যাস। তাই চামড়া বাঁচাবার জন্য একদল হয়েছে পোষা বুলডগ, আর একদল নীরক্ত বর্ণহীন একসার ছায়ামূর্তি। শুধু সুড়ঙ্গের অন্ধকারে, কালো অরণ্যের ছায়ায়, কারাগারের আড়ালে, দ্বীপান্তরের ওপারে জন কয়েক সত্যিকারের মানুষ তপস্যা করে চলেছে; প্রতীক্ষা করে চলেছে রক্ত-সমুদ্রে অবগাহন করে সভ্যতার দিকচক্রে কবে দেখা দেবে নতুন সূর্য। তাদের চেতনার পান্নার রঙে উদ্ভাসিত হয়েছে নতুন পৃথিবী। চুণীর রক্তরাগ মুছে গেছে, সবুজ আর নতুন ফসলে ভরা রক্তের মালিন্যহীন উত্তর সাগর দক্ষিণ সাগর পরিব্যাপ্ত মহাপৃথিবী।

কিন্তু সে কবে? কত দেরী তার?

নানা রঙের দিনগুলি তার উত্তর এনেছে নানা ভাবে। কখনো আশার উত্তেজনায় দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠেছে হৃৎপিণ্ড, মনে হয়েছে নতুন উষার স্বর্ণদ্বার খুলে যেতে আর তো দেরী নেই। 'বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না এত ঋণ?' জালিয়ানওয়ালাবাগে যত রক্ত ঝরেছে, তার হিসেবনিকেশ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ চট্টগ্রাম। আয়ার্ল্যাণ্ড ছেড়ে একদিন মানে মানে পালাতে পথ পায়নি ইংরেজ; আমেরিকায় ঘাড় ধাক্কা খেয়ে সিংহের জাতি একদিন ভীরু কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে পাড়ি দিয়েছে আটলান্টিক; বুয়র যুদ্ধে সামান্য কয়েকজন চাষার বলিষ্ঠ প্রতিরোধের গর্জনে 'রুল্ ব্রিটানিয়ার' জয়সঙ্গীত আপনা থেকেই রুদ্ধকণ্ঠ হয়ে গেছে।

আমরাও পারব। নিশ্চয় পারব। এত বড় ভারতবর্ষ আমাদের, এই কোটি কোটি মানুষের দেশ। আজ যারা ঘুমিয়ে আছে, রুদ্রভৈরবের পদাঘাতে তারা জাগবেই। সব্যসাচী দুঃখ করেছিল: কসাইখানা থেকে গোরুর মাংস গোরুতেই বয়ে আনে, বিদেশীর হুকুমে দেশের মানুষই দেশ-প্রেমীর গলায় পরিয়ে দেয় ফাঁসির দড়ি। কিন্তু এ দুঃখও একদিন থাকবে না।

নিজেদের অপরাধ, নিজেদের লজ্জার ভারে তারা একদিন মিশে যাবে মাটিতে। 'জাগবে ঈশান, বাজাবে বিষাণ, পুড়বে সকল বন্ধ'—

তবুও—

দ্বিধা আসে। কতটুকু শক্তি আমাদের, কীই বা সামর্থ্য। বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স তার সংশোধিত ফৌজদারী আইনের নাম নিয়ে তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে দিকে দিকে। কতটুকু দাম বিনয় বসু, দীনেশ মজুমদার, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, দীনেশ গুপ্ত অথবা প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের আত্মদানের? কোন্ মূল্য আছে অনন্তহরি, প্রমোদরঞ্জন, কাকোরীর রাজেন লাহিড়ী, আসফাকউল্লা আর লাহোরের ভগৎসিংহের আত্মবলির? দেশের সাধারণ মানুষ—যাদের নিয়ে দেশ; যাদের মুক্তি দেবার আকুল আকাঙ্ক্ষায় আমরা ঘর ছাড়লাম, কী কৃতজ্ঞতা পেলাম তাদের কাছ থেকে? সুযোগ সুবিধে পেলেই তারা ইন্‌ফর্মার হয়, নেত্র সেনের মতো অবলীলাক্রমে ধরিয়ে দেয় পুলিশের হাতে, ভারতবাসী আই-বি পুলিশ মিথ্যে ষড়যন্ত্র মামলা তৈরী করে, সওয়াল করে ভারতবাসী পাবলিক্ প্রসিকিউটার, শাস্তি দেয় কালো বিচারক। তবে কার জন্য এই স্বাধীনতা সংগ্রাম, কিসের সমর্থনে?

বছর দেড়েক আগে একটা বিচিত্র বই পড়েছে রঞ্জন। নতুন নেতার হাতে গড়া একটা দেশ। অদ্ভুত বই। কথাগুলো ভালো বোঝা যায় নি। যিনি লিখেছেন তিনি ভালো করে বোঝাতেও পারেন নি। তবু চমক লেগেছে। সমস্ত মানুষের রাষ্ট্র, তোমার আমার চাষার শ্রমিকের সকলের গড়া রাষ্ট্র। ছোট বড় কেউ কোথাও নেই। সকলের জন্যই সেখানে সব।

বিশ্বাস হয়নি। রূপকথার গল্পের চেয়েও আরো অবিশ্বাস্য আর অসম্ভব বলে মনে হয়েছে সে লেখা। এ কি সম্ভব? এমন কি হতে পারে? তোমার আমার সকলের দেশ! কেউ বড়লোক নেই, কেউ ছোট নয় কারুর চাইতে। এ কী করে হয়?

বেণুদাকে প্রশ্ন করেছিল: এ কী করে হয়?

বেণুদা বলেছিলেন, ঠিক জানি না।

—আপনার মনে হয় সম্ভব?

—ঠিক ভেবে দেখিনি এখনো।—অনাসক্তভাবে বেণুদা জবাব দিয়েছিলেন: তবে যতটা শুনেছি—ওরা একটা এক্সপেরিমেণ্ট করছে রাশিয়ায়। তার ফল কী হবে তা অবশ্য এখনো নিশ্চয় করে বলা শক্ত।

—কিন্তু কী চমৎকার!—উচ্ছ্বসিত ভাবে রঞ্জন বলেছিল: যদি এ সম্ভব হয়—

বেণুদা চিন্তিত মুখে বলেছিলেন: যতটা ভাবছ অত চমৎকার হয়তো নয়। ও সম্বন্ধে দু একটা লেখা আমি হালে পড়েছি ইংরেজি কাগজে। ওরা নাকি সাম্যবাদের নামে মানুষের ওপরে বড় বেশি অত্যাচার করছে। ঘর থেকে নিরীহ মানুষকে পথে বের করে দিচ্ছে, টাকা পয়সা লুঠ করছে। এমন কি মেয়েদের সতীত্বের মূল্য পর্যন্ত রাখছে না, তাদেরও সোসিয়ালাইজড্ করে ফেলেছে।

রঞ্জন শিউরে উঠল।

কী ভয়ানক!

বেণুদা বললেন, হ্যাঁ, ইংরেজী কাগজগুলো তাই লিখছে। আরো বলছে যে ওদের যিনি সত্যিকারের নেতা ছিলেন, মতভেদ হয়েছে বলে চক্রান্ত করে দেশ থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কাজেই এখনি এত খুশি হয়ো না, পৃথিবীর লোকেরা কেউই ওদের ভালো বলছে না।

রঞ্জন চুপ করে রইল। কেমন ব্যথাবোধ হয়, কেমন যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। বিমলির প্রসঙ্গ তুলে ভোনার দল যেমন একদিন কালি ছিটিয়ে দিয়েছিল মালঞ্চমালার স্বপ্নে, তেমনি করে এই নতুন স্বপ্ন-বিলাসকেও যেন কলঙ্কিত করে দিলেন বেণুদা। মেয়েদের সতীত্বের যারা মূল্য দেয় না, তাদের সাম্যবাদের কী দাম?

তবু—

তবু শুধু ওইটুকু বাদ দিলে কী চমৎকার হত। বড় লোকের টাকা পয়সা কেড়ে নিক, কোনো আপত্তি নেই তার—হালদার, বিধুবাবু, বাজারের নবীনমাধব সাহা কিংবা মাধোলাল দাগা মাড়োয়াড়ী—এদের সর্বস্ব লুট করে নিলেও খুশি হবে রঞ্জন। শীতের দিনে এই শহরের রাস্তাতেই তো ভিখিরীকে ঠাণ্ডায় জমে মরে যেতে দেখেছে সে—কী ক্ষতি হয় রামনগর জমিদার বাড়িটাকে দখল করে ওখানে ওই সব ঘর-ছাড়া মানুষের মাথা গোঁজবার ঠাঁই করে দিলে? আমার রাষ্ট্র—এ বোধ যদি ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি লোকের প্রাণের মধ্যে সজাগ হয়ে উঠত! কত বড় কাজ হত তা হলে, কত সহজ হয়ে যেত!

কিন্তু ওই সতীত্বের কথা! সব আলোকে যেন কালো করে দেয়।

—আর—বেণুদা বলেছিলেন: ওসব বড় বড় কথা ভাববার সময় আমাদের নেই এখন। আগে তো ইংরেজ তাড়াতে হবে। তারপর দেখা যাবে কতটা সম্ভব ও সমস্ত।

তা তো বটে। কিন্তু ইংরেজ তাড়ানো কী সোজা? কত অস্ত্র, কত সৈন্য-সামন্ত কত বড় প্রতিরোধ। তার সামনে কী করে দাঁড়াবে তারা, বাধা দেবে কোন্ শক্তিতে? তিরিশ সালের বন্যার মতো তিরিশের অহিংস আন্দোলনও শুধু কতগুলো অপমৃত্যুরই স্বাক্ষর রেখে গেল, তার বেশি কিছুই না। এ রক্তের বন্যাও কী শেষ পর্যন্ত তাই হবে? বারে বারে যেমন ব্যর্থ হয়েছে—ব্যর্থ হয়েছে গদর দলের অভিযান, সিপাহী ব্যারাকে পিংলের বিদ্রোহের চেষ্টা, রাসবিহারী ঘোষ, বাঘা যতীনের আপ্রাণ প্রয়াস—আর চট্টগ্রামের প্রাণবলি?

—নাঃ—

নিজের মনকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে রঞ্জন। বিপ্লবের রঙীন স্বপ্ন কাজের জটিল পথে এসে ঘা খাচ্ছে বারে বারে। ক্লান্তি, হতাশা, নৈরাশ্য। মৃত্যুর রোমান্স্ কেটে গেছে, মাঝে মাঝে পীড়িত বোধ হয় নিজেকে। কতদিন চলবে এইভাবে? শুধু চোরের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে চলা, শুধু ফিস্ফিস্ করে কথা বলা, বড় জোর দুটো একটা ডাকাতি আর দিনরাত পৃথিবীশুদ্ধ মানুষকে অবিশ্বাস করে চলা?

দেশের কাজ করছি, অথচ সমস্ত দেশ বাধা দিচ্ছে—আশ্চর্য!

উনিশশো তিরিশের আন্দোলন তো এ বাধা দেয়নি। লম্পট ব্রিজবিহারী থেকে শুরু করে রেল ষ্টেশনের কুলি পর্যন্ত সাড়া দিয়েছিল সেদিন—এমন কি, ভোনার মতো ছেলেও দেশমায়ের বন্দনা গেয়েছিল: 'তু হামারা দিল্‌কা রোশনী, তু হামারা জান'—

তবে? এই রক্তঝরা পথে তারা নেই কেন? ভয় পায়? তাও তো বিশ্বাস হয় না। সেই মদের দোকানের সামনে বোতলের ঘা খেয়ে যার মাথা ফেটেছিল, ক্লাসের সেরা ছেলে মৃগাঙ্ক—যে পুলিশের লাঠির মুখে সকলের আগে গিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিল, তারা কি তাদের চাইতেও কাপুরুষ? তবে? অথচ সে পথেও কি দেশ তার সব প্রশ্নের জবাব পেল? না, পায়নি। সে তো মৃগাঙ্কই বলেছে পরিষ্কার ভাষায়: কেন বুঝিনি চৌরিচৌরার অর্থ, বার্দৌলির মানে?

কী চৌরিচৌরা, কোথায় বার্দৌলির, মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে কেন অমন তীব্র অসন্তোষ আর বিক্ষোভ মৃগাঙ্কের মনে, কেন আর একবার চীৎকার করে সে বলেছিল: It is a betrayal, betrayal to Revolution?

আজকের রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় উত্তর পেয়েছে তার, নিঃসঙ্গ এই অন্তরীণ-বন্দী

জেনেছে সে সত্যকে। কিন্তু সেদিনের রঞ্জু জানত। কেউ জানায়নি তাকে।

ওই বইটাই মাথায় মধ্যে ঘোরে। যদি ওরকম হত—সমস্ত মানুষের রাষ্ট্রে ছোট বড়ো সব মানুষ একসঙ্গে এগিয়ে আসত লড়াইয়ের জন্যে? কত সোজা হয়ে যেত এই কাজ। এই রক্তঝরা জটিল নিঃশব্দ যাত্রা যদি রূপায়িত হত লক্ষ কোটি মানুষের জয়যাত্রায়?

'আয় আয় আয় ডাকিতেছি সবে, আসিতেছে সবে ছুটে'—

গুরু গোবিন্দ। রাশিয়ার লেনিন। কিন্তু এ দেশে কে আছে? কে দেশের সব মানুষকে এনে ফেলতে পারে এক মহাবিপ্লবের প্রাণ-বন্যায়?

ধ্যেৎ? সব বাজে। মনের মধ্যে পেছিয়ে পড়ার পঙ্গু ভাববিলাস। এ হওয়া উচিত নয় কিছুতেই। এর পেছনে কি আছে করুণাদির সেই দুর্বোধ্য কথাগুলোর কোনো প্রেরণা? কবি-শিল্পীর জন্য এই ক্রান্তির কালো মেঘ নয়, তার শুধু সৃষ্টি, শুধু গান, শুধু সঙ্কল্প?

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথাও তো মনে পড়ে। 'কবি, তবে উঠে এসো যদি থাকে প্রাণ'—

তবু করুণাদিকে ভোলা যায় না। ওই কথাগুলোর আড়াল থেকে কী একটা উঁকি দেয়, মনকে যেন পিনের ঘা দিয়ে খুঁচিয়ে তুলতে থাকে। কিসের ব্যর্থতা করুণাদির? এই বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগটাই বা কোন্‌খানে? বেণুদার বোনের মুখে এই নৈরাশ্যবাদ মনে হয় অবোধ্য, মনে হয় প্রহেলিকার মতো।

আর তা ছাড়া তার কবিতার সত্যিকারের মর্যাদা তো পেয়েছে সে। বিপ্লবী বাংলার কবি—এই সম্মান তাকে দিয়েছে আর একজন, দিয়েছে তার প্রতিভার সব চেয়ে বড় পুরস্কার।

হঠাৎ ছলাৎ ছলাৎ করে উঠল বুক।

না—মিতা নয়। এবার থেকে মিতাকে সে মুছেই ফেলে দেবে মন থেকে। সেই বর্ষার সন্ধ্যা। আচমকা একটা ঝোড়ো বাতাসের ঝাপটায় ছবির হাতখানা ফুলের মালা হয়ে রঞ্জুর মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছিল। তার চোখদুটি, তার মুখ-খানা। সে তো কোনো বিপ্লবী-নায়িকার নয়, সে মুখের সঙ্গে মিল আছে তার প্রথম বধূ সেই ছোট মেয়ে উষার, সে চোখের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে সূর্যের শেষ আলোয় রাঙা নারিকেল-বীথি মর্মরিত কোনো ড্রাগন-দ্বীপে বন্দিনী রাজকন্যার।

চরিত্রহীন আর বিশ্বাসঘাতকের একই দণ্ড আমরা দিই—সে মৃত্যুদণ্ড!

বেণুদার গলা। গলা নয়, বাঘের গর্জন। কী সাংঘাতিক অপরাধ করতে যাচ্ছিল! সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল থরথর করে। মিত্রা নয়, লেনিনের রাশিয়াও নয়। 'একলা চলো, একলা চলো'—। হাত নয়, সাপ।. নিজেকে বাঁচাও ওই সাপের বিষাক্ত স্পর্শ থেকে!

ইতিমধ্যে একদিন আর একটা ঘটনা ঘটে গেল।

শনিবার। অরোরা বায়োস্কোপ হল থেকে ওরা বেরুল 'জ্যাক অ্যাণ্ড দ বিনষ্ট্রি' আর 'চার্জ অব্ দি লাইট ব্রিগেড্' দেখে। বেশ ছোটখাটো একটি দল ওদের। রঞ্জন, পরিমল, জিমন্যাস্টিক ক্লাবের ষণ্ডা ছেলে রোহিণী আর বিশ্বনাথ।

পরিমল বললে, আয়, একটা করে লেমোনেড্ খাওয়া যাক সবাই।

লেমোনেডের সন্ধানে রেস্তোরাঁর দিকে এগোতেই একটা অপ্রত্যাশিত দৃশ্য। ভেতরের বেঞ্চে চার পাঁচটি ছেলে খুব তরিবৎ করে চা আর চপ-কাটলেট খাচ্ছিল। ওরা অনুশীলনের ছেলে, কাজের চাইতে নাকি চেঁচামেচি ওদের বেশি, আর পুলিশের হাতে বোকার মতো পটাপট ধরা পড়তেও ওরা ওস্তাদ। এ জন্যে রঞ্জনরা ওদের করুণা করে—অশ্রদ্ধাও করে। আর এমনি মজার ব্যাপার, ওরাও নাকি এদের দলের সম্পর্কে ঘোষণা করে থাকে অনুরূপ ধারণা!

ওরা চপ-কাটলেট খাক বা না খাক সেটা বড় কথা নয়। সব চাইতে যেটা আশ্চর্য—তা হল ওদের দলের মধ্যেই বসে আছে অজয় দত্ত।

অজয় দত্ত! ওদের নতুন রিক্রুট ছেলে, সে কেমন করে গিয়ে ভিড়ল অনুশীলনের ওই ছোকরাদের পাল্লায়? লেমোনেড্ আর খাওয়া হল না, এরা কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে সেদিকেই তাকিয়ে রইল!

তারপরে একটা গর্জন করল রোহিণী: হোয়াট ছাট? হাউ ইজ্ ইট?

ক্লাসে বরাবর ইংরেজিতে ফেল করে ছোকরা। তাই গালিগালাজ করবার সময় ইংরেজি ছাড়া তার মুখ দিয়ে আর কিছু বেরুতে চায় না।

অনুশীলনের দলটা মুখ ফিরিয়ে তাকালো এদিকে—দেখল এদের। মুহূর্তের জন্যে অজয় দত্তের মুখ ছাইবর্ণ হয়ে গেল, সে তৎক্ষণাৎ মাথা ঘুরিয়ে নিলে অপরাধীর মতো।

রোহিণী বললে, অজয়, কাম্ অ্যাওয়ে।

ও-দলের মধ্য থেকে একজন উঠে দাঁড়ালো অলসভাবে, একবার আড়মোড়া ভাঙল। তারও জিমন্যাস্টিক-করা শক্ত চেহারা, আড়ে বহরে রোহিণীর

কাছাকাছিই হবে সে। মারামারির ব্যাপারে শহরের নাম করা ছেলে—বিশু নন্দী।

বিশু নন্দীর গায়ে একটা কলারওয়ালা গেঞ্জী—নীচে চওড়া বুকখানা। ক্ষুদে ক্ষুদে চোখে একটা আশ্চর্য উদাসীনতা, খাড়া ছুটো চোয়ালে উদ্ধত খাঁড়ার মতো ভঙ্গি।

বিশু নন্দী শান্ত গলায় বললে, কেটে পড়ো চাঁদ, তোমাদের পাখি পালিয়েছে।—তারপর এমনভাবে হাই তুলল, যেন গোটা কয়েক মাছি তাড়ানোর ব্যাপারে এর চেয়ে বেশি উদ্যম ব্যয় করতে সে রাজী নয়।

রোহিণীর চোখে আগুনের হল্‌কা: নো—সার্টেন্‌লি নট্।

বিশু নন্দী তেম্‌নি শান্ত স্বরে বললে, ইয়েস। তারপর সেনাপতির ভঙ্গিতে ফিরে দাঁড়িয়ে আদেশ করলে, চলো সব। অনুশীলনের দলটা উঠে ওদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পরিমল ডাকলে, অজয়, শোনো।

অজয় জবাব দিলে না, শুনতেই পায়নি যেন। কিন্তু জবাব দিলে বিশু নন্দী। কথা বললে না, তার বদলে মুখ ঘুরিয়ে হো হো করে হেসে উঠল! সে হাসির চাইতে জুতোর ঘা-ও সহ্য করা সহজ। যেন একটা ধারালো র‍্যাঁদা ঘষে ওদের পিঠের চামড়া শুদ্ধ ছুলে দিয়ে গেল একেবারে।

তাও সহ্য হত, কিন্তু বিশু নন্দীর একজন সহচর যাওয়ার আগে মন্তব্য করে গেল: কাওয়ার্ড-পার্টি!

—কাওয়াল-পার্টি! রোহিণী গর্জন করে বললে, দি লাস্ট স্ট্র ইন্ ক্যামেল-ব্যাক্!

ইংরেজিটা ভুল বলেছে রোহিণী, একবার ইচ্ছে করল সংশোধন করে দেয় কথাটাকে। কিন্তু রোহিণীর মুখের দিকে তাকিয়ে তার ভ্রম সংশোধনের সাহস হল না আর। খুন চড়েছে রোহিণীর মাথায়, রক্ত চড়েছে চোখে। দাঁতে দাঁতে একটা অদ্ভুত শব্দ করল সে যেন ধারালো একটা অস্ত্র দিয়ে কেউ আঁচড় কাটছে শক্ত পাথরের গায়ে।

—ফলো মি ফ্রেণ্ডস্—

পরিমল বললে, মারামারি করবে নাকি?

—মারামারি! না তো কি এই ইন্‌সাল্ট পকেটিং করব?

—কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?—জিজ্ঞাসা করল রঞ্জন।

—কাউয়ার্ডস্ গো ব্যাক।—খোলার ওপর থেকে ছিটকে পড়া খইয়ের

মতো জবাব দিলে রোহিণী: আমাকে গাল দিলে আমি ডাইজেস্ট করতে পারতাম, কিন্তু তাই বলে পার্টিকে অপমান? দে উইল হ্যাভ্ এ গুড্ লেসন!

—তবু—

—নো—নো!—রোহিণী এবারে হুঙ্কার ছাড়ল: রিভেঞ্জ চাই। আই হ্যাভ লস্ট মাই টেম্পারেচার—ফলো মি অর গো ব্যাক্।

কথাটা টেম্পারেচার নয়, টেম্পার—রঞ্জন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই হন হন করে এগিয়েছে রোহিণী। সুতরাং অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। বুক দুর দুর করছে, কাঁপছে হাত পা। মনে পড়ছে বিশু নন্দীর জল্লাদের মতো চেহারাটা। তবু পেছুলে চলবে না—পার্টিকে অপমান!

পরিমল একবার বললে, কাজটা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু।

রোহিণী শুনতে পেল না, শুনলে ইংরেজি বুকনি ঝেড়ে দিত একটা। কিন্তু বেশি দূর এগোতেও হল না ওদের। সামনেই একটা নির্জন জায়গা, তার ডান দিকে জেলখানার মস্ত মাঠ, বাঁ ধারে প্রকাণ্ড আমের বাগান। সেই আম-বাগানের ভেতরে দিয়ে একটা পায়ে-চলা পথ, পাতার ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো জ্যোৎস্নায় দেখা গেল দলটা চলেছে সেই পথ দিয়ে।

রোহিণী জোর পায়ে হাঁটছিল। প্রায় কাছেই এসে একটা হাঁক দিলে: স্টপ।

ওরা থেমে দাঁড়ালো। আলো-আঁধারিতে দেখা গেল নক্ষত্রগতিতে ফিরে দাঁড়ালো বিশু নন্দী।

রোহিণী বললে, কে বলেছে কাউয়ার্ড পার্টি?

বিশু নন্দী শান্ত গলায় বললে, আমি।

—ড্যাম্ উইথ অনুশীলন পার্টি!—

বিশু নন্দী বললে, কাম অন্!

তারপরেই যা ঘটল সেটা একটু আগেই দেখা চার্জ অব লাইট ব্রিগেডের চাইতেও রোমাঞ্চকর ও ক্ষিপ্র। আকাশ থেকে যেন ঘুষির পর ঘুষি উড়ে লাগল, রঞ্জন চোখ বুজে হাত ছুঁড়ে যেতে লাগল। আঘাত করবার উদ্দেশ্যে নয়, আত্মরক্ষার জন্যে।

বাপ্—

বিশু নন্দী বসে পড়ল মাটিতে। নাক চেপে ধরেছে এক হাতে, বাগানের ফাঁকে ফাঁকে ফিকে ফিকে জ্যোৎস্নায় দেখা গেল তার নাক বেয়ে নেমে আসছে কালো একটা সরু ধারা—রক্ত। রোহিণীও ততক্ষণে মাতালের মতো টলছে।

হঠাৎ কতগুলো মানুষের গলায় আওয়াজ—কারা যেন আসছে। মুহূর্তে দু-দল দু-দিকে প্রাণপণে ছুটতে লাগল, অনেকখানি রাস্তা পালিয়ে পথের ওপর যখন ওরা এসে দাঁড়ালো, তখন ক্ষত-বিক্ষত রোহিণীকে যেন চেনা যায় না। বিশু নন্দীর হাতও ভালোই চলেছে। প্রায় অবরুদ্ধ করে হাঁপাতে হাঁপাতে রোহিণী বললে, খুব শিক্ষা দিয়েছি বাটাদের। কাওয়ার্ডস্।

পরিমল মৃদু হাসল: শিক্ষা কে বেশি পেয়েছে বলা শক্ত। কিন্তু থাক, যথেষ্ট হয়েছে। চলো এবার।

আবার বিষণ্ণ হয়ে গেছে মন।

বিশু নন্দীর দল মার খেয়েছে, মেরেছেও ওদের। একটা শক্তি পরীক্ষা হয়ে গেল। কিন্তু কেন এই মারামারি? কেন এই নিজেদের মধ্যে এমন রুচিহীন বিরোধ? সবাই তো দেশকর্মী, সবাই তো দেশের জন্যে প্রাণ দিতেই এগিয়ে এসেছে। লক্ষ্য এক, পথও এক। তবু এই বিভেদ কেন? কর্মী হিসেবে বিশু নন্দী কোনোদিক থেকেই রোহিণীর চাইতে খাটো নয়, বরং অনেক বড়। অনুশীলন দলের আরো দু-চারজন যাদের সে চিনত, তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কেই শ্রদ্ধা আছে তার। শহরের বহু সেরা ছেলে ওদের দলে, রঞ্জনদের মতোই তারা খাঁটি আর অক্লান্ত কর্মী। তবু কেন এই অশোভন মারামারি? একই পরাধীন দেশের মানুষ, একই শোষণ যন্ত্রে শোষিত হচ্ছে সবাই, একই কাঁটামারা বুটের নিচে দলে যাচ্ছে সকলের হৃৎপিণ্ড। আর তার প্রতিকারের জন্যে একই পথ সকলে বেছে নিয়েছে। তবে?

প্রতি পদে পদে বিরোধ। সেই বইতে পড়া অদ্ভুত মানুষটিকে মনে পড়ে। জাতি-বর্ণ-অর্থগৌরবহীন মানুষের রাষ্ট্র। সে রাষ্ট্র কি গড়ে উঠেছিল এম্‌নি দলাদলি আর বিভেদের মধ্যে দিয়েই? কে জানে!

বাড়ি ফেরার পথে পরিমলকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা ভাই, একি ভালো?

পরিমল জবাব দিলে, ভালো মন্দ জানি না, এই নিয়ম।

—নিয়ম! নিয়ম কেন?

—তা ছাড়া আর কী? আমরা ভালো ছেলে রিক্রুট করব, তাকে ওরা ভাঙিয়ে নেবে? আর আমরা সয়ে যাব সেটা?

—তাই বলে নিজেদের মধ্যে এভাবে মারামারি করতে হবে?

স্বরে বেদনা প্রকাশ পেল তার।

—মারামারি তো ভালো, খুনোখুনি পর্যন্ত হয়ে যায় কোথাও কোথাও। চট্টগ্রামে তো মেরেই ফেলল একটি ছেলেকে।

—সর্বনাশ!—রঞ্জন শিউরে উঠল।

—কেন, ভয় করছে নাকি বিশু নন্দীকে?—পরিমল খোঁচা দিয়ে হাসল।

—না, বিশু নন্দীকে ভয় নয়—রঞ্জন গম্ভীর হয়ে গেল: নিজেদের জন্যেই ভয় করছে। এইভাবে মারামারি করতে থাকলে সব উৎসাহ যে এখানেই শেষ হয়ে যাবে। তারপর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধটা হবে কেমন করে?

—সে ভাবনা দাদারা ভাববেন, আমরা নই।

তা বটে, দাদারা ভাববেন। এতদিনে এ সত্যটা অন্তত আবিষ্কার করেছে যে তাদের ভাববার জন্যে বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই আর—সে দায়িত্ব দাদারাই মাথায় তুলে নিয়েছেন। তারা শুধুই সৈনিক, ভাববার দায় তাদের নয়, তাদের কর্তব্য শুধু আদেশ পালন করে যাওয়া। চিঠি দিয়ে এসো, অমুকের সঙ্গে দেখা করে অমুক খবরটা দিয়ে এসো, সাইকেল চুরি করো, বন্দুক চুরি করো, আর এক আধটা বড় কাজ—যেন হালদারের ওপরে এক হাত নেওয়া—এ জাতীয় সুযোগ কখনো কখনো যদি জুটে যায় তবে তার চাইতে সৌভাগ্যের কথা আর কিছুই নেই।

প্রশ্ন কোরো না, কৌতূহল পোষণ কোরো না মনের মধ্যে। শুধু মন্ত্রগুপ্তি, শুধু আয়রণ ডিসিপ্লিন। কিন্তু তবুও প্রশ্ন আসে, নির্বোধ মন জর্জরিত হয় কৌতূহলের তাড়নায়। আর জেগে থাকে অস্বস্তি, অতি তীব্র অস্বস্তি। অস্বীকার করে লাভ নেই, খানিকটা আশাভঙ্গ হয়েছে যেন? কল্পনা-প্রখর অনুভূতি-স্পন্দিত তার চেতনা; জীবনের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল দূরচারী রূপকথার জগতে বন্ধনবিহীন যাত্রার স্বপ্নাতুর সম্ভাবনায়। এলেন অবিনাশবাবু, সেই স্বপ্নে এনে দিলেন আর এক অদেখা সমুদ্রের আলোড়ন। বকুল বনের গন্ধভরা ছায়ার নিচে ঘাসের ওপর বসে অশ্বিনী শুনিয়েছিল 'নিখিলিস্ট্' আর ক্ষুদিরামের গল্প—সে তো আরো আশ্চর্য রূপকথা। তারপর এল তিরিশ সালের বন্যা। সেই বন্যায় মন ভেসে গেল—সেই বন্যা তাকে প্রথম ডাক দিলে সর্বনাশা ভাঙনের অভিসারে, সর্বধ্বংসী একটা বিপুল প্রবাহে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার দুরন্ত প্রেরণায়। আর সেই বন্যারই জীবন্ত-রূপ সে দেখল উনিশ শো তিরিশ সালে। উনিশ শো তিরিশ সাল। অন্নপূর্ণা ভারতবর্ষে দেখা দিলেন রুধিরাপ্লুতা ছিন্নমস্তারূপিণী হয়ে।

এল পরিমল। শোনালো জ্যোতির্ময় আকাশ-গঙ্গার বাণী—যেখানে রিভলভারের মুখে ছুরির ফলার মতো ধারালো নীল আগুন, যেখানে রক্তের প্রবাহে শতদলের মতো ফুটে আছে শত শহীদের বিদীর্ণ হৃৎপিণ্ড, যেখানে

বীরের কণ্ঠে বরণের মণি-মালিকার মতো ডাক পাঠাচ্ছে ফাঁসির রশি। সে কি উন্মাদনা, নিজের বুকের ভেতরে আগ্নেয়গিরির লাভার মতো কী যেন ফেটে পড়তে চায়। টেগরা, বীরেন গুপ্ত, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য—আরো, আরো অনেকে। কিন্তু—

কিন্তু কোথায় সে উত্তেজনা? কোথায় সে কাজের রক্তমাতাল পরিকল্পনা? শুধু কথা, শুধু সতর্কতা, শুধু দুটো একটা অস্ত্র আর কিছু-অর্থ সংগ্রহের আকুলতা। অথচ কত কাজ তো চোখের সামনেই আছে। গুলি করা যায় ওই টিকটিকির সর্দার বুলডগ্ ধনেশ্বরটাকে, অনায়াসেই তাদের স্কুলের প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশনের সময় শেষ করে দেওয়া চলে জেলার শাদা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে, কিন্তু কিছুই হয় না। যথেষ্ট শক্তি আমাদের নেই, এভাবে আমরা নিজেদের ক্ষতি করতে পারি না। শুধু অতি ধীরে অতি সাবধানে চলা।

চট্টগ্রাম?

ওদের কথা আলাদা। বেণুদা জবাব দিয়েছিলেন, একেবারেই আলাদা ব্যাপার ওদের। সব দলগুলোকে ওরা এক সঙ্গে মিলিয়ে অত বড় কাজে হাত দিতে পেরেছিল। তা ছাড়া সব বাছা বাছা নেতা ওদের—ওদের সঙ্গে আমাদের অবস্থার তুলনা হয় না।

কেন হয় না? ভাবতে চেষ্টা করল রঞ্জন। চট্টগ্রাম যদি মিলতে পেরেছিল, তা হলে আমরাই বা পারি না কেন? কোথায় আমাদের বাধে? অনুশীলনের ওরা তো দেশের শত্রু নয়।

না, তা নয়। ওরা ওরাই, 'আমরা আমরাই'—সংক্ষেপে রঞ্জনের সংশয়ের জবাব দিলে পরিমল।

—কিন্তু ওরা আমরা কি কখনো একসঙ্গে মিলতে পারব না?

—সে দাদারা বলতে পারবেন।

বাস্তবিক, যা দাদাদের বলা উচিত, তা আমাদের বলতে চেষ্টা করাটা অনধিকারচর্চা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু মন খুশি হয় না, অনবরত খুঁৎ খুঁৎ করতে থাকে।

—আর এইভাবে মারামারি চালাতে হবে?

—হ্যাঁ দরকার হলে!

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল: এ রকম করে চালালে দেশের স্বাধীনতা শুধু স্বপ্নই থাকবে। কোনোদিনই তা আসবে না—আসতে পারেও না।

—রঞ্জু!

রঞ্জন চমকে উঠল। তীব্র একটা দৃষ্টি পরিমল ফেলেছে তার মুখের ওপর।

থতমত লাগল : অ্যাঁ?

আমাদের অধিকারের একটা সীমা আছে, তা ছাড়িয়ে যেয়ো না।

ঠিক কথা। রঞ্জন রইল চুপ করে।

পরিমল কঠিনভাবে বললে, ওঁরা যা বলবেন আমরা তাই করব। সমালোচনার স্পর্ধা আমাদের মুখে শোভা পায় না। তা ছাড়া এ বিপ্লববাদের পথ, ছেলেখেলা নয়।

পরিমল আর কোনো কথা বললে না, রঞ্জনও না। বলবার কিছু নেই। কিন্তু সত্যিই কি নেই? আদেশ দাও নেতা, আমরা পালন করে যাব। তোমাদের হুকুমে মরণের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে তো সব সময়েই প্রস্তুত আছি! তবু একটি মাত্র জিজ্ঞাসা : এই আত্মবিরোধ, এই দলাদলি—এ কি অনিবার্য?

নাঃ—আর পারা যায় না নিজেকে নিয়ে। বাড়িতে ফিরে ভাবতে লাগল সত্যিই সে অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যায় মাঝে মাঝে। উত্তেজনার খানিকটা ভাবালুতা নিয়ে এ পথে চলা যাবে না, ভাবতে হবে অনেক, বিচার করতে হবে তার চাইতেও অনেক বেশি। ইচ্ছে হলেই তো চারদিকে বিপ্লবের খানিকটা দাবানল জ্বালিয়ে দেওয়া যায় না। তার জন্যে অস্ত্র চাই, চাই প্রস্তুতি।

নিশ্চয় করুণাদির প্রভাব। করুণাদি সম্পর্কে তার মনে যে স্বাভাবিক দুর্বলতা আছে এ সব তারি প্রতিক্রিয়া। সন্ধ্যার অন্ধকারে, টোটা চুরি করার উত্তেজনায় বিপর্যস্ত বিক্ষুব্ধ স্নায়ু নিয়ে তাঁর চোখে সে জল দেখেছিল। আভাস পেয়েছিল তাঁর ব্যক্তিজীবনের অতি গভীর একটা দুর্জ্ঞেয় বেদনার, শুনেছিল তাঁর অশ্রুভরা আকুতি : এ পথ তোমার নয় ভাই—এ তুমি ছেড়ে দাও—

চুলোয় যাক—চুলোয় যাক সমস্ত। অগ্নিদীক্ষা যে নিয়েছে তার আর ফেরবার রাস্তা নেই। হয় মৃত্যু, নয় মুক্তি। নেতার আদেশ। মুক্তি না পাও, মৃত্যুকে বরণ করে নাও।

প্রশ্ন নয়, সংশয়ও না।

করুণাদি? তাঁর স্নেহ?

নিজের মনের জন্যেই তোলা থাক—বিপ্লবী রঞ্জনের জন্যে নয়।

এরই দিন তিনেক বাদে বেণুদা ডেকে পাঠালেন।

—শোনো, একটা জরুরি কাজ করতে হবে তোমাকে।

আগ্রহ-ব্যাকুল মুখে তাকিয়ে রইল রঞ্জন। কাজ করতে হবে। একটা কঠিন, দুরূহ, রোমাঞ্চকর কাজ? রক্ত দিয়ে যা চিহ্নিত, জীবনের মূল্য দিয়ে যা সমাপ্ত করা চলে? সমস্ত প্রাণ দোলা খেয়ে উঠল। এই ছোট ছোট কাজের খুঁটিনাটি নয়, যার ভেতর দিয়ে আত্ম-ঘোষণা আর আত্মপ্রতিষ্ঠা করা চলে—দু-হাত ভরে দাও সেই কাজের গৌরবে।

—পারবে কিনা বুঝতে পারছি না—বেণুদা চিন্তিত আর শান্ত জিজ্ঞাসায় ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—পারব, নিশ্চয়ই পারব।

—বেশ, ভালো কথা। একদিনের জন্যে তোমাকে বাইরে যেতে হবে একটু। বাড়ি থেকে যেতে দেবে?

—তা দেবে।—বিষণ্ণভাবে রঞ্জন হাসল। মা নেই, ঠাকুরমার অবস্থা প্রায় অপ্রকৃতিস্থ; বাবা যেন দিনের পর দিন সন্ন্যাসীর মতো হয়ে যাচ্ছেন। বেদনা-ভরা বন্ধন-মুক্তি ঘটে গেছে তার।

—তা হলে আজ সন্ধ্যা সাতটার ট্রেনে একবার রংপুর যেতে হবে তোমাকে। স্টেশনে একটি মেয়ে আসবে, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, নামিয়ে নেবে রংপুর স্টেশনে। আর কিছুই করতে হবে না। ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করবে, তারপর যে ফেরার ট্রেন পাবে তাইতেই করে চলে আসবে।

—শুধু এই?

—হ্যাঁ, শুধু এই।—রঞ্জনের আশাহত মুখের চেহারাটা লক্ষ্য করে বেণুদা হাসলেন: তাই বলে কাজটা একেবারে বাজে নয়, অত্যন্ত জরুরি। কিছু জিনিসপত্র যাচ্ছে। পারবে তো?

রঞ্জন ঘাড় নাড়ল।

—তবে এই নাও টাকা। বেশিই দিলাম। দুখানা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকেট করবে।

—সেকেণ্ড ক্লাস?

—হ্যাঁ, সেকেণ্ড ক্লাস।—বেণুদার মুখে আবার মৃদু হাসির রেখা দেখা দিলো: অনেকখানি বাজে খরচের পাট বাঁচাতে হলে কখনো কখনো একটু বেশি খরচ করতে হয়। আচ্ছা, যাও তুমি।

রঞ্জন চলে এল। জরুরি কাজের আশ্বাস মিলেছে বটে, কিন্তু খুশি হয়নি মন। পদ্ধতিটাই খারাপ লাগছে। একটা মেয়ের খবরদারী করা, তাকে

যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া। অর্থাৎ যা কিছু গুরুত্ব তা মেয়েটিরই—সে শুধু দেহরক্ষী ছাড়া আর কিছুই নয়।

তা হোক—নিজের ভিতরে আর সে প্রশ্ন তুলবে না। নিজের সংশয়ের ভারটা যেন নিজের মনের ওপরেই প্রতিদিন চেপে বসছে তার। সুতরাং যথাসম্ভব উৎফুল্ল হওয়ার চেষ্টা করলে সে, একটা বৃহৎ এবং মহৎ কাজের অধিকার লাভের গৌরবে অনুপ্রাণিত হতে চাইল।

স্টেশনে এল একটু আগেই, সাড়ে ছটার সময়। দু-খানা টিকিট করে প্ল্যাটফর্মের ওপর পায়চারী করতে লাগল। কিন্তু লোকের ভিড়ে বেশিক্ষণ চলা-ফেরা করতে ভালো লাগে না। ধনেশ্বরের টিকটিকিরা ট্রেনগুলোর ওপর কড়া নজর রাখে তাদের।

হাঁটতে হাঁটতে চলে এল প্ল্যাটফর্মের একটা কোণায়। এদিকটা প্রায় অন্ধকার, স্টেশনের নাম লেখা ঝাপ্‌সা আলোটায় বিশেষ কিছু পরিচ্ছন্ন ভাবে চোখে পড়ে না। শুধু এক পাশে স্তূপাকার প্যাকিং বাক্স পড়ে আছে, আর তাদের ভেতর থেকে উঠছে পচা মাছের একটা চিমসে কটু গন্ধ।

পেছন থেকে কে আস্তে স্পর্শ করল তাকে। চমকে উঠল সে, ফিরে দাঁড়ালো নক্ষত্রবেগে।

একটি দশ বারো বছরের ছোট ছেলে। আস্তে আস্তে বললে, আপনাকে ডাকছে।

—কে?

আঙুল বাড়িয়ে প্যাকিং বাক্সের স্তূপের একদিক দেখিয়ে দিলে ছেলেটি, তারপর চলে গেল জোর পায়ে।

রঞ্জন এগিয়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে প্রায় মিলিয়ে দিয়ে একটি মেয়ে বসে আছে।

—রঞ্জনবাবু?

—হ্যাঁ, আমি।

—টিকেট করেছেন?

—হুঁ।

—ট্রেন এলে গাড়ির সামনে দাঁড়াবেন। আমি উঠলে তার দু-মিনিট পরে উঠবেন অন্তত। এমন ভাব দেখাবেন না, যেন এক সঙ্গে যাচ্ছি আমরা।

—আচ্ছা—

—বেশ, আপনি যান—

রঞ্জন সরে এল। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেও চিনতে ভুল হয়নি তার। ছায়ামূর্তির মতো দেখা দিয়েই সে ছায়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল, পলকের জন্তে যেন ঝলসে উঠেছিল একখানা খাপখোলা তলোয়ার। গলার স্বরে তীক্ষ্ণ তেজস্বিতা, যেন বেণুদার প্রতিধ্বনি। সুতপা।

সুতপা!

করুণাদিকে চেনে, সংঘমিত্রা তার মনে একটা অদ্ভুত অস্বস্তিকর প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এই মেয়ে? এক লহমায় দেখলেই চেনা যায় এ আগুন, এ চট্টগ্রামের প্রীতিলতার দলের। বুড়িবালামের তীরে দাঁড়িয়ে যদি পুলিশের গুলির সামনে কেউ বুক পেতে দিতে পারে তা হলে তা এই মেয়ে পারবে, মিতা নয়। কিন্তু এর পাশে দাঁড়ানো! না—সে জোর নেই তার।

—ঠন্-ঠন্-ঠনা ঠন্—

ঘণ্টা পড়ল—প্রথম ঘণ্টা। প্ল্যাটফর্মের ওপর তেমনি সতর্ক পদচারণা আর মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য করা ধনেশ্বরের লোক কোথাও থাবা গেড়ে অপেক্ষা করছে কিনা। সুতপা! হাতের শেষ আংটি তার মায়ের স্মৃতি চিহ্নও অসংকোচে পার্টির কাজে বিলিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাও তো দেখা দিলে না। নিজের জন্যে কিছু রাখবার নেই, একটুকুও না। অথচ মিতা! পাশাপাশি একটা অবাঞ্ছিত তুলনাবোধ দেখা দিয়ে ভাবনাকে হঠাৎ বিতৃষ্ণ করে তুলল। মিতার সারা গায়ে ঝলমল করছে গয়না, দামী শাড়ী আর সুগন্ধে সে অপরূপ হয়ে আছে। কতটুকু তার ত্যাগ? দেশের সম্পর্কে খানিকটা সৌখীন সহানুভূতি ছাড়া—

অশ্রদ্ধায় মন ভরে গেল। অশ্রদ্ধা এল মিতার ওপর, এল নিজের সম্পর্কেও। মিতা সুন্দর, মিতা অপরূপ, হঠাৎ প্রাণ পেয়ে ওঠা একটা ফেয়ারি টেল্‌স। আবেশ-জাগানো গন্ধ তার চুলে, তার নিঃশ্বাসে। তবু—

মুহূর্তের আচ্ছন্নতায় যেন বিবশ হয়ে আসতে চাইল শরীর। কিন্তু প্রবলভাবে একটা ধিক্কার দিয়ে নিজেকে সজাগ করে তুলল সে। হোক সুন্দর, তবু সে একটা পুতুলের চাইতে তো বেশি নয়। দোলাক মনকে, কিন্তু বিপ্লবীর জীবনে পথ চলার প্রেরণা তো সে দেয় না। সে পরিমলের বোন, তাই তার একমাত্র গৌরব।

—'প্রেরণা দিয়েছে শক্তি দিয়েছে বিজয়লক্ষ্মী নারী'—

নজরুলের লাইন। কিন্তু সে বিজয়লক্ষ্মী কি মিতা? চোখে ঘুম ঘনিয়ে আসে মনে হয়, ওর কথা ভাবতে ইচ্ছে করে সন্ধ্যার আকাশের মোহ জাগানো

'সাতভাই চম্পার' দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। না, কোনো দিন মিতা তরবারি তুলে দেবে না হাতে। কপালে রক্তচন্দন আর মাথায় উষ্ণীষ পরিয়ে তাকে বিদায় দেবে না কোনো জালালাবাদ অথবা বুড়িবালামের কঠিন অভিযাত্রায়। না, মিতাকে তার ঘৃণা করা উচিত। ড্রাগন-দ্বীপের বন্দিনী রাজকন্যা আর বেঁচে নেই—একটা শব ছাড়া সে আব কিছুই নয়।

তবে ?

—ঠন্-ঠন্-ঠনাৎ ঠন্-ন্-ন্—

দু নম্বর ঘণ্টি। চকিত হয়ে উঠল। দূরে সার্চ লাইটের আলো ঝলমলিয়ে উঠেছে, কাঞ্চননদীর ব্রীজে গুম গুম শব্দ। ট্রেণ এসে পড়ল।

ঘটাং ঘট্। লাইন ক্লিয়ার। ঝড়ের মতো শব্দ করে আমিনগাঁ-এলাহাবাদ প্যাসেঞ্জার এসে দাঁড়ালো।

সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট খুঁজে পেতে দেরী হল না। সামনে যেটা সেটাতে কিছু লোক আছে। আর একটু এগিয়ে আর একখানা—একেবারে খালি।

—সরুন, উঠতে দিন—

মেয়েলি গলার ধমক। সরে পাশের ইণ্টার ক্লাশটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো রঞ্জন। পেছন ফিরে একবার তাকিয়েও দেখল না—দেখবার প্রয়োজন নেই। নিরাসক্তভাবে সে অপেক্ষা করতে লাগল, যেন গাড়িটার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই তার।

অল্প স্টপেজ। গণ্ডগোলে আর কুলির চিৎকারে কোথা দিয়ে চলে গেল সময়। গার্ডের বাঁশি বাজল, সাড়া দিলে ইঞ্জিনের হুইশিল, গাড়ি নড়ল। চলন্তি গাড়িটার হাতল ধরে উঠে পড়ল রঞ্জন।

—আসুন, বসুন—

সুতপা ডাকল।

এবারে পরিষ্কার দেখা গেল খাপখোলা তলোয়ারকে। ছোট কামরা, গাড়িতে আর দ্বিতীয় যাত্রী নেই। মুখোমুখি দুখানা লম্বা সিট। ওদিকের সিটে গাড়ির দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছে সুতপা। পা তুলে দিয়েছে বেঞ্চির ওপরে, একখানা শাদা আলোয়ানে ঢেকে নিয়েছে কোমর পর্যন্ত। জানালার ওপর বাহু রেখে কপালের পাশে হাত দিয়ে বসেছে নিশ্চিন্ত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে।

—দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসে পড়ুন।—সুতপা হাসল: দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাড়ি পাহারা দিচ্ছেন নাকি?

—না তা নয়—সপ্রতিভ জবাব দিয়ে সে বসে পড়ল।

মেয়েদের সম্পর্কে এমনিতেই তার সংকোচ বেশি, আর মিতার স্পর্শ সে সংকোচ আরো বেশি বাড়িয়ে তুলেছে আজকাল। কেমন চোখ তুলে তাকাতে পারে না মেয়েদের দিকে, ভয় করে। জাতটাকে সে বুঝতে পারে না, এদের সম্পর্ক রয়েছে তার একটা সভয় জিজ্ঞাসা। হালে মিতা তার এই ভয়টাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

চোরা-চাহনি তুলে একবার দেখে নিলে স্বতপাকে। জানালার বাইরে চেয়ে আছে, দেখছে পেছনে ছিটকে ছিটকে সরে যাওয়া শহরের আলোগুলোকে। চিন্তামগ্ন একটা নিবিষ্ট ভঙ্গি তার। এখানে বসবার সঙ্গে সঙ্গে যেন হারিয়ে ফেলেছে বাইরের পরিবেশকে, তলিয়ে গেছে নিজের একটা অতলস্পর্শ গভীরতার আড়ালে। যেন চারিদিকে রচনা করেছে একটা কঠিন ব্যূহ, একটা দুর্ভেদ্য আবরণ। সে আবরণ ভাঙা যায় না, তার ভেতর দিয়ে ওর কাছে এগোবার মতো এতটুকু পথও খোলা নেই।

চোরাদৃষ্টি ফেলে ফেলে দেখতে লাগল রঞ্জন।

বয়েসে ওদের চাইতে বেশ বড়ই হবে। ঠিক ফর্সা নয়, ঝকঝকে মাজা রঙ। চোখা নাক, টানা টানা চোখ ; পাতলা ঠোঁট দুটো শক্ত ভাবে চাপা, হেলানো গ্রীবায় যেন একটা গর্বিত ভঙ্গি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তার। মাথার চুল বেশি বড় নয়, তাও রুক্ষ, খোঁপাটা ভেঙে কাঁধের উপর আলুথালু হয়ে লুটিয়ে পড়ে আছে। সম্পূর্ণ নিরাভরণ, হাতে গাছ কয়েক রুপোর চুড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই।

কিন্তু আভরণ নাই থাক, মনে হল, হয়তো কল্পনার খেয়ালেই মনে হল : স্বতপার কৃশ মসৃণ শরীরে একটা তীক্ষ্ণ ঔজ্জ্বল্য ঝকঝক করছে। মেয়েদের মধ্যে এ উজ্জ্বলতা সে কোনোদিন দেখেনি। চট্টগ্রামের বিপ্লবী মেয়েদের কথা জেনেছে, জেনেছে কুমিল্লার সেই দুটি মেয়ের কাহিনী : যাদের রিভলভারের গুলিতে শাদা সাহেব খাবি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল। ওই সব মেয়েদের সম্পর্কে একটা বিস্ময়ভরা জিজ্ঞাসা জেগে ছিল তার, স্বতপাকে দেখে যেন সে জিজ্ঞাসার উত্তর মিলল।

তলোয়ার ? তার চাইতে আরো বেশি। ঝাঁসার রাণী লক্ষ্মীবাঈ। ভেরা ফিগনার। মাদাম হালিদা এদিব। আরো কে আছে ?

—ঝরাং ঝরাং—

ট্রেন দ্রুত চলেছে, শুরু হয়েছে ঝাঁকুনি। মীটারগেজের দুল্‌কি-চলা গাড়ি।

সুতপা দৃষ্টি ফেরালো, সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ ঘুরিয়ে নিল বাইরের দিকে।

—শুনুন ?

সুতপা ভাবছে।

কিছু বলছিলেন ?

একটা ছোট স্যুটকেস্ রঞ্জনের দিকে এগিয়ে দিয়ে সুতপা বললে, এটা রাখুন আপনার কাছে। দরকারী জিনিষ আছে। ধরতে এলে কিন্তু ওটা নিয়েই লাফিয়ে পড়তে হবে ট্রেন থেকে—অল্প হাসল সুতপা।

—আচ্ছা।

আবার চুপচাপ। কী বলবে খুঁজে পাচ্ছে না। সুতপা কী ভাবছে সেই জানে, অন্তত ইচ্ছে করেই ওদিক থেকে নিজের মনোযোগ সরিয়ে রেখেছে। ট্রেণ চলেছে অন্ধকারের সমুদ্রে একটা অতিকায় জন্তুর মতো সাঁতার দিয়ে; এক আধটা আলোর টুকরো ফেনার ফুলের মতো ফুটে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে। কী আছে স্যুটকেসের মধ্যে ? বোমা ? রিভলভার ? নাইট্রিক অ্যাসিড্ ?

—শুনুন ?

আবার ডাকল সুতপা। আবার চকিতে মুখ ফেরালো রঞ্জন।

—শুনেছি খুব ভালো কবিতা লেখেন আপনি।

রাঙা হয়ে গেল রঞ্জন : কে বলেছে ?

—সবাই। আপনি জানেন না, আপনার বৈপ্লবিক কবিখ্যাতি কী ভয়ানক ছড়িয়ে পড়েছে।

বৈপ্লবিক কবিখ্যাতি! কথাটা যেন ঠাট্টার মতো শোনালো। সন্দিগ্ধ ভাবে সুতপার মুখের চেহারাটা একবার লক্ষ্য করবার চেষ্টা করলে সে। মিতার মুখে যা সত্যিকারের খ্যাতির মতো মনকে প্রসন্ন করে তুলত, সুতপার কাছে তা বিদ্রুপের মতো লাগে। দুজনের জাত আলাদা। একজন মুগ্ধ, একজন প্রখর; একজনকে মানায় ছবির মতো বাগানটায়, যেখানে সে ছবির মতোই প্রাণহীন। আর একজনকে দেখা যায় কোনো ঝোড়ো রাত্রিতে—কোনো তীক্ষ্ণ বিদ্যুতের তলোয়ারের মতো খর-আলোয়। কিন্তু—

সুতপা হেসে উঠল : লজ্জা পেলেন তো। কিন্তু বিপ্লবীর তো এভাবে লজ্জিত হওয়া উচিত নয়।—হাসিটা মাঝখানেই থেমে গেল, কথার সুরে এল গভীরতা : সমস্ত সংসারকে তুচ্ছ করে তার মাথা তুলে দাঁড়ানো উচিত। জয় করা উচিত ভয়কে, দুর্বলতাকে। লজ্জাটা তার অলঙ্কার নয়, অসম্মান।

রঞ্জন হঠাৎ দৃষ্টিটা তুলে ধরল সোজাভাবে। শিল্পীর অহমিকায় যা

লেগেছে। মেয়েদের সম্পর্কে তার সংশয় আছে, কিন্তু মেয়েদের উপদেশে তার শ্রদ্ধা নেই। তা ছাড়া সুতপা করুণাদি নয়—একটা অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা বোধ হল চকিতের মধ্যে।

—কিন্তু নিজেকে বেশি করে প্রচার করাই কি খুব বড় জিনিস? জোর এক—জোরের ভাণটা আলাদা।

সুতপার মুখে বিস্ময়ের ছায়া পড়ল। বেশ বোঝা গেল ছেলেটিকে আরো ছেলেমানুষ বলে আশা করেছিল সে। যেন কথা বলবার ঝোঁক চেপে গেল রঞ্জনের। সতেজ আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাবে বলে গেল: জোর যেদিন আসবে সেদিন নিজেকে প্রচার করব বইকি। কিন্তু যতদিন তা না আসে ততদিন অপেক্ষা করাই কি ভালো নয়?

—বেশ, অপেক্ষা করুন।—সুতপা যেন পরাভূত বোধ করলে নিজেকে: কিন্তু সময় যখন আসবে তখন যেন সংকোচে নিজেকে আড়াল করে রাখবেন না।

—নিশ্চয়ই রাখব না।

সুতপা এবার স্নিগ্ধ ভঙ্গিতে হাসল: কবির সঙ্গে কথায় পারবার জো নেই। একদিন তর্ক করব আপনার সঙ্গে। কিন্তু জানেন, আমিও এক সময়ে কবিতা লিখতাম।

—সত্যি? এতক্ষণের সংশয় কাটিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠল রঞ্জন: তবে লেখেন না কেন আজকাল?

—লিখি না কেন? বাঃ, আপনারা লিখতে দিলেন কই?

—মানে?

—মানে ফার্স্ট ইয়ারে পড়বার সময় হঠাৎ নিজের প্রতিভার ওপরে শ্রদ্ধা জেগে গেল। এক গাদা কবিতা পাঠালাম নানা মাসিক পত্রিকায়। কিছু ফেরত এল, কিছু এল না।

—সেগুলো তবে ছাপা হল বুঝি?

—না—শান্ত হাসিতে সুতপার মুখ আরো বেশি করে উজ্জ্বল হয়ে উঠল: গেল সম্পাদকের বাজে-কাগজের ঝুড়িতে। ফেরৎ দেবার দরকারও বোধ করলেন না তাঁরা।

—অন্যায়, বাস্তবিক।

সুতপা কিন্তু সহানুভূতিটা গায়ে মাখল না: অন্যায় কিছু হয়নি। সম্পাদকেরা বুদ্ধিমান লোক, আমার কবিতা সম্বন্ধে তাঁরা স্নেহে অন্ধ ছিলেন

না। অতএব কবিতাগুলো তাদের যোগ্য মর্যাদাই পেয়েছিল। সে যাক, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই আর। পৌঁছুতে তো এখনো ঘণ্টা তিনেক দেরী আছে, ভালো করে শুয়ে পড়ুন।

রঞ্জন বুঝতে পারল। যত সহজে কথাটা আরম্ভ করেছিল স্নতপা, তত সহজেই সেটাকে সে থামিয়ে দিতে চায়। বিপ্লবিনী স্নতপা, তার নিরাভরণ দেহের চারদিকে যেন বিকীর্ণ করে রেখেছে একটা আগ্নেয়বৃত্ত; সে বৃত্তের থেকে চকিতের জন্ম বাইরে এসে পড়েছিল সহজ মানুষের কাছাকাছি, তাই যেন আবার নিজেকে সংকুচিত করে নিলে সে। যেন থাবা দিয়ে থামিয়ে দিলে অন্তরঙ্গতার স্বাভাবিক অগ্রগতিটাকে।

—আমার ঘুম আসবে না এখন, আপনি শুয়ে পড়ুন।

—আচ্ছা—

আর একটি কথাও বললে না স্নতপা। চাদরটা বুক পর্যন্ত টেনে নিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর চোখের ওপর হাত দিয়ে আড়াল করে ধরলে আলোটাকে।

রঞ্জন প্রশ্ন করলে, চোখে লাগছে? নিবিয়ে দেব আলোটা?

—না, না—প্রায় আর্তস্বরে কথাটা বললে স্নতপা। তীব্র সন্ধানী চোখে তাকালো ওর দিকে, প্রায় আধখানা উঠে বসল ক্ষিপ্রগতিতে। তারপরেই কোমল হয়ে এল দৃষ্টি, স্নিগ্ধ হাসির রেখা দেখা দিলে ঠোঁটের কোনায়। না, ভুল হয়নি, একেবারে ছেলেমানুষই বটে।

—দরকার হলে নেবাতে পারেন—মৃদুস্বরে জবাব দিয়ে এবারে নিশ্চিন্তভাবে শুয়ে পড়ল সে। কিন্তু আলো নেবাল না রঞ্জন। তার চেতনা তখন ছড়িয়ে পড়েছে বাইরের দিকে—প্রবাহিত অন্ধকারের স্রোতের মধ্যে। হঠাৎ মনে একটা নতুন প্রশ্ন জেগেছে: আলো নেবাবার কথায় অমন করে চমকে উঠল কেন স্নতপা? বিপ্লবী মেয়ে, আগুনের মতো ধারালো মেয়ে, সে খালি খালি অন্ধকারকে ভয় পায় কেন?

স্নতপার সঙ্গে পরিচয়টা হল এই ভাবেই। কিন্তু পরিণতি যা ঘটল তা অভাবনীয়।

একটু একটু করে কী ভাবে সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল সেটা মনে পড়ে না। কিন্তু একটা জিনিস বেশ মনে আছে, দেখা হলেই ঠোকাঠুকি বাধত। ওকে খোঁচা দিয়ে একটা আশ্চর্য কৌতুক বোধ করত স্নতপা।

—কবিরা ভয়ঙ্কর মিথ্যেবাদী।

ক্যাঁচ করে উঠত রঞ্জন : কিসে বুঝলেন ?

অত সাজিয়ে কথা বলা দেখে। ছন্দ দিয়ে যারা কথা গুছিয়ে তোলে, সত্যের চাইতে গোছানোর দিকেই তাদের নজর থাকে বেশি। অমাবস্যার ঘুটঘুটে আঁধার রাত্তিরে তারা পূর্ণিমা নিয়ে কবিতা লেখে।

—আপনার তো হিংসে হবেই। সম্পাদকেরা লেখা ফেরৎ দিয়েছে কিনা।

সুতপা হেসে উঠত। ধারালো ঝকঝকে হাসি।

—তর্ক করতে গিয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ ? এটা বে-আইনি।

—বা রে, আপনি যা তা বলবেন তাই বলে ?

আর একদিন।

সুতপা বলে বসল, আপনি কয় মণ ওজন তুলতে পারেন ? বিশ মণ ?

—পাগল নাকি ? কোনো মানুষে তা পারে !

—আপনি পারেন—কবিরা নিশ্চয় পারে।

আক্রমণের গতিটা বুঝতে না পেরে বিস্মিতদৃষ্টিতে রঞ্জন তাকিয়ে রইল : তার মানে ?

—মানে, পরিমল এসেছিল।

—তবু কিছু বোঝা গেল না।

—বোঝা গেল না, না ?—মুখ টিপে টিপে তীক্ষ্ণ হাসি হাসল সুতপা : পরিমল এসে একেবারে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। বললে, রঞ্জু যা একটা কবিতা লিখেছে তা একেবারে প্রলয়ঙ্কর।

মনে মনে পরিমলের ওপর অত্যন্ত চটে গিয়ে বিব্রতমুখে রঞ্জন বললে, যাঃ।

—যাঃ ? তবে এই লাইনগুলো কার ?

'হিমালয় ধরে দেব নাড়াচাড়া, সাগরে তুলব ঘোর তুফান ?

রঞ্জু ততক্ষণে রক্তবর্ণ।

সুতপা সকৌতুকে বললে হিমালয় ধরে যে নাড়াচাড়া দিতে চায় সে বিশ পঁচিশ মণ ওজন তুলতে পারবে না ?

—বাঃ, ওটা যে কবিতা।

—ওই জন্যেই তো বলছিলাম কবিরা মিথ্যেবাদী।

—কী আশ্চর্য, আপনি—মানে —কী আশ্চর্য—অস্বস্তির আর সীমা রইল না। এমনভাবে যে লোক কবিতার ব্যাখ্যা করে তার সঙ্গে তর্ক চলবে কী উপায়ে। একেবারেই অরসিকেষু।

তবু তর্ক চলত। রাগ হয়ে যেত, ভাল লাগত তবু। মিতা নয়, করুণাদি

নয়—এ একেবারে আলাদা জাতের মেয়ে। মিতার কাছে গেলে কেমন নার্ভাস হয়ে যেতে হয়, করুণাদির প্রভাব মনকে আচ্ছন্ন আবিষ্ট করে ফেলে। কিন্তু সুতপার কাছে এক ধরণের সমধর্মিতা মেলে—কোথায় যেন খুঁজে পাওয়া যায় মানসিক সংযোগ।

কিন্তু একটা জিনিস মাঝে মাঝে ভারী খারাপ লাগে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় সুতপা। কেমন যেন গম্ভীর হয়ে ওঠে। মুখের ওপর শুরু মেঘাচ্ছন্নতার মতো কী একটা আসে ঘনিয়ে, চোখ দুটো কোথায় যেন তলিয়ে যায় তার। মনে হয় আপাতত তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে হারিয়ে গেছে কোনো একটা অতলান্ত সমুদ্রের গভীরে, সরে গেছে কোনো এক দুর্লক্ষ্য নীহারিকার আলোক-লোকে। মুখের একপাশে পড়া লণ্ঠনের আলোয় কেমন অসমাপ্ত, খণ্ডিত দেখাচ্ছে তাকে—তার সম্পূর্ণ সত্তাটা চলে গেছে তার বোধের বাইরে, তার বিচারের সীমারেখা পার হয়ে।

আর তখনি উঠে পড়ে সে। তখনি মনে পড়ে সুতপার মুহূর্তগুলোতে এখানে তার প্রবেশ নিষেধ—সে একান্তভাবে অনধিকারী। বলে, আচ্ছা তবে আমি আজ চলি—

সুতপা জবাব দেয় না—শুধু মাথা নাড়ে। নিঃশব্দে বেরিয়ে চলে যায় রঞ্জন, বুঝতে পারে না যে এত উজ্জ্বল এত সহজ—হঠাৎ তার ভেতরে অমনভাবে কিসের ছায়া ছড়িয়ে পড়ে! কোনখান থেকে আসে রাহু—সূর্যের আলোকে আড়াল করে দেয় একটা কালো আবরণ বিছিয়ে দিয়ে?

মন এলোমেলো ভাবনার জাল বুনতে চায়।

কিন্তু উত্তর পাওয়া গেল একদিন।

সুতপা একটা বই পড়তে চেয়েছিল ওর কাছে। বইটা জোগাড় করে নিয়ে এল দুপুরের দিকে।

রোদে ভরা বাড়িটায় স্তব্ধতা। সুতপার দাদা অবনী রায় অফিসে বেরিয়ে গেছেন। অবনী ওদের দলের উৎসাহী কর্মী। বাড়িতে এক বিধবা মাসী থাকেন, তিনি কিছু দেখেও দেখেন না। তাই নানাকারণে এ বাড়িতেই জরুরি সভাসমিতিগুলো বসত।

মাসিমা বারান্দায় বসে টাকুতে পৈতে কাটছিলেন। রঞ্জনকে দেখে বললেন, খুকুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছ? ওর তো জ্বর হয়েছে?

—জ্বর? কবে থেকে?

—কাল রাত্তির থেকে। খুব জ্বর এসেছে।

—তাই নাকি?—রঞ্জন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল: একটা বই দিতে এসেছিলাম যে—

—যাও না, শুয়ে আছে ও ঘরে—। যদি জেগে থাকে দেখা করে যাও।

সাবধানে পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল সে, আস্তে ধাক্কা দিয়ে খুলল ভেজানো দরজাটা।

বালিসের ওপর রুক্ষ চুলগুলো মেলে দিয়ে কাত হয়ে শুয়ে আছে সুতপা। একহাতে কপালটা ঢাকা, আর একটা নিরাভরণ বাহু শিথিলভাবে এলিয়ে দিয়েছে পাশে। কোমর অবধি টানা চাদরটা বিস্রস্তভাবে পড়ে আছে—একটা আশ্চর্য করুণতা যেন ঘিরে ধরেছে তার রোগশয্যাকে। তলোয়ারের মতো ধারালো মেয়েটিকে কী অসহায় বলে বোধ হচ্ছে, কী অবিশ্বাস্য দেখাচ্ছে এখন এই ক্লান্ত আত্মনিবেদনের ভঙ্গিটা! তেমনি সাবধানেই ফিরে যাচ্ছিল, কিন্তু সামান্য একটু শব্দ হল পায়ের চটিটায়। আর চোখ মেলে তাকালো সুতাপা। জ্বরের ধমকে টকটকে লাল দুটো চোখ।

—কে?—দুর্বল গলায় ডাক এল।

—আমি রঞ্জন।

—ওঃ, আসুন।

—নাঃ, আপনি অসুস্থ। আজ আর বিরক্ত করব না। এই বইটা রেখে চলে যাচ্ছি।

—না—না, যাবেন না—হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত উত্তেজনায় সুতপা যেন বিছানা থেকে আধখানা উঠে বসতে চাইল: আপনি যাবেন না। আজকে আপনাকে আমার ভয়ঙ্কর দরকার।

জ্বরতপ্ত চোখের দৃষ্টি আর স্বরের উত্তেজনায় যেন চমক লাগল। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে।

—আসুন—

—মন্ত্রমুগ্ধের মতো রঞ্জন এগিয়ে এল।

—বসুন।

একটা টুল টেনে নিয়ে রঞ্জু দ্বিধাভরে বসল।—বললে—আপনি অসুস্থ, এ অবস্থায় আপনাকে বিব্রত করা—

—না, না।—সুতপা মাথা নাড়ল: আমি আপনাকে খুঁজছিলুম।

—কেন খুঁজছিলেন আমাকে?

—জানেন, আমি আর বাঁচব না!

রঞ্জু সভয়ে বললে, ছিঃ, ছিঃ, এসব কী কথা বলছেন আপনি। জ্বর হয়েছে, দু-দিন পরেই ছেড়ে যাবে।

—না, যাবে না।—সুতপার আরক্ত চোখ দিয়ে আগুনের আভার মতো জ্বরের উত্তাপ ঠিকরে পড়তে লাগল: আমি আর বাঁচব না।

ভয় করতে লাগল। ইচ্ছে করতে লাগল সুতপার কপালে একটুখানি হাত বুলিয়ে দেয় সে, জলের পটি লাগিয়ে দেয় একটা। কিন্তু অগ্নিকন্যাকে ছোঁবার শক্তি নেই, ভয়ে জমাট হয়ে বসে রইল সে।

ফিস্ ফিস্ করে সুতপা বললে, আপনি কবি, আপনি লেখক। আমি মরে গেলে আপনি একটা গল্প লিখবেন?

—গল্প?

জ্বরের ঘোরে সুতপার স্বর কাঁপতে লাগল: হাঁ গল্প। বলুন, লিখবেন আপনি?

বিপন্ন মুখে রঞ্জন বললে, ওসব থাক এখন। পরে আর একদিন হবে না হয়।

—না, না, আর একদিন নয়। আর কোনোদিন হয় তো সুযোগই ঘটবে না। বলুন, আপনি লিখবেন এ গল্প?

রঞ্জন হাল ছেড়ে দিলে। বিশীর্ণ স্বরে বললে, কী গল্প?

জ্বরতপ্ত গলায় পাগলের মতো যেন প্রলাপ বকে গেল সুতপা। শুনতে শুনতে সমস্ত শরীর যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। প্রেমের গল্প! ভাবতে পারে কেউ, সুতপা বলছে প্রেমের গল্প! উজ্জ্বল তলোয়ারের ধারালো ফলা মুহূর্তে কোমল আর স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে রজনীগন্ধার বৃন্তের মতো। মশালের মুখে আগুন জ্বলছে না, ফুলের বুকে টলোমলো করছে ভোরের শিশির।

এ প্রলাপ শোনা উচিত নয়, উঠে যাওয়া উচিত এখান থেকে। এখনি, এই মুহূর্তেই। একটা নিষিদ্ধ অন্তঃপুরে ঢোকবার অনুভূতি হচ্ছে। ধক্ ধক্ করে আওয়াজ হচ্ছে হৃৎপিণ্ডে, গরম হয়ে উঠেছে কান দুটো। সুতপার আগুন-ঝরা অমানষিক রক্ত চোখদুটোর দিকে চাইতে পারল না সে, বসে রইল নত মস্তকে।

সেই পুরোণো, বহু পুরোণো গল্প! একটি ছেলে, একটি মেয়ে। এক সঙ্গে তারা কলেজে পড়ত, একসঙ্গে তারা আলোচনা করত, এক সঙ্গে চা-ও খেত মাঝে মাঝে। তারপর স্বাভাবিক ভাবেই এল প্রেম।

তারও পর এতদিন যখন নদীর ওপারে সূর্য ডুবে যাচ্ছে, বালির চরে কাশফুলগুলোকে যখন শেষ আলোয় একরাশ সোনার ফেনার মতো মনে হচ্ছে, চারদিক নির্জনতার শান্তিতে তলিয়ে আছে, সেই দুর্বল মুহূর্তের অবকাশে ছেলেটি মেয়েটির হাত ধরল।

ঘাসবন থেকে সাপে ছোবল মারল যেন। হাত ছিনিয়ে সরে গেল মেয়েটি: না—না

—না কেন?—ছেলেটি আহত হয়ে বললে, তুমি তো আমাকে—

—না, না।—মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠল।

—এর মানে?

—জানতে চেয়ো না।—অসহায় স্বরে মেয়েটি বললে: তুমি বুঝবে না।

কঠোর হয়ে উঠল ছেলেটির মুখ: তা হলে কী তুমি আর কাউকে?

দু হাতে মুখ ঢেকে বললে, না, তা নয়।

—তবে কি আমরা বিপ্লবী, সেই জন্যেই? কিন্তু মৃত্যুর পথেও যদি আমরা পাশাপাশি চলতে পারি, তার চেয়ে বড় আর কী আছে?

—না, ওসব কিছুই নয়।

ছেলেটি অধীর উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠল: বলো, সব খুলে বলো আমাকে।

—আমি পারবো না—কান্নার মধ্যে জবাব এল মেয়েটির।

—আচ্ছা বেশ—ছেলেটি চলে যাচ্ছিল, কিন্তু এবারে মেয়েটিই তার হাত চেপে ধরল। চোখের জল মুছে ফেলে অদ্ভুত স্বরে বললে, তবে শোনো। আমি বিবাহিত।

—বিবাহিত! ছেলেটি চমকে উঠল: কই জানতাম না তো। এ কথা তো বলোনি।

—বলতে পারিনি—মৃতকণ্ঠে মেয়েটি জবাব দিলে।

—আমায় ক্ষমা কোরো—আমি জানতাম না—ছেলেটি চলে যাওয়ার উপক্রম করল।

—না, না, যেয়ো না। যখন অর্ধেকটি শুনেছ, তখন সব কথাই শুনে যাও। তেমনি মৃতস্বরে মেয়েটি বললে, তুমি জানো, আমার স্বামী কে?

—কী হবে জেনে?—শ্রান্ত ভাবে ছেলেটি বললে।

—তবু তোমার জানা দরকার। শোনো, আমার স্বামী নীলমাধব।

—নীলমাধব?

—হ্যাঁ, পাথরের ঠাকুর।

চমকে উঠল ছেলেটি: তুমি কি আমায় ঠাট্টা করছ?

—না ঠাট্টা নয়। এর চাইতে বড় সত্যি কথা আমি জীবনে কখনো বলিনি—ছেলেটির মনে হল কেমন যেন অপরিচিত হয়ে গেছে মেয়েটির গলার স্বর, যেন কোন্ বহুদূর দিগন্তের ওপার থেকে সে কথা কইছে:

—একটা আশ্চর্য কাহিনী শোনো। তোমার হয়তো বিশ্বাস হবে না, কিন্তু আমার জীবনে এ কাহিনী সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সত্য হয়ে আছে। আমার ঠাকুর্দা ছিলেন পরম বৈষ্ণব। শ্রীকৃষ্ণে সর্বস্ব নিবেদন করে দিয়ে তিনি ধন্য হতে চেয়েছিলেন। তাই ছেলেবেলায় আমাকেও তিনি নীলমাধবের পায়ে সঁপে দিয়েছেন। আমি দেবদাসী, আমার বিয়ে করবার অধিকার নেই।

আকাশ ভেঙে বাজ পড়ল যেন। ছেলেটির কণ্ঠ থেকে শুধু অব্যক্ত অস্পষ্ট শব্দ বেরুল একটা। দুর্ভেদ্য কঠিন স্তব্ধতায় চারদিক গেল আচ্ছন্ন হয়ে, উঠল অতি তীব্র ঝিঁঝির ডাক, নদীর ওপারে সূর্যের শেষ আলোও মিলিয়ে গেল।

স্তব্ধতা ভেঙে অবরুদ্ধ স্বরে ছেলেটি বললে, বাজে।

—না।

—এ সংস্কার তুমি মানো?

তেম্'ন বহু দূরের থেকে, যেন এই চর আর নদীর ওপার থেকেই মেয়েটির গলা ভেসে এল: না।

—তা হলে কেন এ সংস্কার ভাঙবে না তুমি?

—পারব না। সে জোর আর আমার নেই—কান্নার চাইতেও মর্মান্তিক বর্ণহীন শীতলতা তার স্বরে: মানতে পারি না, ভাঙতেও পারি না।

—বিপ্লবীর সমস্ত শক্তি দিয়েও নয়?

—উপায় নেই।

মেয়েটিই উঠে দাঁড়ালো এবার—মাঠের মধ্য দিয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল, ছুটে পালিয়ে যেতে চায় সে।

আগুনভরা প্রলাপ জড়ানো চোখে সুতপা গল্প শেষ করল।

মন্ত্রমুগ্ধ রঞ্জন যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। যান্ত্রিক স্বরে বলে ফেলল: বেণুদা?

আর তক্ষুনি, সেই মুহূর্তেই সুতপা যেন চেতনা লাভ করল। হঠাৎ যেন বিকার কেটে গেছে তার, যেন চকিতে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে সে।

তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে সুতপা চেঁচিয়ে উঠল: যান্—যান আপনি—

রঞ্জন আর অপেক্ষা করল না।

পথ দিয়ে চলতে চলতে নিজের চোখ সে কচলালো বার কয়েক। এ সত্যি নয়, এ স্বপ্ন। যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলেই সাবানের বুদ্বুদের মতো ভেঙে পড়বে এর রঙ।—সুতপার নিরাভরণ দীপ্তদেহে তলোয়ারের ঝলক; তার চারিদিকে আগ্নেয়-বৃত্ত। বেণুদা—লোহায় গড়া নিষ্ঠুর মানুষ। ভালোবাসা আর সংস্কারের বেড়ায় বন্দিনী সুতপা, শপথ নিয়েছে দাসত্বের শিকল ভাঙবার—অথচ যাকে ভালোবাসে সংস্কার ভেঙে তার কাছে এগিয়ে যাওয়ার জোর নেই তার—জোর নেই সুতপার!

তাই কি অত করে সংস্কার ভাঙবার কথাটা বলেছিল সে? শক্ত করে নিতে চাইছিল নিজের দুর্বলতার ভিত্তি? আর—আর এই জন্যেই কি গাড়ির আলো নেবাবার কথায় ভয় পেয়েছিল সে?

একটা অর্থহীন কল-কোলাহলে সমস্ত ভাবনাগুলো যেন একাকার হয়ে গেল।

—ষোলো—

আরো দু মাস? দু মাস, না আরো কম? ঠিক খেয়াল নেই, ভালো করে মনে পড়ে না এতদিন পরে। নানা রঙের দিনগুলি পাখা মেলেছে, উড়ে গেছে ঝড়ের বাতাসে। উনিশ শো তিরিশ সালের বন্যা—তেরশো তিরিশ সালের বন্যা। জীবনে বন্যার বেগ এসেছে, এসেছে খরপ্রবাহ।

সুতপা! একটা রাত্রির আশ্চর্য স্বপ্ন যেন। এখনো ঠিক বোঝা যায় না সেদিন সে কথাগুলো সে সত্যি সত্যিই শুনেছিল কিনা!

তারপর আর দেখা হয়নি, দেখা করবার সুযোগও ঘটেনি। টাইফয়েড্ থেকে ওঠবার পরে সুতপা চলে গেছে দেওঘর, সে প্রায় ছয় মাস হয়ে গেল। কিন্তু বেণুদার দিকে আজকাল সে তাকায় একটা নতুন প্রশ্ন নিয়ে, তার অর্থ, বোধ করতে চায় একটা নতুন জিজ্ঞাসার আলোকে। কেন যেন মনে পড়ে—বহুদিন আগেকার একটা রাত্রির কথা। কবরখানা থেকে ফেরবার পথে হঠাৎ তাঁর সেই গান: "করুণাময়, মাগি শরণ।" সেই অসহায় বেড়ালের ছানাটাকে খানা থেকে কুড়িয়ে বুকে তুলে নেওয়া, পাথরের আড়ালে ভেঙে ফুটে ওঠা একটা ফুলের মতো কোমলতা। মনে হয় সেদিনকার সে ব্যবহারের যেন অর্থ খুঁজে পাওয়া গেছে—যেন কী একটা সঙ্গত কারণ পাওয়া গেছে তার।

আর স্থতপার সে আংটি দেওয়া। সেকি শুধু পার্টির জন্তে সর্বস্ব দেবার আকুলতা? অথবা আরো কিছু আছে তার আড়ালে, আরো কোনো গভীরতর আত্ম-নিবেদন? শুধু আংটি দেওয়া, না সেই সঙ্গে—

নিজের মনকে শাসানি দিলে একবার। এ শুধু অনধিকার চর্চা নয়, পাকামিও বটে। হালে কতগুলো বাংলা উপন্যাস পড়ে এইগুলো আজকাল তাল পাকাচ্ছে তার মগজের মধ্যে। এসব ভুলে যাওয়া উচিত। সৈনিক, শুধু কাজ করো, শুধু নেতার আদেশ পালন করো। যদি ক্লান্ত লাগে, জেনো নিজের দুর্বলতা; যদি কোনো ব্যাপারে সংশয় জাগে, জেনো সে তোমার বুদ্ধির বাইরে।

অনেকদিন কবিতা লেখেনি। আজ আবার কাগজ কলম টেনে নিয়ে বসল। কিন্তু কিছু আসছে না। দু'লাইন লিখল, কেটে দিলে আবার! একটা নতুন ছন্দ গানের স্থরের মতো গুন্‌গুনিয়ে উঠছে—

দূর গিরি-সঙ্কট দুর্গম পথরেখা একা পথে শঙ্কিত যাত্রী,
তবু তো উদয়রাগে রঞ্জিত গিরিচূড়া অবসিত দুর্যোগ রাত্রি—

নাঃ—এ শুধু কথা—এতে প্রাণ নেই। শব্দের ঝঙ্কার কানে লাগে, মন দোলায় না। দুর্গম পথে একক যাত্রীর মনেও কি তেমন করে দোলা লাগে না আর?

—March on, march on friend—there calls the martyr's heaven—

ভালো কথা, করুণাদি ডেকেছিলেন। আজকাল করুণাদি যেন মন থেকে সরে গেছেন খানিকটা। সরে গেছেন—না নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন বলা শক্ত। কোথায় একটা ব্যবধান এসে যেন আড়াল করে ধরেছে শক্ত হাতে। কার দোষ? রঞ্জনের? বেণুদার বোন কি বিপ্লবীর পথ চলাকে মেনে নিতে পারেননি মন থেকে?

তবু একবার ঘুরে আসা যাক।

বাইরে ঘরের দরজা বন্ধ করে বৈঠক করছিলেন বেণুদা। দাদারা সবাই এসেছেন—এ আলোচনায় ওরা যোগ দিতে পারে না, এটা ওপর তলার ব্যাপার। একটা থমথমে গাম্ভীর্য সকলের মুখে। বুঝতে পারে। চারদিক থেকে অচল অবস্থার স্থষ্টি হয়েছে একটা। সেই ডাকাতিটার পরে পুলিশের তাণ্ডব চলছে অবিরাম, এর মধ্যেই বার তিনেক সার্চ হয়েছে বেণুদার বাড়ি। দলের আট দশজন ছেলে হাজতে। বেণুদাকে এখনো ধরেনি, বোধ হয়

আরো উদ্যোগ আয়োজন করে জাল গুটোবার মতলব আছে ধনেশ্বরের। সবাই সেটা জানে। কাজেই ঘন ঘন জরুরী বৈঠক বসেছে আজকাল। কী করা যাবে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। টাকা দরকার—দরকার অর্গানাইজেশনকে আরো শক্ত করা। তারই কোনো প্রোগ্রাম নেওয়া হচ্ছে বোধ হয়।

বেণুদা বললেন, ভেতরে যাও।

শীতের রোদে স্নান করা সকাল। মিষ্টি, নরম, কবোষ্ণ। বারান্দায় সে রোদ পড়েছে, আর সত্তোস্নান করা চুল এলিয়ে দিয়ে রোদের দিকে পিঠ করে কী যেন সেলাই করছেন করুণাদি।

—করুণাদি ?

—রঞ্জন ? এসো—হাসিমুখে অভ্যর্থনা এল।

—আমাকে ডেকেছিলেন ?—মাদুরে একপাশে বসে পড়ল।

—হ্যাঁ, ডেকেছিলাম বইকি। পিঠে করেছি কাল রাত্রে, ব্রাহ্মণ ভোজন না করালে পুণ্য হবে না।

—তাই বেছে বেছে আমাকে বুঝি ব্রাহ্মণ পেলেন ?

—তা বইকি। বেশ ছোটখাটো ব্রাহ্মণ—অগস্ত্যের মতো খায় না, কিন্তু খেয়ে খুশি হয়।

রঞ্জন হাসল : পরিমল শুনলে কিন্তু চটে যাবে।

—ওই হতভাগা ?—করুণাদি সস্নেহে বললেন, ওর কথা আর বোলো না। ওকে ডাকতে হয় না, আপনি এসে জুটে যায়। কাল রাত্রে এসে অর্ধেক সাবাড় করে গেছে।

—বাঃ, আমাকে বাদ দিয়ে ? কী বিশ্বাসঘাতক।

—ওই তো। চিনে রাখো কেমন বন্ধু তোমার—হেসে করুণাদি উঠে গেলেন।

রঞ্জন ভাবতে লাগল। এখানে এসে হঠাৎ যেন মনে হল আবার ফিরে পেয়েছে বাড়ির স্নিগ্ধতা, সেখানকার মমতাভরা নিবিড় আশ্রয়—যা ছিল মা বেঁচে থাকা পর্যন্ত। এখন আর বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না। অসহ্য লাগে ঠাকুরমার কান্না। সমস্তই একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে, দু'মাস থেকে বাবার চিঠি পত্র আসে না, শোনা যায় ইদানিং নাকি যোগ-সাধনা শুরু করেছেন তিনি।

আজ বড় ভালো লাগল এখানে। আরো ভালো লাগল—অনেকদিন পরে যেন আবার খানিকটা স্বাভাবিক হয়েছেন করুণাদি। সেই পুরোনো হাসি, সেই স্নেহের স্নিগ্ধ উত্তাপ, সকালবেলাকার মিষ্টি নরম রোদের মতো কবোষ্ণ অনুভূতি।

করুণাদি পিঠে নিয়ে এলেন।

—এত ?

—খেয়ে নাও।

—পারবো না তো।

—আর দর বাড়াতে হবে না—খেয়ে নাও।—করুণাদি ধমক দিলেন।

খেতে খেতে উঠোনের দিকে তাকালো রঞ্জন। এক কোণে কতগুলো গাঁদা ফুল ফুটেছে—এত রাশি রাশি ফুটেছে যে পাতাগুলোকে পর্যন্ত দেখা যায় না। শিশিরে ভিজে ভিজে ফুলগুলো, সকালের রোদ এখনো সে শিশির শুকিয়ে নিতে পারেনি। কতগুলো পায়রা নিশ্চিন্তে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে কী যেন। ইঁদারার ধারে একটা পেঁপে গাছ, তিন চারটে শালিক কিচির মিচির করছে তার ওপরে।

শান্তি, বিশ্রাম। যেন করুণাদি তাঁর নিজের চারপাশে একটা মধুচক্র রচনা করে রেখেছে। আর বাইরের ঘর। এর একেবারে বিপরীত। অকৃপণ সূর্যের আলোকে রুদ্ধ করে দিয়ে, এই গাঁদা ফুলে ভরা ভোরের শিশিরকে অস্বীকার করে যেখানে একটা আগ্নেয় পরিবেশ। জটিল তর্ক, কুটিল সমস্যা। সুন্দর স্নেহভরা ঘরের মোহ নয়, ঝড়ের ক্ষ্যাপামি-লাগা সমুদ্রের ডাক; পায়রার খুঁটে খুঁটে খুদ পাওয়া নয়, কাঁটার পথ দিয়ে রক্তাক্ত পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলা।

—জানো, আমি চলে যাচ্ছি।

গলায় পিঠে আটকে গেল, বেরুল একটা অব্যক্ত শব্দ।

—হাঁ, সত্যিই চলে যাচ্ছি।

রঞ্জন চক্ষের পলকে খাবারের থালা থেকে হাত গুটিয়ে নিলে : যাঃ।

—না, মিথ্যে বলিনি।—সকালের নরম রোদে ভারী করুণ আর ক্লান্ত মনে হল করুণাদির চোখ : চলে যেতেই হবে ভাই, থাকতে পারব না।

—কিন্তু কোথায় যাবেন ?

—কোথায় ?—করুণাদি প্রাণহীন একটা নীরক্ত হাসী টেনে আনতে চেষ্টা করলেন ঠোঁটের আগায় : কেন, আমার শ্বশুরবাড়িতে ? মেয়েমানুষকে বিয়ে হলে যেখানে যেতে হয় সেখানেই।

তা বটে। এর ওপর যে কোনো প্রশ্নই অবান্তর মনে হয়। কিন্তু এর জন্যে যেন প্রস্তুতি ছিল না বোধের মধ্যে। করুণাদিরও শ্বশুরবাড়ি আছে, যেখানে মাথায় একগলা ঘোমটা টেনে তাঁকে সংসারের কাজকর্ম করতে হবে, পরিচর্যা

করতে হবে স্বামীপুত্রের, যেখানে করুণাদি অতি সাধারণ, একেবারেই সাধারণ

—ওঃ, জানতাম না।—নির্বোধের মতো উচ্চারণ করলে রঞ্জন। কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে বুকের মধ্যে, কষ্ট হচ্ছে নিশ্বাস নিতে। জলন্ত রৌদ্রের মধ্যে, অতি প্রখর আগুনের কণার মতো বালুছড়ানো দিগ্‌বিস্তার মরুভূমির পথ দিয়ে আজ যাত্রা শুরু। ক্লান্ত লাগে মাঝে মাঝে, আশ্রয় আর আশ্বাসের আশায় আকুলি-বিকুলি জাগে মনের মধ্যে। সেই আশ্রয় সে পেয়েছিল করুণাদির মধ্যে, মরুভূমির মধ্যে ছায়ার দাক্ষিণ্য দিয়েছিল এই পান্থ-পাদপ!

—রঞ্জন?

ধরা গলায় করুণাদি ডাকলেন।

চোখ তুলতে পারল না রঞ্জন। ওই গলার স্বর সে চেনে, ওর সঙ্গে তার মনের অড়োলে সেই সূক্ষ্ম অপরাধবোধটা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

—আমি চলে যাচ্ছি ভাই। তোমাদের ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু না গিয়ে আর উপায় নেই আমার।

নীরবতা। শিশির-ভেজা গাঁদা ফুলগুলোতে ঝিকঝিক করছে সোনার মতো একটা উজ্জ্বল দীপ্তি। তেম্‌নি ধান খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে পায়রারা।

অবশ স্বরে করুণাদি বললেন, তোমাকে একটা কথা অনেকদিন ধরে বলতে চেয়েছিলাম, বলতে পারিনি। হয়তো আজও ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু সারাক্ষণ আমার বুক কাঁপে। যে আগুনে সারাক্ষণ আমি জ্বলছি, ভয় করে একদিন সে আগুনে তোমরা জ্বলে না যাও।

সেই পুরানো কথা। সেই দুর্বোধ্য ইঙ্গিত।

রঞ্জন মাথা নত করে বসে রইল। ব্যথিত একটা জিজ্ঞাসা এসেছে গলার কাছে, আকুলতায় একটা আবেশ রণরণিয়ে উঠেছে রক্তের গভীরে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করা যায় না, শুধু আচ্ছন্নের মতো থাকতে হয় চুপ করে।

—কাল আমি চলে যাব। হয়তো কোনোদিন আর দেখা হবে না তোমার সঙ্গে।—কান্নায় কেঁপে উঠল করুণাদির গলা: কিন্তু কথাটা মনে রেখো ভাই। সব পথ সকলের জন্যে নয়। পারো তো বেরিয়ে চলে এসো এই আগুনের ভেতর থেকে, বাঁচতে চেষ্টা কোরো গুণীর মতো, শিল্পীর মতো। মরতে পারা সবচেয়ে সহজ কিন্তু মহৎ হয়ে বাঁচতে জানা তার চেয়ে ঢের বেশি কঠিন।

বিহ্বলভাবে মাথা নিচু করে তেমনি বসে রঞ্জন। তারপর যখন চোখ তুলল তখন দেখল সামনে করুণাদি নেই। কানে এল ঘরের ভেতর কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে অসহায় যন্ত্রণায়।

দু কান ভরে সেই কান্না আর বুক ভরে সেই যন্ত্রণা—সেই দুর্বোধ্য যন্ত্রণা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল সে। সকালের সোনার আলো চোখের সামনে কালো হয়ে গেছে তার। সামনে মরুভূমির পথটা ধূ ধূ করছে—পান্থপাদপের ছায়ার চিহ্নমাত্রও নেই কোথাও।

পরিমল খবর দিলে পরের দিন। করুণাদি চলে গেছেন সকালের ট্রেণে। যাওয়ার আগে আশীর্বাদ জানিয়ে গেছেন রঞ্জনকে, করে গেছেন তার কল্যাণ কামনা।

মাকে হারানোর ব্যথাটা যেন বুকের মধ্যে আবার মোচড় দিয়ে উঠল তার। যাওয়ার সময় কেন সে একবার দেখা করতে পারল না করুণাদির সঙ্গে, নিতে পারলনা তাঁর পায়ের ধুলো ?

না—কিছু না ওসব। 'একলা চলো রে।' কোনো বন্ধন নেই বিপ্লবীর জীবনে। মোহ তুচ্ছ, অর্থহীন। ঝড়ের গর্জনকে ছাপিয়ে আজ শুধু বিচ্ছেদের হাহাকারই মুখরিত হচ্ছে দিকে দিকে।

'বন্দরের কাল হল শেষ !

তারও পরের দিন ওদের বাসার সামনে সাইকেলের একটা বেল বাজল ক্রিং ক্রিং করে।

ইয়াদ আলী। ছাইরঙের কোট গায়ে সেই লোকটা।

ব্যঙ্গ-মিশ্রিত একটা কুটিল হাসি হাসলে ইয়াদ আলী: বড়বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। এখুনি আপনাকে একবার আমার সঙ্গে আসতে হবে আই-বি অফিসে।

ঝড়ের হাওয়া উঠল প্রথম।

দুরু দুরু বুকে ঢুকল রঞ্জন। নিজের পা দুটোকে অসাড় বলে মনে হচ্ছে। কপালের দু'পাশে একটা মুমূর্ষু সাপের শেষ বিক্ষোভের মতো পাক খাচ্ছে রগ দুটো, বুকের মধ্যে শব্দ উঠছে রেলের এঞ্জিনের মতো।

ইয়াদ আলী বললে, বড়বাবু এনেছি।

—হুম্—

যেন চোঙার ভেতর দিয়ে শব্দ বেরুল একটা। সে শব্দে সমস্ত ঘরটা গম্ গম্ করে উঠল।

সামনে মস্ত একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল। স্তূপাকার কাগজপত্র, ফাইল। একটা পেতলের অ্যাশট্রের ওপর চুরুট পুড়ছে, ঘরে ভাসছে চুরুটের তীব্র উগ্র গন্ধ। বাঁ হাতের ঠিক পাশেই পড়ে আছে একটা রিভলভার, ধনেশ্বর

কী লিখে চলেছে মন দিয়ে।

রঞ্জন দাঁড়িয়ে রইল যেন বলির অপেক্ষায়।

—হুম্—

আবার সেই চোঙার আওয়াজ। এতক্ষণে চোখ তুলল গোয়েন্দা সর্দার ধনেশ্বর। প্রখর ভয়ঙ্কর চোখে, তাতে কেমন লালের আভাস। বুলডগের মতো সমস্ত মুখের চেহারা, ভারী মুখের দু'পাশে শিকারী বেড়ালের মতো একজোড়া খাড়া খাড়া গোঁফ ছড়িয়ে আছে। ফর্সা রঙ, ফুলো ফুলো গাল দুটোয় গোলাপী আভা। মুখের ভেতর থেকে ঝলক দিলে দুটো সোনা বাঁধানো দাঁত—তেড়ে কামড়াতে আসছে যেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য ধনেশ্বর হাসল। কল্পনা করা যায়, ধনেশ্বর হাসল? তবুও হাসল যে কোনো ভুল নেই। যেন শেয়ালে হাঁস চুরি করে খেয়ে চেটে নিলে ঠোঁটের রক্ত।

বুলডগটা ঘোঁৎ করে বললে, বোসো।—এবার আর চোঙার আওয়াজ নয়, সুতরাং অনুমান করা গেল সে গলার স্বরে কোমলতা আনবারই চেষ্টা করছে।

ভয়ের মধ্যেও কেমন বিস্ময় বোধ হচ্ছে। হঠাৎ এ জাতীয় সমাদরের মানে কী?

আমি তোমার কাকাবাবু হই।—আবার সস্নেহে ঘোঁৎ করে বললে ধনেশ্বর।

কাকাবাবু! এবার বিস্ময়ের চমকটা রঞ্জন চেষ্টা করেও গোপন করতে পারল না। আম কাঁঠালের মতো কাকাবাবু নামে ব্যাপারটা যে গাছে গাছে ফলে—এটা কিন্তু জানা ছিল না। ধনেশ্বর কাকাবাবু হতে চাইছে! কে জানে ইয়াদ আলীও হয়তো বলবে, আমি তোমার মামা হই। তারপর সাক্ষাৎ যমদূত সামনে আবর্ভূত হয়ে যদি বলে আমি তোমার 'তালুইমশায়' তা হলেও তো আশ্চর্য হওয়ার কারণ থাকবে না!

কিন্তু কাকাবাবুর স্নেহ উপেক্ষা করা যায় না। সুতরাং বসতে হল।

বুলডগ্ কাকাবাবু খামোকা মুখটাকে খানিকটা খুলে আবার ঘোঁৎ করে বন্ধ করে ফেলল, যেন মশা গিলে নিলে একটা। কেমন থতমত লাগল পরে অবশ্য লক্ষ্য করে দেখেছিল ওটা ওর মুদ্রা দোষ।

—হাঁ, আমি তোমার কাকাবাবু। তোমার বাবার কাছেই প্রথম এ-এস্-আই ছিলাম আমি। ছেবেবেলায় কতবার গেছি তোমাদের ওখানে, তোমরা তখন কত ছোট ছিলে। এই এতটুকু দেখেছি তোমাদের।

আত্মীয়তার রসালাপ মন দিয়ে শুনে যেতে লাগল রঞ্জন। কোনো জবাব দিলে না।

—তোমার মা, আমাদের বৌদি—যেন স্বর্গের দেবী ছিলেন। আহা-হা —ধনেশ্বরের গলায় করুণতার আমেজ লাগল: যখন শুনলাম তিনি আর ইহজগতে নেই, তখন কী যে কষ্ট হল বলবার নয়। ভাবলাম, আহা, এখন এই নাবালক শিশুদের যে কে দেখবে!

প্রায় বলে ফেলছিল—এমন সোনার কাকাবাবু থাকতে ভাবনা কী, কিন্তু কথাটার প্রতিক্রিয়াটা আন্দাজ করতে না পেরে ধনেশ্বরের অনুকরণে রঞ্জনও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাত্র।

মিনিট খানেক চুপ করে থেকে আবেগটাকে সামলে নিলে ধনেশ্বর। তারপর তেমনি করুণ কোমল গলায় বললে, তুমি আমার আপনার লোক, একেবারে ঘরের ছেলে। তাই ভাবছিলাম তোমাকে ডেকে গোটা কয়েক কথা জিজ্ঞাসা করব। কাকাবাবুর কাছে তো লজ্জার কিছু নেই, জবাবগুলো দেবে আশা করি।

কপালের রগদুটো আবার মোচড় খেয়ে উঠল, আবার ধড়াস্ করে শব্দ হল বুকের ভেতরে। ঝুলির ভেতরে বেড়াল নড়ে উঠেছে, সেও নড়ে চড়ে ঠিক হয়ে বসল।

—ইয়াদ মিঞা!—ধনেশ্বর ডাকল।

—স্যার?

—কিছু খাবার আর চায়ের ব্যবস্থা করুন দেখি।

—আমি কিছু খাব না—শুকনো স্বরে রঞ্জন বলতে চেষ্টা করল।

—খাও না, কাকাবাবুর সামনে লজ্জা কী! যান ইয়াদ মিঞা—

—হ্যাঁ স্যার, আনাচ্ছি এক্ষুণি—ইয়াদ আলী বেরিয়ে গেল।

ছাইদানী থেকে চুরুটটা তুলে নিলে ধনেশ্বর। একটা টান দিয়ে খানিক উগ্র গন্ধ ধোঁয়া প্রায় রঞ্জুর মুখের ওপরেই ছড়িয়ে দিলে সে: শহরে আজকাল একদল বদছেলের আমদানী হয়েছে, জানো বোধ হয়।

রঞ্জন আধখানা দৃষ্টিতে দ্বিধাগ্রস্তের মতো একবার তাকালো শুধু।

—এই সব ছেলের—ধনেশ্বরের গলায় এবারে উত্তাপ সঞ্চার হল: মরবার জন্যে পাখ্না গজিয়েছে। এদের ধারণা হয়েছে যে এরা দুটো পিস্তল আর চারটে বোমা দিয়ে ইংরেজকে তাড়াতে পারবে। ব্রিটিশ লায়ন অত দুর্বল নয়, ইচ্ছে করলে একদিনে কামানের মুখে ওরা ভারতবর্ষকে চষে ফেলতে পারে!—

সমর্থনের জন্যে রঞ্জুর মুখের ওপর পূর্ণদৃষ্টি ফেলল ধনেশ্বর : কী বলো, পারে না ?

রঞ্জন সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, পারে বইকি। ইংরেজের পরাক্রম সম্পর্কে তারও মনে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

—তবেই দেখো, এসবের কোনো মানে হয় না। হয় ?

রঞ্জন জানালো, না, হয়না।

ধনেশ্বর হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। অত্যন্ত বিশ্বস্ত গলায় ফিস্‌ফিস করে বললে, ছাখো, স্বাধীনতা সবাই চায়। আমরা পুলিশের লোক, আমরাই কী জানি না যে ইংরেজ কী ভাবে শোষণ করছে আমাদের, হরণ করছে আমাদের মনুষ্যত্ব ? আমাদেরও অপমান বোধ আছে, আমাদের রক্তে পরাধীনতার জ্বালা আছে—যেন থিয়েটারের ঢঙে বলে চলল : ইংরেজকে তাড়াতে পারলে আমরাও কম খুশি হবো না।

বিমূঢ় হয়ে গেল রঞ্জন। ভূতের মুখে হরি-সংকীর্তন শুনছে যে।

—কিন্তু—আবেগভরে ধনেশ্বর বললে, কিন্তু সনাতন ভারতবর্ষ আমাদের। অহিংসা, ত্যাগ, প্রেমের দেশ। এই দেশের মাটিতেই জন্মেছিলেন, বুদ্ধ, নানক, মহাবীর, চৈতন্য। এঁরা সব অহিংসা আর ক্ষমার পূজারী। মহাবীরের যাঁরা শিষ্য তাঁরা তো একটা পোকা পর্যন্ত মারতে কষ্ট পান। খাটে তাঁরা 'খটমল' —মানে ছারপোকা পোষেন। কামড়ে জেরবার করে দিলেও টুঁ শব্দটি করেন না কখনো।

রিভলভারের ঝকঝকে নলটার দিকে চোখ পড়ল রঞ্জনের। অহিংসা আর প্রেমের আবহাওয়ার সঙ্গে কী চমৎকার খাপ খাচ্ছে। একটা বুলডগ যদি জপের মালা হাতে নিয়ে তপস্যায় বসে, তা হলে তার মুখের চেহারায় কী এই ধার্মিক কাকাবাবুর মতো একটা ঐশ্বরিক ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে ?

—আহা—শ্রীচৈতন্য !—টপ্‌ করে আবার একটা মশা খেয়ে নিলে ধনেশ্বর : জগাই মাধাইকে বললেন, 'মেরেছো কলসীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দেব না !'

কথাটা শ্রীচৈতন্য বলেননি, বলেছেন নিত্যানন্দ। কিন্তু রোহিণীর ইংরেজি বিদ্যার মতো ধনেশ্বরের ভুল শুধ্‌রে দেবার চেষ্টা করাও বৃথা।

—হুঁ—সংক্ষেপে সমর্থন করলে রঞ্জন।

—আর এই ভারতবর্ষের মূর্ত প্রতীক হলেন ত্যাগের অবতার মহাত্মা গান্ধী। অহিংসা—প্রেম। রক্ত দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করতে হবে, জয় করতে হবে তার অন্তরের পশুত্বকে। এ শুধু মহাত্মার কথা নয়, সমস্ত

দেশেরও প্রাণের কথা। কী বলো?

—ঠিক।

তত্ত্বালোচনায় বাধা পড়ল। উর্দিপরা একটা চাপরাশী ঢুকল ঘরে, টেবিলের ওপর দু প্লেট মিষ্টি আর চা সাজিয়ে দিয়ে গেল। আহা, আসল কাকাবাবু যে নয়, কে বলবে!

খাও, খাও—সস্নেহে বললে ধনেশ্বর। স্থান কাল পাত্র অনুকূল নয়, তবু কেন কে জানে হঠাৎ করুণাদিকে তার মনে পড়ে গেল।

—হ্যাঁ, যা বলছিলাম—ধনেশ্বর চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, তাই এই অহিংসার দেশে যারা রক্তপাতের কল্পনা করে তারা ভারতবর্ষের শত্রু। এই শত্রুদের ক্ষমা করা উচিত নয়, কারণ এরা মহাত্মার পবিত্র আদর্শের অসম্মান করে। দেশের আদর্শকে বজায় রাখবার জন্যে এইসব লোককে অবিলম্বে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়া আমাদের কর্তব্য।

গায়ের লোমকূপগুলো শিরশিরিয়ে উঠল রঞ্জনের। ঝুলির ভেতর থেকে বেড়ালটা উঁকি দিয়েছে।

—জানোই তো—চায়ের কাপ শেষ করে একটা থ্যাবড়া আঙুলে চুরুটে টোকা দিলে ধনেশ্বর, শব্দ করে খানিকটা ছাই পড়ল কাপের তলানিতে: আমাদের এই শহরেও দেশের সেই শত্রুরা ঘাঁটি বসিয়েছে। বন্দুক রিভলভার চুরি হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে এদিকে ওদিকে। এখন থেকেই এই ছোকরাদের সম্পর্কে সাবধান হওয়া দরকার। এ ব্যাপারে তুমি আমার আত্মীয়, আশা করি, আমাকে সাহায্য করবে।

ঝুলির ভেতর থেকে একলাফে বেরিয়ে পড়ল বেড়ালটা।

—আমি—আমি—জড়ানো গলায় রঞ্জন বললে: আমি তো—

—হ্যাঁ তুমি। ধনেশ্বর হাসিমুখে জবাব দিলে। কিন্তু অবচেতন মনটা হঠাৎ টের পেল—এই মুহূর্তে ধনেশ্বরের চোখ দুটো পোকাধরা টিকৃটিকির মতো সজাগ হয়ে উঠেছে: তোমাদের 'তরুণ-সমিতি' সম্পর্কে গোটা কয়েক খবর চাই। আশা করি, কাকাবাবুর কাছে মিথ্যে বলবেনা তুমি।

ভয়াতুর চোখে রঞ্জন তাকিয়ে রইল। কী বলবে বুঝতে পারছে না।

—তুমি 'তরুণ-সমিতি'র মেম্বার তো?

নিরুত্তরে হেলাল ঘাড়টা। হাঁ, সে মেম্বার।

—তোমাদের লাইব্রেরীয়ান্ ক্ষিতীশ চক্রবর্তীকে চেনো আশা করি?

ক্ষিতীশ চক্রবর্তী! সব গোলমেলে মনে হল। ক্ষিতীশ চক্রবর্তী—

ক্ষিতীশদা! 'তরুণ-সমিতি'র মধ্যে সব চেয়ে নিরীহ আর গোবেচারা লোক। বঙ্কিম আর মাইকেল নিয়ে পড়ে আছেন—যেন একশো বছর আগেকার মানুষ। ওরা ক্ষিতীশদাকে করুণা করে। ভদ্রলোক শুধু 'কৃষ্ণচরিত্র' পড়ে আর খাতা লিখেই কাটালেন, ঘুণাক্ষরেও জানলেন না চারপাশে কী ভয়ঙ্কর একটা অগ্নিচক্র চলেছে আবর্তিত হয়ে। ওঁকে ওরা এড়িয়ে চলে সযত্নে, কোনো জরুরি কথার সময় ওঁকে আসতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে যায়। সেই ক্ষিতীশদার কথা জানতে চাইছে ধনেশ্বর! লোকটার কি মাথা খারাপ! অথচ যে নামটার জন্যে প্রতীক্ষা করছিল—

—চেনো নিশ্চয় তাকে।

—হাঁ, চিনি বইকি।—মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল রঞ্জনের।

—কেমন লোক?—ধনেশ্বরের গলায় চোঙাটা আবার উঠল গম্‌গমিয়ে।

রঞ্জন সবিস্ময়ে বললে, খুব ভালো গোবেচারা লোক।

—খুব ভালো গোবেচারা লোক—অ্যাঁ?—ধনেশ্বরের মুখের চেহারা কঠিন হয়ে উঠল: খুব গোবেচারা লোক! ভাজা মাছটিও উল্‌টে খেতে জানে না, অথচ আজ পার্বতীপুর ষ্টেশনে ওই লোকটিকেই অ্যারেস্ট করা হয়েছে—তা জানো?

রঞ্জন অব্যক্ত শব্দ করল একটা।

—ওই ভালো লোকটির আসল নাম ক্ষিতীশ চক্রবর্তী নয়! চমকাচ্ছ? তবে আরো শোনো। ওর নাম মণি মুখার্জি, এলাহাবাদের বিখ্যাত টেররিস্ট্ নেতা। রবারি, কন্‌স্পিরেসি এগেনস্ট্ ক্রাউন, আর্মস অ্যাক্ট আর পোলিটিক্যাল মার্ডারের চার্জে আজ পাঁচ বছর ধরে ওকে খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে। উই হ্যাভ্ গট্ হিম অ্যাট লাস্ট। সঙ্গে একজোড়া লোডেড রিভলভারও ছিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, লোডেড রিভলভার। ফাঁসি না হোক ট্রান্সপোর্টেশন ফর লাইফ হয়ে যাবে নিশ্চয়। বুঝেছ হে!

কাঠ হয়ে রইল রঞ্জন। ক্ষিতীশদা—নিরীহ নির্বোধ সেই লাইব্রেরীয়ান! কথা বলতে বলতে বার বার 'বেশ বেশ' বলেন, বাড়িয়ে দেন চাঁদার খাতা আর গুণগান করেন বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের। সেই ক্ষিতীশদার ভেতরে লুকিয়ে ছিল এই বিপুল অগ্নি-যন্ত্রণার ইতিহাস! রূপকথা-বিভোর মন কোন্ নতুন রূপকথা শুনছে আবার।

না, না এ বিশ্বাস করা সম্ভব নয়!

ধনেশ্বর বললে, ওই লোকটা, মানে চীফ্ অর্গানাইজার অব্ দি পার্টি,

তরুণ সমিতির ভেতর কতটা এগিয়েছে তাই জানতে চাই আমি। আশা করি, তোমার কাছ থেকে পাকা খবর পাব একটা।

বিস্ময়টাকে সামলে নিয়ে রঞ্জন দৃঢ় হয়ে গেছে এতক্ষণে। মন্ত্রগুপ্তি, বিপ্লবীর শপথ, বিপ্লবীর সংকল্প। কখনো দলের কথা কারুর কাছে প্রকাশ করব না, প্রাণ গেলেও করব না সত্যভঙ্গ। হাজার অত্যাচার আসুক, আসুক মর্মান্তিক শারীরিক আর মানসিক যন্ত্রণা, বুকের ভেতর বজ্রের মতো কঠিন প্রাচীর গড়ে তুলে রক্ষা করব সেই গোপনতাকে। মনে রাখব আমার একটু মাত্র দুর্বলতার অবকাশে এত আয়োজন আমাদের বৃথা হয়ে যাবে, একটু মাত্র অসতর্কতার অমার্জনীয় অপরাধে মিথ্যে হয়ে যাবে শত শত শহীদের আত্মদান।

চাপা কঠিন ঠোঁটে বললে, কী খবর চান ?

—তরুণ সমিতির আসল উদ্দেশ্যে কী ? তার প্ল্যান আর প্রোগ্রামই বা কী ?

নিরীহ নির্বোধের জবাব এল : কেন ভালো ভালো বই পড়া, জিমন্যাস্টিক্ করা এই সব।

ঘোঁৎ করে আবার শব্দ করলে বুলডগটা, কোঁৎ করে একটা মশা খেয়ে নিলে। তারপর দু-পাশের ঝাঁটা গোঁফগুলোকে সজারু কাঁটার মতো ছড়িয়ে দিয়ে হাসল : আরে, এ তো সবাই জানে। কিন্তু যা সবাই জানেনা, সেই রকম দুটো চারটে খবর চাই যে—খোকা ছেলে।—কাকাবাবুর স্বরে স্নিগ্ধ ভর্ৎসনার আমেজ : কী কী ভালো বই পড়ে ? এই সব ?

তারপর গড়গড় করে কতগুলো বইয়ের নাম আউড়ে গেল ধনেশ্বর। বিস্ময়ে চমকে উঠল মন। আশ্চর্য, ঠিক এই বইগুলোই প্রথম তাকে পড়িয়েছিল পরিমল, এই বইগুলোর আগুনঝরা লেখা ছড়িয়েই রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল রঞ্জনের। আশ্চর্য, ঠিক বেছে বেছেই তো বইগুলোর নাম করে যাচ্ছে ধনেশ্বর !

—না, এসব বই আমি কোনোদিন দেখিনি।

—দেখোনি !—ধনেশ্বরের মুখের থেকে হাসি মিলিয়ে গেল, কাঁটা-ফোলানো সজারুটা আবার রূপ পেল ঝাঁটা গোঁফে : মিথ্যে বোলো না। তুমি আমার আপনার লোক, আমার ঘরের ছেলের মতো। সেই জন্যেই যাতে তোমার সব দিক থেকে ভালো হয় সেই চেষ্টা করছি আমি। সত্যি বলো, এ সব বই তুমি দেখোনি।

—না।

ধনেশ্বরের চোখ দুটো নেচে উঠল, যেন রঞ্জুর পেছনে দাঁড়ানো কাউকে চোখ টিপল সে।

—না? বেশ। কিন্তু এঞ্জিনিয়ার কামিনীবাবুর বাড়ি থেকে তাঁর বন্দুকটা চুরি করেছে কে তা জানো?

—না, তাও জানি না।

—হালদারের দোকানে ডাকাতিতে কে কে ছিল বলতে পারো?

—না।

—না? অ্যাঁ—খোঁচা-খাওয়া বিরক্ত বানরের মতো একটা খ্যাঁচানো আওয়াজ করলে এবার ধনেশ্বর, সোনা-বাঁধানো দাঁত দুটো যেন সামনের দিকে এগিয়ে এল একেবারে কামড়ে দেবার জন্তে! বললে, শোনো। তুমি আমার নিজের লোক বলেই ভদ্রভাবে তোমার কাছে সব কথার উত্তর চাইছি। যদি এখনো না দাও, তা হলে তা আদায় করবার উপায় আমার জানা আছে। কিন্তু ওসবের মধ্যে যেতে চাই না, যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দাও।

—আমি কিছুই জানি না।

ধনেশ্বরের আগ্নেয় চোখটা আবার হাসিতে কোমল হয়ে এল। মুখের ওপর ঝাঁটা গোঁফ আবার সজারুর মতো পেখম মেলল: আমি বুঝতে পারছি, তুমি কেন ভয় পাচ্ছ। ওই গুণ্ডা ছেলেগুলো টের পেলে মারধোর করতে পারে। কিন্তু জেনো,—ধনেশ্বরের স্বর আবার উদাত্ত: যতক্ষণ কাকাবাবু আছে ততক্ষণ তোমার আঙুলের ডগাটিও কেউ ছুঁতে পারবে না। আর তা ছাড়া যে স্টেটমেন্ট্ তুমি দেবে, পৃথিবীর কেউ তা জানতে পারবে না এ সম্পর্কেও নিশ্চিন্ত থাকো।

ধনেশ্বর একটা কাগজ কলম টেনে নিলে: তুমি সব বলো, আমি লিখে যাই।

—আমার বলবার তো কিছুই নেই।

ধনেশ্বর কলমটা নামিয়ে রাখল। হিপ্‌নটাইজ করবার আগে যেমন করে তাকায় যাদুকর, তেমনি বলে চলল: ভেবে দেখো তোমাদের সংসারের অবস্থা। তোমার মায়ের শোকে বাবা প্রায় পাগলের মতো হয়ে আছেন। এ অবস্থায় যদি তোমাকে জেলে যেতে হয়, তা হলে—আহা দেবতুল্য মানুষ—ধনেশ্বর আবেগ-ভরে বললে: তা হলে তিনি হার্টফেল করে মরবেন। বলো, এখন কি তাঁকে তোমার এমন 'শক' দেওয়া উচিত? যা জানো বলো। এ স্টেটমেন্টের খবর আমি আর তুমি ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ জানবে না—নিশ্চিন্ত থাকো। বুঝেছ?

—আমি কিছুই জানি না।

—আমার কাছে মিথ্যে বলতে চেষ্টা কোরো না। জেনে রেখো, বাতাসেও আমার কান পাতা আছে। একদিন সব খবর আমি পাবই। আজ যদি সব কথা বলো, তা হলে জেনো সেদিন তোমার কোন ভয় নেই, বরং ভালো একটা চাকরী-বাকরী যাতে পাও তার ব্যবস্থাই আমি করে দেব।

—কিন্তু কিছুই আমার জানা নেই।

—Shut up! ধনেশ্বর এবার ফেটে পড়ল: ছেলেখেলা কোরো না, এ ছেলেখেলার জায়গা নয়। আপনার লোক বলেই এতক্ষণ প্রশ্রয় দিয়েছি—But no more! স্টেট্‌মেণ্টটা দিয়ে চলে যাও—you will remain under the safest protection of the British Government! আর যদি পরে ধরা পড়ো, ফাঁসিতে ঝুলতে হবে, দ্বিপান্তরে যেতে হবে and you will have no sympathy from anywhere—বুঝতে পারছ?

—আমি কিছুই জানি না।

—জানো না?—তবে কী করলে তুমি জানো সে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ইয়াদ মিঞা?

—স্যার?

—আমার হাণ্টার। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না।

হাণ্টার এল। শরীরের সমস্ত পেশীগুলোকে দৃঢ় করে স্থির হয়ে বসে রইল রঞ্জন। শুধু তার ঠোঁটের কোনা দুটো অল্প অল্প কাঁপতে লাগল—তার বেশি কিছুই না।

—জবাব দেবে না?

—আমি জানি না।

—Take it then—গর্জন করে ধনেশ্বর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু মনের ভেতরে যখন আগুন জ্বলে, পরাধীনতার অপমানে সমস্ত বুক যখন পুড়ে খাক হয়ে যেতে থাকে তখন কি শরীরে আর কোনো অনুভূতিই জেগে থাকে না? শুধু পাথরের গায়ে ঘা দিয়ে সে আঘাত ঠিকরে ফিরে আসে, শুধু একটা কঠিন জড়পিণ্ডকে ক্রুদ্ধ হতাশায় ঘুষি মেরে নিজেকেই আহত করে তোলা হয়?

তাই কিছুই টের পেলে না সে। এমন কি নিজের নাক থেকে রক্ত গড়িয়ে বুকের জামাটাকে ভিজিয়ে দিলে, তখনো না! তারপর এক সময় সব আচ্ছন্ন হয়ে গেল, ঘরটা ঘুরতে লাগল চোখের সামনে, বুলডগের হিংস্র বীভৎস মুখটা ক্রমে ক্রমে আস্‌তে লাগল সুস্পষ্ট হয়ে। তার ওপর শুধু রাশি রাশি হলদে

কুয়াশা, আর কিছুই নেই।

একেবারে কিছুই নেই।

মিতা বললে, খুব লেগেছিল, না?

অল্প করে হাসল রঞ্জন: টের পাইনি। ওটা কাকাবাবুর স্নেহের শাসন কিনা।

—টের পাওনি? কী সর্বনাশ!—মিতা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল: এমন করে মারল তবু টের পাওনি! আশ্চর্য তোমরা মানুষ বাপু। অসাধ্য কাজ নেই তোমাদের।

—টের পেলেই বা কী? রঞ্জন আবার হাসল: কুকুরে যখন কামড়ায় তখন সে কামড়াবেই। সে কামড়ে জ্বালা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তার জন্যে ছটফট করলে কুকুরটাকে মূল্য দেওয়া হয়।

মিতা বললে, উঃ, ওরা কি মানুষ?

—না। ওরা প্রভুভক্ত। মানুষ ওদের চাইতে সম্মানের জীব।

—তা সত্যি।

সশ্রদ্ধ শঙ্কায় রঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মিতা। তার দৃষ্টিতে বীর-পূজার মুগ্ধ অনুরাগ। ওর এত বীরত্বে বিশেষভাবে বিচলিত হয়েছে সে, চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এমন কি এই ব্যাপারে সেদিনকার সেই সন্ধ্যার ইতিহাসটাকেও সে ভুলে গেছে হয়তো। ভুলে গেছে সেই মাতলা বাতাস আর বৃষ্টির পাগলামিতে কেমন করে তার একখানা হাত তার হাতের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল রঞ্জনের।

—ওরা কি সকলের ওপরই এমনি করে নাকি?

—হয়তো করে—ঠিক জানি না। তবে যাদের অ্যারেস্ট করে রাখে তাদের ওপর অত্যাচারটা চলে আরো বেশি রকমের। কারণ সেটা নিরাপদ—বাইরে জানাজানি হওয়ার ভয় নেই।

—কী ভয়ানক!—রুদ্ধস্বরে জবাব দিলে মিতা: কিন্তু বড় বড় সবাই থাকতে হঠাৎ বেছে বেছে তোমার ওপর নজর পড়ল কেন?

—কারণটা সহজ। ভেবেছিল আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে সুবিধে করে নেবে।

—কী শয়তান।

—তা ছাড়া বড়রা শক্ত, তাদের নোয়ানো যায় না। দুর্বলদের ভেতর থেকেই অ্যাপ্রুভার জোগাড় করা সহজ হয় কিনা! ও তো একটা পুরোনো টেক্‌নিক্!

মিতা আতঙ্কিত আর বেদনার্ত চোখে চেয়ে রইল অন্যমনস্কের মতো। সে ভুলে গেছে, ভুলে গেছে বর্ষার সন্ধ্যার সেই আকস্মিক বিভ্রান্তিটুকুকেও। হয়তো বিভ্রান্তি তারও নয়, একান্তভাবেই সেটা রঞ্জনেরই, তারই নিজের মনের একটা নিরর্থক দুর্বলতা। যা ঘটেছিল তা একান্তই আকস্মিক। আর তার জন্তই সেটাকে এত সহজভাবে নিতে পেরেছে মিতা।

কিন্তু রঞ্জন কেন পারছে না ওই রকম সহজভাবে নিতে? কেন এমনভাবে তার বুকের ভেতরটা ঢেউ খাচ্ছে? কেন মনের ভেতরে সেটা ঝিমঝিম করছে সারাক্ষণ? অনেকদিন পরে কেন বারে বারে মনে পড়ছে সেই শিশু-কল্পনার নীল চশমার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া চাঁপার পাপড়ির মতো দিনগুলোকে? সেই জানলায় এসে বসা নীল পাখিটাকে মনে পড়ে। মনে পড়ে, ভোরে ফোটা শিউলির মতো উষার মুখখানাকে। আর এতদিন পরে আকাশ থেকে কেন আসে সাত ভাই চম্পার হাতছানি? জ্যোতির্ময় আকাশগঙ্গার স্রোতে ভেসে যেতে একরাশ বুনো-ফুল কেন তাকে পথ ভোলায় আজকে?

তাই যতই সহজভাবে কথা বলতে চাইছে সে, সহজ তো হতে পারছে না কিছুতেই। প্রতিটি কথার সে জবাব দিচ্ছে বটে, কিন্তু সে জবাব শুধু ঠোঁট নড়া, শুধুই গলার কয়েকটা অভ্যস্ত শব্দ। আসল কথা, উঠে পালাবার জন্যে ছটফটানি জেগেছে। মিতার কাছে একা বসে থাকবার মতো সাহস নেই, শক্তিও নেই তার। আশ্চর্য! সেই ভীরু ছেলেটি এই তিন বৎসরে তো কত বদলে গেলে। আজ আর মৃত্যু বিলাস নেই। দীক্ষা পেয়েছে কঠোর, ক্লান্তিকর, আর দুর্গম পথ যাত্রার। ধনেশ্বরের হান্টারের ঘা যখন একটার পর একটা এসে পড়েছিল, যখন টের পাচ্ছিল তার বুকের জামায় রক্তের ফোঁটা পড়ছে টপ টপ করে, তখনও অনুভব করেছিল তার শরীরের কোনো যন্ত্রণা নেই—যেন তা পরিণত হয়ে গেছে পাথরে। সে বিপ্লবী, সে নির্ভয়। কিন্তু তিনি বছর আগে মিতার কাছে এসে যে দুর্বল সংশয় তাকে কুঁকড়ে দিয়েছিল, আজো কেন সে নিস্তার পাচ্ছে না তার হাত থেকে? কেন আজও সে এখানে এসে যথেষ্ট পরিমাণে দৃঢ় হয়ে উঠতে পারল না?

মিতা বললে, ক্ষিতীশদাকে আমিও দেখেছি। খুব নিরীহ মানুষ বলে মনে হয়েছিল। দাদাও বলত, ক্ষিতীশদা এসবের মধ্যে নেই। কিন্তু আশ্চর্য!

—হুঁ।

নাঃ, ভালো লাগছে না। উঠে পড়াই উচিত। আরো কী অদ্ভুত যোগাযোগ—এ বাড়িতে যেদিনই সে আসবে সেদিনই কী পরিমল ইচ্ছে করে

থাকবে না বাড়িতে ? আর ঠিক এই সন্ধ্যার সময় এত বড় বাড়িটা এমনি নির্জন হয়ে যাবে একটা প্রাকৃতিক নিয়মে ? মিতার বাবা তাদের ক্লাবে যাবেন টেনিস্ আর ব্রিজ খেলতে, ওর পিসিমা জপের মালা নিয়ে পুজোর ঘরে দরজা বন্ধ করবেন—আর চাকরগুলো সব এদিকে ওদিকে জটলা পাকাবে ? শুধু ও আর মিতাই মুখোমুখি বসে থাকবে—আর কেউ নয় ?

আজও পালাচ্ছিল কিন্তু মিতাই ডেকে আনল। ডেকে আনল ওপরে পড়ার ঘরে কেন ডেকে এনেছে সে তা জানে ; তার মুখ থেকে ধনেশ্বরের বিবরণ পুরোপুরি শুনবার একটা নির্দোষ কৌতূহলটা বুঝতে পেরেও স্বাভাবিক হতে পারা যাচ্ছে না, ওর কথার জবাব দিতে গিয়ে দৃষ্টি যেন ঘন হয়ে আসছে—ভারী হয়ে উঠছে নিজের গলার স্বর। নিজের এক একটা কথায় নিজেই চমকে উঠছে সে।

—পরিমল কখন ফিরবে ?

—বাবা ক্লাব থেকে আসবার আগে। কিন্তু সে আটটাও বাজতে পারে, সাড়ে আটটাও বাজতে পারে।

—তা হলে আজ যাই—

উঠে দাঁড়াতে যাবে, এমন সময় মিতা অস্ফুট একটা শব্দ করল : এ কি, কপাল দিয়ে যে রক্ত পড়ছে তোমার !

চুলের তলায় খানিকটা কেটে গিয়েছে। হয়তো ধনেশ্বরের হাণ্টারে, নয়তো অন্য কোনো কারণে। শিরাগুলোর স্ফীত উত্তেজনায় বোধ হয় তার মুখ খুলে গিয়ে রক্ত নামছে গড়িয়ে।

—কী সর্বনাশ ! দাঁড়াও দাঁড়াও, আইডিন দিয়ে দিচ্ছি।

—থাক, দরকার নেই।

—দরকার নেই বললেই হয় ? দাঁড়াও, পাগলামি কোরো না।—মিতা ছুটে গিয়ে আইডিনের শিশি নিয়ে এল। এগিয়ে এল কাছে, আঙুলের স্পর্শ লাগল কপালে—শরীর শিউরে উঠল রঞ্জনের। মিতার শাড়ী আর চুল থেকে একটা নেশা ধরানো গন্ধ যেন স্পর্শ করল তার স্নায়ুকে। হৃৎপিণ্ডের ভেতর কাঞ্চন নদীর ছোট ঢেউয়ের মতো কী যেন কল শব্দে ভেঙে পড়তে লাগল।

শেষ রাত্রের শিশির-ঝরা গলায় মিতা বললে, রঞ্জনদা ?

—বলো।

—আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

—কেন ?

—জানি না—প্রায় নিঃশব্দ স্বর : শুধু ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে একটা। ওরা এমন নিষ্ঠুরের মতো তোমাকে মারল কেন রঞ্জনদা, কেন তোমাকে মারল ?

ঘরের শান্ত আলোয় মিতার দু চোখে শিশির টলমল করতে লাগল : তুমি জানো, আমার কী অসহ্য কষ্ট হচ্ছে ? রঞ্জনদা, তুমি আসবে বলে আমি পথ চেয়ে থাকি, তুমি চলে যাওয়ার পর আমার মন এত খারাপ হয়ে যায় ! তোমাকে ওরা মারল ! রঞ্জনদা—

চোখে বেয়ে নেমে এল জল। শিশির পড়া থেকে বর্ষণ। আর মাথাটা যেন আপনা থেকেই রঞ্জনের বুকের মধ্যে এসে পড়ল : রঞ্জনদা !

একটা সাইক্লোনের দমকায়, একটা ভয়ানক ভূমিকম্পে টলমল করে উঠল পৃথিবী। সব চেয়ে পুরানো কবিতা সব চেয়ে নতুন সুরে গান গেয়ে উঠল, একরাশ ঘূর্ণি হাওয়ার মাতলামিতে সব কিছু ওলট-পালট করে দিলে। চুম্বনের পর চুম্বনের ব্যাকুলতায় সমাপ্ত হয়ে গেল এতদিনের সমস্ত অসমাপ্ত কবিতা, কপালের রক্ত চিহ্নটা তার বিপ্লবিনী নায়িকার ললাটে এঁকে দিলে জীবন-বন্ধনের সীমান্তরাগ।

—সতেরো—

"এখন যে কী ভয়ানক কাজ পড়েছে, তা লিখে তোমায় বোঝাতে পারব না। সারাটা দিন বাইরে ছুটোছুটি করে এই ফিরে এলাম। এখন রাত প্রায় নটা। ঘরে ঢুকে আলোটা জেলেই তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি।

পালপাড়ার সেই চালের কলগুলোর কথা মনে আছে তো তোমার ? ওখানে একটা ইউনিয়ান করেছি আমরা। তুমি শুনলে বিশ্বাস করবে, আমি এক্ষুণি সেখানে বক্তৃতা দিয়ে এলাম ? তোমার হাসি পাচ্ছে তো ? কিন্তু জানো—যাদের কাছে বলেছি তারা একটুও হাসেনি। কী অদ্ভুত আলোয় জলছিল তাদের চোখ, কী কঠিন হয়ে উঠেছিল তাদের মুখের চেহারাটা। থেকে থেকে হাত মুঠো করে ধরছিল তারা—আমার মনে হচ্ছিল যেন মুঠির ভেতর বজ্র পেয়েছে কুড়িয়ে। আশ্চর্য, এতবড় শক্তিকে আমরা এতকাল ভুলেছিলাম কী করে !

আমাদের শান্তিদাকে মনে আছে—সেই Fire-brand শান্তি মৌলিক ? সে আজকাল সন্ন্যাসী হয়েছে—গেরুয়া পরে, শুনছি একটা ব্রহ্মচর্য আশ্রম খুলবে।

রাজনীতির নাম শুনলে তেলে-বেগুনে জলে ওঠে। বলে, পরমার্থ ছাড়া পথ নেই। সুতপাদির খবর আরো ইণ্টারেষ্টিং। সে তোমায় পরে লিখব।

দাদা গ্রামে গ্রামে ঘুরছে, ন মাসে ছ মাসে একদিন ঝোড়ো কাকের চেহারা নিয়ে দেখা দেয়। এখানকার যত কাজের ঝক্কি আমাকেই পোয়াতে হচ্ছে।

এত কাজ—এত অদ্ভুত ভালো লাগে কাজ করতে। তবুও তোমাকে এই যে চিঠি লিখতে বসেছি, বাইরে চাঁদ ডুবে যাওয়া অন্ধকার থেকে এই যে ঝিরঝির করে হাওয়া আসছে, এখন ভাবি, তুমি পাশে থাকলে কত কাজ যে আরও করতে পারতাম! একটা উদ্‌ভ্রান্ত সন্ধ্যা মনে পড়ে? সেদিন তোমাকে আমি ঘৃণা করতে শুরু করেছিলাম—মনে হয়েছিল তুমি একটা বিষাক্ত কালো সাপ ছাড়া আর কিছু নয়। আজ মনে হয় তুমিই আমার সবচেয়ে বড় ইন্‌সপিরেশন!

তুমি কবে আসবে? সবাইকেই তো ছেড়ে দিচ্ছে একে একে, তোমাকে কবে ছাড়বে?

কিন্তু সত্যি, কবে আসবে তুমি?"

চিঠিটা যত্ন করে খামে ভাঁজ করে রাখল রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। মিতা অপেক্ষা করে আছে। আজ আর ব্যবধান নেই—আজ দুজনের মাঝখানে জীবনের একটা নিশ্চিত পথ তৈরী হয়ে গেছে। পরিমল আর মিতাকে ওদের বাবা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। মিতা একটা স্কুলে মাস্টারী করে, পরিমল ঘোরে গ্রামে গ্রামে। রূপকথার মেয়ে আজ মাটির কন্যা। আজ আর অবাস্তব কোনো স্বপ্ন-চারণার মধ্য দিয়ে পৌঁছুতে হয় না তার কাছে। মাটির মাধ্যাকর্ষণে ছায়া-তরুতে সার্থক হয়েছে আকাশী অর্কিড। কিন্তু সেই —সেদিন?······

সেদিন যখন ওই বাড়িটা থেকে রঞ্জন বেরিয়ে এল, তখন চোখে সব ঝাপসা দেখছে সে। হঠাৎ চারদিকে থরে থরে কুয়াশা নেমে এসেছে যেন। একটা শাদা শূন্যতা ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো রূপ নেই তখন। শুধু বাইরের নয়: মনের ভেতরে তাকিয়েও সে আর কিছুই যেন খুঁজে পেলো না। সে আর কোথাও নেই—কোনোখানেই কিছু আর অবশিষ্ট নেই তার। শরীর-মন—সব কিছুর সমষ্টিভূত সত্তা হঠাৎ যেন দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে গেছে বাইরের এই গাঢ়-গভীর কুয়াশায়।

চরিত্রহীন—বিশ্বাসঘাতক! কামান গর্জনের মতো শব্দ উঠছে দু কান

ভয়ে। আকাশে উড়তে উড়তে শাপগ্রস্ত দেবদূত আছড়ে পড়ছে অসীম শূন্যতার ভেতর দিয়ে; সূর্যের অগ্নিধারায় পাখা পুড়ে গেছে দুঃসাহসী আইকারাসের। সে পড়ছে—ছুটে পড়ছে—তীব্র ভয়ঙ্কর বেগে পড়ছে কেন্দ্র-স্খলিত উল্কার মতো। হুহু করে বাতাসের কান্না ঝাপট মারছে—আর বহু নিচে মৃত্যু-সমুদ্রের কালো তরঙ্গ চুম্বকের মতো টেনে নিচ্ছে তাকে—অমোঘ পরিণামের সংকেত শোনা যাচ্ছে তার উদ্বেল অট্টহাসিতে।

কী হল—এ কী হল!

তাকে ডাক দিয়েছিল পরাধীন দেশ; ডাক পাঠিয়েছিল তেত্রিশ কোটি অত্যাচারিত মানুষের অসহায় কান্না। সেদিন কালী-ধাঁদু-ভোনার অপরিচ্ছন্ন পরিধি থেকে বেরিয়ে এসে পেয়েছিল শহীদ স্বর্গের অধিকার। আর আজ?

বেণুদার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না—পুড়ে যাবে তার চোখের আগুনে। পরিমলের মুখের দিকে তাকাবার আগে মিলিয়ে যাবে মাটিতে। আজ সে নরেন গোঁসাই, নেত্রসেনের সগোত্র, বিপ্লবের আন্দোলনের রক্তপত্রে আর একটি কালির বিন্দু।

বেণুদার দুর্বলতার খবর সে জানে। কিন্তু কার সঙ্গে কার তুলনা! অনির্বাণ আগুনের পাশে একটা পোড়া ছাইয়ের টুকরো। সুতপার পাশে মিতা! সেও ওই আগুনের কাছে একটুকরো ছাইয়ের অতিরিক্ত কিছু নয়!

কাকে ভেবেছিল সে ড্র্যাগন দ্বীপের বন্দিনী রাজকন্যা। ওই ফুল আর ধূপের গন্ধভরা বাড়িটা—যেখানে পা দিতে বোধ করত অনধিকারীর সংকোচ—সত্যিই কি ও বাড়িটাকে চিনতে পেরেছিল সেদিন? নিজের কাছেই ফাঁকি ছিল বইকি। লোভ জেগেছিল তার—রূপকথাবিলাসী পা দিয়েছিল আর একটা রূপকথার দেশে; যার মূল নেই ক্ষুধিত ভারতবর্ষের মাটিতে—যার সঙ্গে সংযোগ নেই কোটি লাঞ্ছিতের রক্তনাড়ীর। সব রূপকথাই আজ ফেটে মিলিয়ে যাচ্ছে বেলুনের মতো—এও গেল। কিন্তু শুধু গেলই না—সেই সঙ্গে চূর্ণ চূর্ণ করে, কণায় কণায় রঞ্জনকেও মিলিয়ে দিল যে। চরম মূল্য দিয়ে লাভ করল তার পরম অভিজ্ঞতা।

এলোমেলো ভাবে পা ফেলে চলতে লাগল রঞ্জন। কোথায় যাবে মনে নেই, কোথায় যাচ্ছে, জানে না। হঠাৎ সে টের পেল, তার কপালের একটা জায়গায় অসহ যন্ত্রণা চমকে চমকে যাচ্ছে, পিঠে-হাতে-পায়ে টনটন করছে ব্যথা। মনে পড়ল ধনেশ্বরের হান্টারের কথা। এতক্ষণ তাকে ঘিরে ছিল একটা গৌরবের বর্ম; সমস্ত ঘা সেই অক্ষয় কবচকুণ্ডলে প্রতিহত হয়ে পড়ে

গেছে ঠিকরে ঠিকরে। কিন্তু সে বর্ম আজ হারিয়েছে রঞ্জন। তাই এই হান্টারের ঘা গুলো এখন এসে পড়েছে নির্ভুল লক্ষ্যে—খেঁতলে দিচ্ছে তার মাংস।

পথের দুপাশ থেকে কখন যে অনেক পেছনে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে মিউনিসিপ্যালিটির ঝাপসা ল্যাম্পগুলো, কখন যে পায়ের নিচ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছে কংক্রীটের রাস্তাটা, টেরও পায়নি সে। শিশিরভেজা ধুলো এখন জড়িয়ে জড়িয়ে উঠছে হাঁটু পর্যন্ত। দুধার থেকে জংলা বাগান তাকে জড়িয়ে ধরছে ঘন কালো ছায়ার আলিঙ্গনে। শুধু সামনের নীলকৃষ্ণ আকাশে দপ দপ করছে সিংহরাশি। শীতল, কঠিন নক্ষত্রমালা থেকে বর্শা-ফলকের মতো তীক্ষ্ণ আলো ছুটে আসছে রঞ্জনের দিকে।

কোথায় চলেছে এই পথ? জানবারও দরকার নেই আর। সেই ছেলেদের মতো আজও নিশি পেয়েছে তার। ভয়ের মধ্য দিয়ে ডেকে নিয়ে অবিনাশবাবু দিয়েছিলেন নির্ভয়তার মন্ত্র। কিন্তু আজ সে চলেছে কোথায়? সেই গল্পে-পড়ার মতো শয়তান কি তার হাত ধরে সশরীরে নিয়ে যাচ্ছে বিশ্বাসঘাতকদের ইন্‌ফার্ণোতে?

ড্রাজন-দ্বীপের রাজকন্যা! দুটো হাত এত জোরে রঞ্জন মুঠ করে ধরল যে মণিবন্ধের কাছে রক্তবাহী শিরাদুটো যেন ফেটে যেতে চাইল তার। এই হাতে কাউকে এখন সে খুন করতে চায়। কিন্তু কাকে?

না—ড্রাগন দ্বীপের রাজকন্যা নয়। ও মায়া রাক্ষসীর মারণ-মন্ত্র। এতদিন পরে হেনার কুঞ্জের আড়ালে, ছবির মতো সাজানো ওই বাড়িটাতে সে চিনতে পেয়েছে পাশাবতীর রাক্ষসীরূপ। কঙ্গোর জঙ্গলে লোভী মোক্ষিকাকে মৃত্যু-ফুলের ডাক; পৌরাণিক দ্বীপ থেকে সাইরেনের বাঁশি।

কঠিন মুঠির নীচে দপ দপ করছে থেমে দাঁড়ানো ঘন-রক্তের উচ্ছ্বাস। যেন আগুন জলে যাচ্ছে সারা গায়ে। মিতার ছোঁয়া সারা শরীরকে কুরে কুরে তার। নিজের ওপরে অসহ্য ঘৃণায় মোমের মতো পুড়ে পুড়ে গলে যাচ্ছে সে।

কিন্তু সুতপা আর বেণুদা—

চোপ রও বেয়াদব! আকাশফাটা একটা গর্জন যেন শুনতে পেল সে। ও নিয়ে ভাববার কোনো অধিকার নেই তোমার। কী তুমি? একটা বুদ্‌বুদ মাত্র। ছেলেবেলা থেকে শুধু নানা রঙে রঙিয়েই উঠেছে। কী ত্যাগ করেছে, কী মূল্য তুমি দিয়েছ দেশকে? আজ আগুনের সঙ্গে তুলনা করে নিজের সাফাই গাইতে চাও!

কিন্তু কিছুই কি করবার নেই ?

আছে। মনের মধ্যে ফেটে পড়ল বোমা, থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে। আছে; উপায় আছে। একমাত্র উপায়। কাল সূর্যের আলো ফোটবার আগে, তার কালো মুখখানা সকলের চোখের সামনে ধরা পড়বার আগেই তা করে ফেলা যায়।

কোনো মানে হয়না দ্বিধা করবার। নিজের বিচার যদি নিজে সে না করতে পারে, পার্টি করবেই। বিপ্লবের রক্তপত্রে ছড়িয়ে যাবে আর একটি কালির বিন্দু। তার আগেই—

চারদিকে তাকিয়ে দেখল সে। আরো জঙ্গল, আরো অন্ধকার, আরো রাত্রি। সামনের ঘন গাছপালার আড়ালে সিংহরাশি প্রায় হারিয়ে গেছে—তবু তার বর্শা-ফলকের মতো আলো এদিক ওদিক থেকে ঠিকরে আসছে তাকে লক্ষ্য করে। যেন জঙ্গলের আড়াল থেকে কতগুলো ক্ষুদার্ত জানোয়ারের লুব্ধ দৃষ্টি।

দু'পাশের বাঁশবন বাতাসে উঠল কট্‌কট্ করে—ঘুণে কাটা গর্তের ভেতর হাওয়া ঢুকে কোথা থেকে গোঙানির মতো খানিকটা কান্না বয়ে এল। সত্যিই কি কাঁদছে কেউ ? কে কাঁদছে ? তার দেশ ? তার সত্য ? তার ব্রতভ্রষ্ট মন ?

সেই অন্ধকারে—সেই ভেজা ধুলোর ওপরেই বসে পড়ল রঞ্জন। সেও ডুবে যাচ্ছে অন্ধকারে। ডুবে যাচ্ছে দেহ, তলিয়ে যাচ্ছে মন—মিলিয়ে যাচ্ছে কোনো অতল সমুদ্রের গভীর থেকে গভীরতায়। বুক-পিঠের দুদিক থেকে দুখানা ভারী পাথর ক্রমশ চেপে ধরছে তাকে—দম আটকে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে বুকের পাঁজরাগুলো ; পেছন থেকে একটা অমানুষিক শক্তি যেন হিমাক্ত কঠোর মুষ্টিতে চাপ দিয়ে ভেঙে দু'টুকরো করে ফেলতে চাইছে মেরুদণ্ডকে।

মনে আছে, বাজী রেখে একবার ডুব দিয়েছিল মজুমদারদের বড় দীঘির মাঝখানটায়। মাটি তুলবে জলের তলা থেকে। পায়ের ধাক্কায় ওপরের জল সরিয়ে যতই নেমে যাচ্ছে, ততই দুধারের ঘোলাটে কাচের মতো জল তার বুক পিঠ চেপে ধরেছে, নাকের মধ্য দিয়ে টনটন করে ফেটে আসতে চাইছে রক্ত— অসহ্য যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যেতে চাইছে কানের ভেতরে। ঠিক তাই। আজো ঠিক সেই যন্ত্রণা। সেদিন সে ভেসে উঠতে পেরেছিল আবার, কিন্তু আজ ?

হ্যাঁ—ঠিকই হয়েছে। আত্মহত্যাই সে করবে। এই ডুবে যাওয়ার যন্ত্রণার সমাপ্তি ঘটিয়ে দেবে নিজের হাতেই। চৈতন্যের দরজাটাকে বন্ধ করে দেবে সজোরে।

আবার সে উঠে দাঁড়ালো। শরীরটা শক্ত হয়ে গেছে হঠাৎ—দৃঢ় হয়ে গেছে পেশীগুলি। এই অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে ছায়ার মতো মিলিয়ে যাবে নিঃশব্দে। কেউ আর কখনো তাকে খুঁজে পাবে না।

মৃদু পা ফেলে পথ থেকে সে নেমে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

এত অন্ধকারেও ক্রমশ চোখে আবছা দৃষ্টি ফুটছে একটা। পায়ের নিচে ঝোপঝাড়, কাঁটা লতা বিছুটির বন সব একাকার হয়ে গেছে বটে, কিন্তু বড় বড় ঝাঁকড়া গাছগুলো ক্রমশ আলাদা হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের সমগ্রতা থেকে। এলোমেলো বাতাস দিচ্ছে, মাথার ওপর থেকে মধ্যে মধ্যে পাতার কালো পর্দা সরে গিয়ে দেখা দিচ্ছে ছেঁড়া ছেঁড়া নক্ষত্রভরা আকাশ। সিংহরাশি নয়—কী ওটা? সাতভাই চম্পা?

না, সাতভাই চম্পা আর নয়। তার জীবন নিংড়ে ওই সাতভাই চম্পা দাম আদায় করে নিয়েছে। ওই স্বপ্নে-উড়ন্ত আইকারাসের পাখা পুড়েছে সূর্যের অভিশাপে। জলন্ত সিংহরাশির চোখে ঘৃণা ভরা ধিক্কার—বেণুদা।

আবার মাথার মধ্যে সমস্ত বোধগুলো যাচ্ছে একাকার হয়ে। অন্ধকারের মধ্যে বস্তুপিণ্ডের বন্ধন ছিঁড়ে রেণু রেণু হয়ে ঠিকরে পড়ছে তার সমগ্র সত্তা। চোখ বুজে কিছুক্ষণ বসে রইল সে—শুধু শুনতে লাগল বাতাসের শব্দ—অন্ধকারের অর্থহীন বনমর্মর আর তীব্র ঝিঁঝিঁর ডাক।

উঠে দাঁড়ালো তারপরে। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করল সুবিধে মতো একটা মোটা ডাল আছে কিনা। হাঁ, আছে, অস্বচ্ছ দৃষ্টিতেও সে দেখতে পেল তা। তেড়া-বেঁকা একটা রুক্ষ চেহারার বেঁটে ধরণের গাছ—পাতাগুলো পাতলা পাতলা—অন্ধকারের একটা মস্ত বড় জালের মতো মাথাটা। বাবলা গাছ বোধ হচ্ছে।

যে গাছই হোক, তাতে আটকাবে না। তা ছাড়া বাবলার ডাল শক্ত—ভেঙেও পড়বে না সহজে। আশ্চর্য—মনের ভেতরে এত বিশৃঙ্খলার ভিড়, কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রে কত যুক্তিসহ আর সরল হয়ে গেছে চিন্তাটা। আত্মহত্যার আরো অনেক কাহিনী তো শুনেছে রঞ্জন। ক্ষেপে গিয়ে মানুষে আত্মহত্যা করে, অসংলগ্ন মস্তিষ্কের তাড়নায় নিজের হাতে সমাপ্ত করে নিজেকে। তবু কী নির্ভুলভাবে সমাপ্ত করে যায় কাজটা। অসীম ধৈর্য ধরে রেললাইনে ঘাড় পেতে দিয়ে প্রতীক্ষা করে, কড়িকাঠে শক্ত করে দড়ির গিঁট বাঁধতে তো এতটুকুও ভুল হয় না।

আজ সন্ধ্যাতেও এই অজগর জঙ্গলে পা বাড়াতে ভয় পেতো সে। কিন্তু

এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তার ভয়-ভাবনা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে। একটা অন্ধকার কালো সেতুর ঠিক মাঝখানটিতে সে দাঁড়িয়ে। মাথার ওপরে বাবলার ডালে কাপড়ের একটা ফাঁস পরাতে পারলেই—এই ব্যবধানটুকু যাবে পার হয়ে। তারপর ?

ক্রমশ একটা নেশার বিহ্বলতা এসে যেন ঘন হতে লাগল তার স্নায়ু-কুণ্ডলীর ভেতরে। মাত্র এক পা—এক পা বাড়াতে পারলেই ছাড়িয়ে গেল অনিশ্চয়তার সীমান্তে। কী আছে তারপর ? কোথায় থাকবে সে—কী রূপ নিয়ে বেঁচে থাকবে তার মনোময় অস্তিত্ব ?

অস্থিরতার কলধ্বনি জেগে উঠছে রক্তের গতি-ধারায়। উঁচু ডাঙার ওপর দাঁড়িয়ে নিচের খর গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত্ততা। আর নয়।

পরণের কাপড়টাকে টেনে টেনে পরীক্ষা করল একবার। ছিঁড়বেনা—নতুন কাপড়। তারপর আর একবার সন্ধানী চোখে দেখে নিতে চাইল ওপরের বাবলার ডালটাকে।

হঠাৎ পায়ের কাছে তীক্ষ্ণ হিংস্রতার শিস্ দিয়ে উঠল কেউ। খটাৎ করে একটা প্রচণ্ড ঠোকর ডান পায়ের জুতো ঘেঁষে পড়ল গাছের গুঁড়িটার ওপরে। লাফিয়ে সরে গেল রঞ্জন।

হ্যাঁ—সাপ !

নিশাচরের মতো অভ্যস্ত চোখের বিহ্বল দৃষ্টিতেও দেখতে পেলো সে। দেখল, তরল অন্ধকারের বুক চিরে আরো কালো একটা অন্ধকারের শিখা দুলে দুলে উঠছে—ফুঁসছে আরণ্যক জিঘাংসায়। দুটো জ্বলন্ত জোনাকির কণা একবার বাঁয়ে হেলছে, আর একবার ডাইনে।

ইচ্ছে হল ছুটে পালায়, কিন্তু পারল না। সারা শরীরটা ভারী হয়ে গেছে জগদ্দল পাথরের মতো। পরক্ষণেই আরো দু পা পিছিয়ে গেল সে। অন্ধকারের শিখাটা আবার সোজা হয়ে উঠল, জ্বলন্ত জোনাকির কণা দুটো ঝিকিয়ে উঠল আর একবার—ঠকাস্ করে মাটি-ফাটানো আর একটা ছোবল পড়ল শুকনো ঝরা-পাতার ওপরে।

বুঝতে পেরেছে দৌড়ে পালানো যাবে না। চারদিকে ঝোপ-জঙ্গল—জোরে ছুটবার উপায় নেই। পেছন ফিরলেই নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু একটা সাপের মুখে ? নিশ্চয়ই না। কাপুরুষের মতো এত বড় পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া যাবে না কোনো মতেই।

শরীরের কোষে কোষে কেন্দ্রিত শক্তি একটা প্রচণ্ড ঝটকায় যেন মুক্ত

পেয়ে গেল—বন্যার মতো উপচে গেল তা। কুমীরের খিলের মতো দাঁতের দুটো পাটি তার সজোরে আটকে বসেছে। ছোবল মারবার জন্যে সাপটা সর্‌সর্‌ করে আরো খানিক এগিয়ে আসতেই জুতো-পরা পায়ে একটা লাথি ছুঁড়ল সে—ছুঁড়ল অমানুষিক শক্তিতে।

সাঁৎ করে একটা বরফের চাবুক লাগল জুতোর ওপরকার অনাবৃত অংশটুকুতে। যেন কেটে বসে গেল মাংসের ভেতর। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে তীরের মতো উড়ে গেল সাপটা, ঝপাৎ করে একটা আওয়াজ শোনা গেল দশ-পনেরো হাত দূরে। কোনো ডোবা-টোবার মধ্যে গিয়ে পড়েছে নিশ্চয়।

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল রঞ্জন। ছুটে চলল সিংহরাশির ধিক্কার পেছনে ফেলে—ছায়ার প্রেতলোক থেকে মুকুন্দপুরের মিট্‌মিটে ল্যাম্প-পোস্টের আলোয়। সাপটা কি পেছনে পেছনে তাড়া করে আসছে এখনো? ঘা-খাওয়া গোখরো তো শত্রুকে ক্ষমা করতে পারে না। আরো জোরে সে ছুটতে লাগল—ভিজে ধুলোর রাশ ঠেলে পলাতক একটা জানোয়ারের মতো।

কিন্তু আত্মহত্যা?

না। মৃত্যুকে সম্মুখে দেখেছে বলে আত্মহত্যা করতে পারবে না সে।

কিন্তু সমাধান এল শেষ পর্যন্ত।

সমস্ত সমস্যার, সমস্ত সংশয়ের। দ্বন্দ্বের এই আকুলতা, এই আকুতি বিকৃতি একদিন আর একটা প্রবল ঝড়ের মধ্যে তার মুক্তি পেল। চারদিক থেকে যে হতাশা, যে ক্লান্তি ঘিরে আসছিল, পার্টির সামনে ঘন হয়ে আসছিল যে অন্ধকার—একদিন বজ্রের আলোয় সে অন্ধকার গেল বিদীর্ণ হয়ে। বিদীর্ণ হয়ে গেল রঞ্জনের মনেও সঞ্চিত স্তব্ধ তমসার গ্লানি।

ক্ষিতীশ চক্রবর্তী ধরা পড়েছে। ধরা পড়েছে জালের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ওদের নেতা। শহরে বিপ্লবীদলগুলোর অস্তিত্ব প্রায় না থাকার মতোই হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই সেদিন অনুশীলন দলকে একেবারে ছেঁকে তুলে নিয়ে গেছে ধনেশ্বর। জেলের মধ্যে নিয়ে নাকি বিশু নন্দীকে এমন মার মেরেছে যে রক্ত আমাশায় সে মরো-মরো—। ওদিকে 'তরুণ সমিতি'র ভালো ছেলেরা প্রায় সব ধনেশ্বরের নজরে পড়ে গেছে। কিছু ধরেছে, বাকী যাকে পাচ্ছে তাকেই ডেকে নিয়ে নির্বিচারে চালাচ্ছে হাণ্টার। ধনেশ্বরের দাপটে শহর সন্ত্রস্ত, সেই এস্‌-পি, সেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। দুর্ধর্ষ পরাক্রমে এক ঘাটে জল খাচ্ছে বাঘে গোরুতে।

হরিনারায়ণ ঘোষের ছেলে অমরকেও একদিন ডেকে নিয়ে গিয়ে ওই

রকম বেধড়ক পিটিয়েছে ধনেশ্বর। হরিনারায়ণ ঘোষ মামলা করতে চেয়েছিলেন ধনেশ্বরের নামে—ক্রিমিন্তাল অ্যাসাল্ট্ আর ইন্‌জুরির চার্জে। কিন্তু শহরের কোনো উকিল তাঁর মামলা নিতে চায়নি ; শিউরে উঠে বলেছে—বলেন কি মশায়, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ! ধনেশ্বর শর্মার নামে কেস্ করতে বলছেন! একবার যদি শনির নজর পড়ে তা হলে আর রক্ষা আছে! দেবে সং-ফৌ-সাইনে ঠেলে। চলে যান মশাই, ওসব ঝামেলা আর বাড়াবেন না।

—তাই বলে এই অত্যাচার সয়ে যেতে হবে ?

—হবেই তো।—প্রাজ্ঞ উকিলেরা জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়েছেন তাঁকে : খালি খালি মাথা গরম করে কী করবেন মশাই ? এখন তো ওদেরই রাজত্ব। শুধু ছেলেকেই ঠেঙিয়েছে, এইটেকেই ভাগ্য বলে জানবেন। বেশি লাফালাফি করেন তো আপনাকেও ধরে একদিন হাতের সুখ করে নেবে।

হরিনারায়ণ ঘোষ তবু দিন কয়েক তর্জন গর্জন করেছিলেন—তাঁর বৈঠকখানায় আর মনসাতলার বৈঠকে বসে। কিন্তু তারপর একদিন তাঁর বাড়ি সার্চ হল। সার্চ করালো ধনেশ্বর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। তারও পরে কী হল কে জানে, আশ্চর্য ভাবে নীরব হয়ে গেছেন হরিনারায়ণ, বুঝতে পেরেছেন বোবার শত্রু নেই।

কিন্তু এ অসহ্য—এ অবস্থা দুর্বিসহ।

ওদের শক্তি টগবগ করে ফোটে। জিঘাংসায় প্রতি মুহূর্তে মন কালো আর ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে! প্রতি মুহূর্তে ইচ্ছে করে লোকটাকে সাবাড় করে দিতে। না—তাও নয়। শ্মশানকালীর মন্দিরে নিয়ে গিয়ে ছাগলের মতো হাঁড়িকাঠে ফেলে বলি দিতে।

শুধু দাদারা থামিয়ে রাখেন ছেলেদের : না, না।

—না কেন ?

—কী লাভ ?—বিষণ্ণ চিন্তিত মুখে দাদারা জবাব দেন : অনেকগুলোই তো সাবাড় করা হয়েছে এদিকে ওদিকে। কিন্তু ওরা রক্তবীজের ঝাড়, ফুরোবে না। ওতে করে লাভের মধ্যে খানিকটা রিপ্রেশনই ডেকে আনা হবে; আমাদের আসল উদ্দেশ্য যাবে পিছিয়ে।

রিপ্রেশন! ছেলেরা বুঝতে পারে না। রিপ্রেশনের আর বাকীই বা কোথায়। শহরের প্রত্যেকটা ছেলের জীবন প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে। শুধু ধনেশ্বর আর ইয়াদ আলীর মতো চেনামুখই নয়, বর্ণচোরারা চারিদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে মাছি-মশার মতো! খেলার মাঠ থেকে স্কুলের ক্লাস পর্যন্ত অবাধ

গতিবিধি তাদের। বাতাসে পর্যন্ত তাদের কান পাতা। উৎপাতের চোটে মানুষের আহার নিদ্রা বন্ধ হওয়ার জো।

আর সার্চ করা! সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক একটা বাড়িতে সে যে কী প্রেত-তাণ্ডব, ভাবার তার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। সম্ভব অসম্ভব সব জায়গা তো খুঁজছেই, তারপর খাটের পায়া ভেঙে দেখেছে ভেতরে ফোকার আছে কিনা; বালিশ-তোষক ছিঁড়ে তুলোর মধ্যে লুকোনো রিভলভার খুঁজছে; অকারণ-আনন্দে আচমকা বাঁধানো মেজের খানিকটা খুঁড়ে ফেলছে গোটা কয়েক তাজা বোমা পাওয়ার আশায়, ইঁদারার ভেতর ঝালাওয়ালা নামিয়ে এমন অবস্থা করে তুলছে যে সাতদিন আর জল খাওয়ার উপায় থাকছে না গৃহস্থের। রিভলভার না পাক, ঠ্যাং ধরে গোটাকতক ব্যাঙ্‌কেই ছুঁড়ে দিচ্ছে কুয়োর ওপর।

আর পারা যায় না। কী কষ্টে যে অস্ত্র-শস্ত্রগুলোকে সামলে রাখতে হচ্ছে সে ওরাই জানে। শুধু একদিন একটা দৃশ্য দেখে বড় আরাম পেয়েছিল রঞ্জন, সমস্ত ঘটনাটা ভারী মনোরম বোধ হয়েছিল তার। উকিল সারদাবাবুর বাড়িতে সার্চ। কী মনে করে—বোধ হয় এক জোড়া তাজা পিস্তলের আশায়ই একটা কনেস্টবল্‌ নর্দমার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে, তারপর পরক্ষণেই "আঁই বাপ্পা: মর্‌ গইরে"—বলে লাফিয়ে উঠল।

তারপর তার সে কী নৃত্য গীত! কাঁকড়া বিছের কামড়—তার আরামটুকু মনে রাখবার মতো। দৃশ্যটা ভারী উপভোগ করেছিল সেদিন। মনে হয়েছিল ধনেশ্বরকে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখে তার গায়ে গোটা কয়েক কাঁকড়া বিছে ছেড়ে দিলে কেমন হয় ব্যাপারটা?

কিন্তু সে যাই হোক—এখন এ অবস্থার একটা প্রতিকার দরকার।

যা বোঝা যাচ্ছে জেলে সকলকেই যেতে হবে। দেশব্যাপী যে সশস্ত্র বিদ্রোহের কল্পনা ছিল নেতাদের, যে প্রত্যাশা ছিল ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তে চট্টগ্রামের মতো অগ্নিধ্বজ জাগিয়ে রাতারাতি ইংরেজের শাসন পুড়িয়ে ভস্ম করে দেওয়া—সে আশাকে এখন মরীচিকা মনে হয়, মনে হয় তা আকাশ-কুসুমের চেয়ে বেশি নয়। এ হয় না, এ হতে পারে না। সামান্যতম চেষ্টাও পুলিশের সদা শানানো চোখ আর ঘরশত্রু বিভীষণের চেষ্টায় ধরা পড়ে যাচ্ছে, দুর্বল সহকর্মী দু'ঘা মার খেয়েই কোর্টে দাঁড়াচ্ছে অ্যাপ্রুভার হয়ে। দেশের স্বাধীনতার পথে দেশের মানুষের বাধাই দাঁড়াচ্ছে সব চেয়ে প্রবল হয়ে। তিরিশ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মতো কেউ একে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নয়।

অস্ত্র চাই—সে জন্যে চাই টাকা। কিন্তু টাকা দেবে কে? নিতে হবে ডাকাতি করে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চরম বিয়োগান্ত তার পরিণাম।

আর তা ছাড়া নিজেদের মধ্যেই কি ত্রুটি আছে কম? অবধি নেই দলাদলির। প্রত্যেকেই সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, প্রত্যেকেই কাজে নেমেছে প্রাণের ভেতর আগুন জেলে, নিজের সর্বস্ব বিসর্জনের সংকল্প করে। কিন্তু এই মৃত্যুঞ্জয়, এই নির্ভীক মানুষগুলো কেন নিজেদের মুক্ত করতে পারে না দলাদলির ক্ষুদ্রতা থেকে? পরে রঞ্জন জেনেছে, শুধু এই দুটো দলই নয়—আরো আট-দশটা দল-উপদল আছে এবং পরস্পর সম্পর্কে তাদের বিদ্বেষ আর সন্দেহের যেন অন্ত নেই। শুধু তাই নয়। সংগঠন একটু জোর বেঁধেছে কিংবা হাতে দুটো একটা অস্ত্র এসেছে—তা হলেই আর যেন বীরত্বের লোভ সামলাতে পারে না তারা। অকারণে দুটো চারটে মানুষকে হত্যা করে বসে এবং সেই প্রত্যক্ষ ফলে সমস্ত প্রতিষ্ঠানটাই ভেঙে চুরে তচনচ হয়ে যায়।

দেশের বিরোধিতা, বিশ্বাসদ্রোহিতা, আর নিজেদের ভুলভ্রান্তি; এক সঙ্গে মিলতে পারে না তাই বড় প্ল্যান নিতে পারে না কোথাও। ব্যক্তিগত নেতৃত্বের মোহ—দাদা হওয়ার প্রলোভন কত লোককে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে—বাড়িয়ে চলে সংখ্যাতীত উপদল। আজকে রঞ্জন জানে, আজকে রঞ্জন বিচার করতে পারে, সেদিনকার অত নিষ্ঠা, অত আত্মদান, অমন বীরত্বের পরিণামও কেন অত বড় শোচনীয় ব্যর্থতায় হারিয়ে গেল।

তা ছাড়া সব চাইতে বড় কারণ যেটা, সেটা বুঝেছিল অনেক পরে। তার আভাস এনেছিল সেই রহস্যময় বইটা, কিন্তু সে ইঙ্গিত সেদিন ধরবার সাধ্যও হয়তো ছিল না কারো। তাই—

তাই নেতাদের মধ্যে হতাশা, নেতাদের চোখেও যেন অসহায় আক্রোশের একটা কাতরতা। ধনেশ্বরের দাপটে সমস্ত যেন ভেঙে পড়বার উপক্রম। নিজের মধ্যে যে বিচিত্র একটা প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব চলছে, চারদিকের এই সংঘাতের কাছে তাও যেন ছোট হয়ে গেছে।

অতএব—

অতএব একটা কিছু করো। যেমন করে হোক অন্তত আত্মঘোষণা করতে হবেই। কিছু অস্ত্র চাই, আর সেই অস্ত্রের মুখে প্রকাণ্ড একটা ঘা দিয়ে যাব দেশকে। আর কিছু না হোক একটা বিরাট প্রোপাগাণ্ডার মূল্য আছে তার, অন্তত আজকের এই অগ্নিক্ষরা রক্তঝরা অভিজ্ঞতার পরিণাম থেকে আগামী দিনের মানুষ তার পথ চলবার সংকেতটি খুঁজে নিতে পারবে। আমাদের

শবদেহের ওপর দিয়েই গড়ে উঠুক তাদের উদয়াচলের সোপান।

টাকা চাই, চাই অস্ত্র।

জিমন্যাস্টিক ক্লাবের সেই পোড়ো বাড়িটার অন্ধকারে গ্রহণ করা হল চরম সিদ্ধান্ত। মথুরানাথ পোদ্দার। মস্ত জোতদার, সংপ্রতি রায়সাহেব হয়েছে পুলিশকে সাহায্য করে আর জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটকে খানা খাইয়ে। তার কাছ থেকেই কিছু সংগ্রহ করে আনতে হবে। প্রথমে সবিনয়ে প্রার্থনা করা হবে সিন্দুকের চাবিটা, যদি সেটা সহজে না পাওয়া যায় তা হলে বলপূর্বক যাতে চাঁদাটা সংগ্রহ করা যায়, তৈরী হয়ে যেতে হবে তারই জন্যে।

সুতরাং আগামী কাল রাত বারোটা।

মনের মধ্যে গোপন-পাপের অনুভূতিটা বিঁধছে যন্ত্রণার মতো। কিছু বলতে পারেনি, স্বীকারোক্তি করতে পারেনি নিজের অপরাধের। আজ তিন দিন ধরে যেন একটা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। দলের মধ্যে নৈরাশ্য, তার মনের ভেতরেও যন্ত্রণাভরা অস্থিরতা। বেণুদার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ভয় করে। পরিমলের দিকে চোখ পড়লে দৃষ্টি নামিয়ে নেয় সে। ধনেশ্বরের হাতে অবিচলিতভাবে মার খেয়ে যে বীরত্ব গৌরব সে বয়ে এনেছিল, নিজের অপরাধের কালি ছড়িয়ে নিজেই তাকে কলঙ্কিত করে দিয়েছে!

তবু মনে হচ্ছে আর দেরী নেই। সময় এল এগিয়ে, এল তার সমস্ত মানসিক-যন্ত্রণার উপশমের মুহূর্ত। মারবার পরে ধনেশ্বরই তার পরিচর্যা করেছে, মাথায় জল দিয়েছে, রক্ত মুছিয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছে, এক চুলের ভেতরে একটুখানি কাটা জায়গা ছাড়া আর কোথাও নিজের কীর্তির বিন্দুমাত্র চিহ্ন না থাকে—সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করেছে তার জন্যে। তারপর আর এক কাপ গরম চা খাইয়ে তাকে বিদায় দিয়েছে। আর বলে দিয়েছে, আজ মুখ খুললে না, কিন্তু সেজন্যে ভেবো না তোমার দুর্গতি এর ওপর দিয়েই শেষ হল। আজ শুধু ছুঁইয়ে রাখলাম। আমার হিসেব-নিকেশ তৈরী হচ্ছে—যথাসময়ে চুনো-পুঁটি থেকে শুরু করে রাঘব বোয়াল পর্যন্ত কেউ বাদ যাবে না।—রিভলভারটা হাতের ওপর লোফালুফি করতে করতে গর্জন করেছিল বুলডগের মতো: সেদিন টের পাবে ধোলাই কাকে বলে। আজ এই নমুনাটুকু দিলাম শুধু অনুতাপের সুযোগ দেবার জন্যে। কিন্তু লাস্ট চান্স এখনো আছে, নিজের ভালো চাও তো এসে সব কন্‌ফেস্ করে যেয়ো। আর যদি না করো—শহরের প্রত্যেকটি জায়গায় আমার চোখ খোলা আছে, সব আমি দেখতে পাচ্ছি—এর পরের বার সমস্ত আদায় করে নেব সুদে আসলে।

ধনেশ্বর মিথ্যে শাসায়নি। মিথ্যে শাসানোর মতো লোকই সে নয়। হাঁ—দেরী নেই আর। তারও নয়, পার্টিরও না। হঠাৎ মনে হচ্ছে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আর—আর—অনুতপ্ত ক্ষুব্ধ বোধ বার বার বলতে লাগল সেদিন যত তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে, তাই ভালো। আজ মনে হচ্ছে ফাঁসির দাড় তার পুরস্কার না হোক, তার প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আত্মহত্যা করতে পারে না, স্বীকারোক্তি দিয়ে মৃত্যুদণ্ডকে আহ্বান করে নেবার শক্তি নেই তার—কাজেই সে দণ্ড ধনেশ্বরের হাত দিয়েই নেমে আসুক।

রাত প্রায় বারোটা হবে।

শহর থেকে মাইল পনেরো দূরে একটা মজা দীঘির উঁচু পাড়ের ওপরে জমা হয়েছে সকলে। মরা মরা জ্যোৎস্নায় বৃত্তাকারে ঘিরে দীর্ঘ দেহ তালগাছের প্রেতচ্ছায়া। পেছনে ধূ ধূ মাঠের বুকে সাবধানের সংকেত-বাণীর মতো আলেয়ার চোখ জ্বলছে দপ দপ করে। মজা দীঘির বুকে অজস্র পদ্মপাতা আর কল্মিদামে বাতাস ফেলছে এস্ত নিশ্বাস। আর স্তব্ধতা।

সমস্ত পৃথিবী জুড়ে চক্রান্তের মতো স্তব্ধতা।

তালগাছের প্রলম্বিত ছায়াগুলোর নিচে আধশোয়া ভঙ্গিতে অপেক্ষা করছে সবাই। অসহ্য, নিষ্ঠুর প্রতীক্ষা। বুকের তলায় একটা ছোট কাঁটা ঝোপের তীক্ষ্ণ আঁচড় লাগছে রঞ্জনের। একটু সরে গেলে হয়, কিন্তু সাহস হচ্ছে না। যতক্ষণ আদেশ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ নড়তে চড়তেও পারবে না ওরা।

আট জোড়া চোখ স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দীঘির ওপারে বড় দোতলা বাড়িটার দিকে। ওর একটা জানালায় আলো জ্বলছে এখনো—সেটা নেভবার প্রতীক্ষা। বাড়ির সমস্ত লোক আগে নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করুক। একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ করা দরকার। এমন হানা দিতে হবে, এত ক্ষিপ্র বেগে যে মথুরা পোদ্দার তার বন্দুকটা হাতে পর্যন্ত তুলে নেবার সময় পাবে না। তা ছাড়া গ্রাম এখনো জেগে, মাঠের ভেতর দিয়ে দুচারটে লণ্ঠন চলে ফিরে বেড়াচ্ছে এখনো। ওদের গতিবিধিটাও একটু কমে আসুক।

অসহ্য দীর্ঘ মুহূর্তগুলো—অসহ্যতর প্রতীক্ষা। পরস্পরের নিশ্বাসে চমকে উঠছে সবাই। তালগাছের শুকনো পাতায় এক আধটু বাতাসের শব্দও থেকে থেকে হৃৎস্পন্দন থামিয়ে দিচ্ছে—যেন শুকনো পাতার ওপর পা ফেলে ফেলে হেঁটে আসছে কেউ। বুকের নিচে কাঁটার ঝোপটা হিংস্রভাবে আঘাত করছে প্রতিবাদের মতো। ওগুলো কি মশাল নাকি? মশাল জ্বেলে কেউ কি এগিয়ে আসছে ওদের দিকে? না—না, আলেয়া।

—রেডি!

একটা চাবুকের মতো শব্দ এসে পড়ল তালগাছের নিচে জমাট ছায়াছন্নতাকে তাড়না করে। মুহূর্তে নিজেদের অস্ত্রগুলো গুছিয়ে নিয়ে নক্ষত্রবেগে উঠে দাঁড়ালো দলটা। উত্তেজনায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। হ্যাঁ,—আলো নিবেছে ওপরতলার জানালাটার।

—ওয়ান—টু—থ্রী—

সার বেঁধে দুপা এগিয়েছে সবাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যেন পাথর হয়ে গেছে। চারদিকের স্তব্ধতা চকিতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল বন্দুকের গম্ভীর কঠিন শব্দে।

—পুলিশ!

এক সঙ্গে সমবেত আর্তনাদ বেরুল: পুলিশ!

—দুম্—দুম্—

ওপার থেকে বন্দুকের সাড়া।

—বিট্রেয়াল!—বেণুদা গর্জন করে উঠলেন আহত জানোয়ারের মতো: রোহিণী!

—ঠাস্ ঠাস্—

এপার থেকে এদের রিভলভার জবাব দিলে। বৃথা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ওদের রাইফেল এদের অব্যর্থ সন্ধানে লক্ষ্যভেদ করতে পারবে, কিন্তু রিভলভারের রেঞ্জ দীঘির অর্ধেকও গিয়ে পৌঁছুবে না।

—ট্রুপ ডিস্পার্স—

কিন্তু পালাবে কোন্ পথে? এদিক থেকেও রাইফেল সাড়া দিয়েছে, আয়োজনের ত্রুটি রাখে নি কোথাও। একটা বজ্রকণ্ঠের আদেশ এল: surrender!

—No surrender! Troop disperse—

রাইফেল আর রিভলভারের শব্দ—রাত্রি কাঁপছে, আকাশ কাঁপছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে খণ্ড প্রলয়। শরীরের রক্ত যেন আগুন হয়ে জ্বলছে—বিট্রেয়াল! বিশ্বাসঘাতকতা করেছে রোহিণীই। কিছুদিন থেকেই তার ওপর সন্দেহ জাগছিল, এতদিনে সন্দেহটা পরিণত হয়েছে নিশ্চিত প্রত্যয়ে।

—ট্রুপ্ ডিস্পার্স্—

ছুট্, ছুট্। যেদিকে পারো। প্রাণ থাকতে ধরা দিয়ো না। বিদ্যুৎশিখার মতো বড় বড় টর্চের সন্ধানী আলোতে চোখ ঝলসে যাচ্ছে, বজ্রের মতো উঠছে

রাইফেলের গর্জন। ছুট্ ছুট্। রঞ্জনের পেছনেই চাপা আর্তনাদ করে কে যেন পড়ে গেল। পড়ুক—থেমে দাঁড়িয়ো না। Let him die a hero's death!

রোহিণী। এই মুহূর্তে তাকে হাতে পাওয়া গেলে বাঘের নোখের মতো তার গলায় থাবা বসিয়ে সেটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলা যেত! বিট্রেয়ার! বিশ্বাসঘাতক! নরেন গোস্বামীদের কি মৃত্যু নেই?

ছুট্—ছুট্—ছুট্—

—We are lost friends—but we will win!

···রাত শেষ হয়ে আসছে। মরা চাঁদের জ্যোৎস্না হেলে পড়েছে পশ্চিমে। বুক সমান উঁচু বিন্নাঘাসের বনের মধ্যে শান্তিতে শুয়ে আছেন বেণুদা। ম্লান জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত শান্ত সে মুখ। হিংস্রতা নেই,—পরাধীনতার জ্বালা আর অপমান—সমস্ত নিবে গেছে! কালো পাথরে গড়া কঠোর শরীরে একটা আশ্চর্য কোমলতা ছড়িয়ে পড়েছে। রক্তে রাঙা হয়ে গেছে বিন্নাঘাস, কাঁধের পাশ দিয়ে এখনো গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। আশ্চর্য, ওই রকম একটা মারাত্মক ক্ষত বয়েও কী করে এতটা পথ তিনি ছুটে এসেছিলেন?

মৃত্যু। অবিনাশবাবুর মৃত্যু মনে আছে, এই আর একটা মৃত্যু দেখল রঞ্জন। ছিন্নমস্তা ভারতবর্ষের পায়ে আর একটি রুধিরাঞ্জলি। স্বাধীন হোক দেশ, স্বতন্ত্র হোক ভারতবর্ষ। এই মৃত্যু আর রক্তের মধ্য দিয়েই মুক্তির রাজপথ এগিয়ে আসুক।

দুঃখ নয়, শোকও নয়।

কী আশ্চর্য শান্তি মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। বেণুদার অমনি প্রশান্ত কোমল মুখ কি আর একদিন দেখেছিল রঞ্জন? না, অন্ধকারে তা আচ্ছন্ন ছিল সেদিন?

"করুণাময় মাগি শরণ, দুর্গতি ভয় করহ হরণ
দাও দুঃখবন্ধতরণ মুক্তির পরিচয়—"

মুক্তি এল। এল দুঃখ দুর্গতির অবসান। শেষ চন্দ্রের ক্ষীণ আলোয় পৃথিবী শান্তিতে ঘুমুচ্ছে। বেণুদাকেও ঘুমুতে দাও। বিশ্রাম করতে দাও সারাজীবন অশ্রান্ত বিপ্লবীকে।

নীরবে উঠে দাঁড়ালো ওরা তিনজন। রঞ্জন, পরিমল আর বিশ্বনাথ।

কোথায় যাব?

ঘরের বন্ধন ছিঁড়েছে। বন্দরের কাল হল শেষ। এবার নিরুদ্দেশ যাত্রা। তিনজনে তিন দিকে। যদি সুযোগ হয় পরশু গঙ্গাপুরের উপেন রাজবংশীর

বাড়িতে মিলব আমরা। নইলে এখানেই শেষ দেখা, চিরদিনের মতো বিদায়।

বেণুদার ঘুমন্ত মুখের দিকে ওরা আর একবার তাকালো। তারপর ঘাসবন ভেঙে অন্ধের মতো তিনজনে হেঁটে চলল তিন দিকে। মাটির তলায় অন্ধকারে সুরু হল নতুন জীবনের আর এক অধ্যায়।

শুধু একটা জিনিস বাকী দুজনে টের পায়নি। দরকারী কাগজ আর অস্ত্রশস্ত্র সরাতে গিয়ে বেণুদার পকেটে রঞ্জন পেয়েছে একটা ছোট আংটি। কার আংটি সে জানে। কেন বেণুদা আজও ও আংটিটাকে বিক্রী করতে পারেননি তাও বোধ হয় বুঝতে বাকী নেই আর।

বিপ্লবী শহীদের এই দুর্বলতাটুকু দেশ-জননী নিশ্চয় ক্ষমা করবেন—! শান্তিতে ঘুমুক বেণুদা, ঘুমুক পরম আর নিশ্চিন্ত বিশ্রাম। রঞ্জন জেনেছে, কিন্তু এ আংটির খবর পৃথিবীর আর কেউ জানবে না—কেউ না!

আর যদি কোনোদিন পারে, তবে এ আংটি সে ফিরিয়ে দেবে সুতপাকে।

—আঠারো—

মাটির তলায় অন্ধকারের নতুন জীবনের আর এক অধ্যায়।

সারাদিন কাটল একটা জঙ্গলের মধ্যে। যা চেহারা খুলেছে দিনে পথ দিয়ে চলা যাবেনা! বুকের কাছে জামাটায় রক্তের দাগ লেগেছে—বেণুদার রক্ত! পায়ে জুতো নেই, পরণের কাপড়টা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। নিতান্ত নির্বোধ লোকের চোখ পড়লেও সন্দেহ জেগে উঠবে তার।

যেমন খিদে—তেমনি ক্লান্তি। ঘাড়ের ওপর থেকে মাথাটা যেন খসে পড়তে চাইছে। থেকে থেকে অন্ধকারে ডুবে আসে চোখের দৃষ্টি। বাড়ির কথা মনে পড়ে। নরম বিছানা—দু'মুঠো ভাত, কয়েক ঘণ্টা বিভোর হয়ে ঘুমুনো। উৎকণ্ঠা নেই, আশঙ্কা নেই, মাতলামি নেই বুকের ভেতরে। বিশ্রাম, গভীর সমুদ্রে ডুব দিয়ে তলিয়ে যাওয়ার মতো অতলান্ত বিশ্রাম।

বিশ্রাম! এও বিশ্রাম বই কি। যেন সব কাজ শেষ হয়ে গেছে—যেন এত দিনের জীবনটা একটা স্বপ্নের মতো সুদূর। কোথায় আত্রাই—কোথায় তার নীল জলে টকটকে রাঙা শিমুলের ফুল দক্ষিণা বাতাসে ঝরে ঝরে পড়তে থাকে! কোথায় আলেয়া-দীঘির ওপারে রাঙা মাটির পথটা এগিয়ে চলে গেছে হাড়ের পাহাড়, কড়ির পাহাড় পেরিয়ে! অথবা মহাপৃথিবীর পথ—

ভূগোলের পাতায় পড়া কন্যাকুমারী আর তুষারশৃঙ্গের সীমা ছাড়িয়ে যায় অজানা পরিক্রমা!

কাঞ্চনের কাকচক্ষু জল—সে স্বপ্ন। শহর মুকুন্দপুর—কোথাও কি তা আছে, কোথাও কি ছিল? মিত্রা—করুণাদি—সুতপা। ঘুমের ঘোরে যেন কতগুলো ছায়ামূর্তি অতি লঘুছন্দে তার চেতনার ওপরে পদচারণা করে গেছে। আজ এই মুহূর্তে একটা মৃদুগন্ধের আমেজের মতো তারা মনের মধ্যে ঘুরে ফিরছে, আর কোথাও নেই তারা—আর কিছুই নেই।

যেন চটকা ভাঙে। নিজেকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে—আমি কে? ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় বৈরাগ্যভরা একটা শান্ত জিজ্ঞাসা। আমি কোথায় ছিলাম?

আশ্চর্য মানুষের মন। যেন কিছুই হয়নি—যেন এই ঘন মহুয়া বনের মধ্যে, এই নিরালা নির্জন ছায়ায় সে একজন নতুন মানুষ। তার পৃথিবী আলাদা—তার পরিচয় আলাদা।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন মনে পড়েছে:

"আমি এলাম ভাঙল তোমার ঘুম—
ফুটল শূন্যে তারায় তারায় আনন্দ কুসুম—"

আমি এলাম। এলাম নতুন হয়ে—আবিষ্কার করলাম নিজেকে এক অজানা নতুন জগতের পরিবেশে। কিন্তু কার ঘুম ভাঙল? পৃথিবীর? আকাশের? এই মহুয়া বনের?

অনেকদিন পরে কবি রঞ্জন জেগে উঠেছে—সাড়া দিচ্ছে হারানো দিনের সেই স্বপ্নশিল্পী। চরম বিপর্যয়ের ভেতরেই কি এমনি চূড়ান্ত করে আত্ম-কেন্দ্রিক হয়ে গেল তার মন? কঠিনতম জগতের মাটিতে বাস করেও যে চিরকাল মনের মধ্যে খুঁজে ফিরছে স্বপ্নের ছায়াপথকে, এই একান্ত নিভৃত আর বিচিত্র অবকাশে সে কি নিজের সেই অপরূপ জগৎটাতে ফিরে গেছে?

আজ তার কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে। আশ্চর্য, আজ এই মুহূর্তে কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে তার। অদ্ভুত মানুষের মন। এতদিন ধরে যে নানা টানা-পোড়ানের মধ্যে বুক দুলছিল, সঞ্চিত হয়েছিল যা কিছু সংশয় আর সমস্যা, কে যেন তাদের সব কিছুর ওপর দিয়ে টেনে দিয়েছে একটা সমাপ্তির সীমারেখা। সব মিলিয়ে গেছে, সব ছায়া হয়ে গেছে—পাক খেয়ে মিলিয়ে গেছে একরাশ কুয়াশার মতো।

এই মহুয়াবনের মধ্যে, এই ঝিরঝিরে বাতাসে একি তার নবজন্ম?

পাতায় ফাঁকে ফাঁকে মাথার ওপরে স্নিগ্ধ নীল আকাশ; ডালে ডালে হরিয়ালের নাচ। ঘুমের মধ্যে বৃষ্টির আওয়াজ শোনার মতো মহুয়া পড়বার শব্দ, একটা মিষ্টি স্বপ্নের আমেজের মতো মহুয়ায় বিহ্বল গন্ধ। বাতাসেও যেন মহুয়ার নেশা ছড়িয়ে পড়েছে, আড়ষ্ট হয়ে আসছে চোখের পাতা। গান তো গাইতে জানে না, একটা কাগজ কলম থাকলে নিশ্চয় কবিতা লিখত।

কী কবিতা? 'আমি এলাম, ভাঙল তোমার ঘুম'—রবীন্দ্রনাথের লাইন। ওই লাইনটা ওরও মনের ভেতরে ঘা দিয়ে দিয়ে প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলতে চাইছে। একটা সুরের পাগলা দমকা হাওয়া এসে অন্য সুরের দরজা খুলে দিতে চাইছে যেন?

অথচ—

অথচ কী বিচিত্র একটা অবস্থা। কোথা থেকে কোথায় এসেছে সে—কী আশ্চর্য, অবিশ্রান্ত বিপর্যয়ের পথ বেয়ে! তবু এখন যেন কিছুই নেই। ফিরে এসেছে স্মৃতির গভীরে হারিয়ে যাওয়া আত্রাই—তালবীথির ঘন নিবিড় বৈঁচিবনের ছবি। ছেলেবেলায় প্রকৃতি হাতছানি দিয়েছিল, মন ভুলিয়েছিল তালবীথির সংকেত দেওয়া দিগন্তের ইঙ্গিতে। আজ তারা রঞ্জনকে ফিরে পেল, সেও ফিরে পেয়েছে তাদের।

পৃথিবী। চারদিকে প্রকৃতি তাকে পরিপূর্ণ করে জড়িয়ে নিয়েছে আজ। শহর মুকুন্দপুর—বিপ্লবীর স্বপ্ন। কিছুই নেই। এই তো প্রকৃতি—যেখানে দ্বন্দ্ব নেই, নেই সমস্যা, নেই সংঘাত! এইখানেই কি এতদিনের হারিয়ে যাওয়া মন ফিরে পেলো নিজেকে, কবি রঞ্জন ফিরে এল নিজের সত্তায়!

লাল মাটির ছোট বড় টিলা। তারই ওপরে সারি সারি মহুয়ার গাছ। আকাশে রোদ বাড়ছে—দুপুরের উত্তাপে যেন ঘন হয়ে উঠছে গন্ধের নেশা, আরো তীব্র হয়ে উঠছে, আরো নিবিড়। দুটো টিলার মাঝখানে একটা নিচু গর্তের মতো জায়গা—চারপাশে মহুয়া পাতার ছায়া—সেই খানে চুপ করে শুয়ে আছে রঞ্জন। শুয়ে আছে স্বপ্নব্যাকুল অর্ধমুদ্রিত চোখ মেলে।

সময় কেটে যাচ্ছে! পাতার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে রোদ দোলা খেয়ে চলেছে মুখের ওপর। কেউ নেই কোথাও—ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বাঁধের মতোই উঁচু রাস্তাটা থেকে অনেক দূরে সরে এই মহুয়া বনের মধ্যে আসবার সম্ভাবনাও নেই কারো। 'আমি এলেম, তাই তো তুমি এলে।' কে এল? কবিতাটার অর্থ জানেনা রঞ্জন, তবু মনে হল একটা কিছু যেন সে বুঝতে পেরেছে এই মুহূর্তে। বহুকালের একটা বন্ধ জানালা হঠাৎ খুলে গিয়ে রোদের

ঝল্‌কানির মতো পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এর মর্মকথা। কে এল? আমি এলাম, তাই কি প্রকৃতি আবার ফিরে এল আমার কাছে? যে আকাশে রক্তের বহ্নিশিখা শুধু ঝলমল করত সেদিন, আজ কি সেখানে নতুন করে:
"ফুটবে শূন্যে তারায় তারায় আনন্দ কুসুম?"

হঠাৎ চমকে উঠল সে। আত্মদর্শনটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল অতি বাস্তব, অতি ভয়ংকর একটা সম্ভাবনার সংকেতে। খট্‌ খট্‌ করে দ্রুত কতগুলো পায়ের শব্দ।

রক্তে বিদ্যুৎ বইল। তীরের মতো উঠে বসল রঞ্জন।

না—মানুষ নেই কোথাও। এক পাল ছাগল ছুটে আসছে, শুধু ডাকছে ভয়ব্যাকুল কণ্ঠে। কিন্তু এক পাল ছাগল? পেছনে নিশ্চয় রাখাল আসছে। শরীরটা আতঙ্কে শক্ত হয়ে এল।

কিন্তু না—রাখাল তো নেই। ওদের পেছনে তাড়া করে আসছে পাট্‌কিলে রঙের দুটো শেয়াল। মাত্র দুটো শেয়াল—আয়তনেও এমন কিছু বড় নয়। কিন্তু তাদেরই ভয়ে এতগুলো ছাগল পালিয়ে আসছে এমন করে! অথচ একবার যদি বড় বড় শিংগুলো বাঁকিয়ে ফিরে দাঁড়াতো—

স্বাভাবিক একটা সংস্কারবশেই উঠে দাঁড়ালো সে। গোটা দুই ঢিল ছুঁড়ল শেয়াল দুটোকে লক্ষ্য করে। ফলে শেয়ালগুলো ছুটল জঙ্গলের দিকে, আর ছাগলের পাল মহুয়াবন পেরিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল ডিষ্ট্রিক বোর্ডের রাস্তার উদ্দেশ্যে।

আবার শুয়ে পড়তে যাবে, এমন সময় বনের মধ্যে থেকে ছাগলের আর্তনাদ উঠল: ব্যা-ব্যা—

সে কি! সবগুলোই যে রাস্তার দিকে ছুটে গেল। তবে?

উঠে পড়ল আবার—মহুয়াবনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেল ছাগলের ডাক অনুসরণ করে। খানিকটা এগোতেই একটা চমৎকার দৃশ্য পড়ল চোখে।

করিৎকর্মা জাত শেয়াল—কোনো সন্দেহ নেই এ বিষয়ে। কোন্‌ ফাঁকে দলছাড়া একটা মস্ত ছাগলকে এদিকে তাড়িয়ে এনেছে, খেয়াল করতে পারেনি সে। সামনেই একটা ঘোলা পচা ডোবা, যূথভ্রষ্টকে একেবারে তারই ভেতরে নিয়ে গিয়ে নামিয়েছে। একগলা জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আর্ত চিৎকার তুলেছে ছাগলটা, আর শেয়াল দুটো ঝপঝপ করে জল ভেঙে এগিয়েছে তার দিকে। আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনায়, অবর্ণনীয় আতঙ্কে অসহায় প্রাণীটা থর থর করে কাঁপছে।

আবার একটা তাড়া দিতেই জল থেকে উঠে জঙ্গলের দিকে সরে পড়ল শেয়ালদুটো। ছাগলটা জলের মধ্যে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ—যেন মুক্তির ব্যাপারটা এখনো সে বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপর উঠে এল কাঁপতে কাঁপতে, ছুটে পালিয়ে গেল মহুয়াবন পার হয়ে।

নিজের জায়গায় ফিরে এল সে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে রোদ পিছলে পিছলে পড়ছে লাল মাটির টিলায় এখানে ওখানে, জলছে ছোট ছোটে কাঁকর, রাশি রাশি বালি-পাথরের টুকরো। নির্জন বন ভরে শুকনো পাতার ওপর টুপটাপ করে মহুয়া পড়বার শব্দ; ডালে ডালে হরিয়ালের নাচ। উত্তপ্ত মদির গন্ধ নেশায় আবিষ্ট করে আনতে চায়, ভারী হয়ে আসতে চায় চোখের পাতা।

কিন্তু বনের স্বপ্ন কেটে গেছে, মন থেকে মুছে গেছে প্রকৃতি-বিলাস। এমন সুন্দর, এমন আশ্চর্য কবিতায়-ভরা দুপুরের মোহ-মদির মহুয়া বনের মধ্য থেকে কালো হিংসার একটা ছায়ামূর্তি মাথা তুলেছে; এক মুহূর্তে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে সমস্ত।

সব এক—সব একরকম। কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য নেই জটিলতায় জর্জরিত শহর মুকুন্দপুরের সঙ্গে এই কাব্যময় অপরূপ মহুয়া-বীথিকার। এক নীতি—একটিমাত্র সত্য। ওই শেয়াল দুটো চেনা, প্রতিদিনই তো আশে-পাশে ঘুরে বেড়ায় ওই ছাগলের পাল। ছত্রিশ কোটি মানুষ আমরা—একবার যদি মাথা তুলে দাঁড়াই তা হলে কতক্ষণ সময় লাগে এই বিদেশী অত্যাচারের শিকড়-শুদ্ধ উপড়ে ফেলতে? কিন্তু আমরা কোনদিনই দাঁড়াবো না, ওই ধনেশ্বর আর তার সাদা মালিকের দল এমনি করেই আমাদের ঠেলে নিয়ে যাবে। নিয়ে যাবে অনিবার্য অপঘাতের মধ্যে।

অকস্মাৎ মহুয়াবনের এই গন্ধভরা বাতাসকে অত্যন্ত বিষাক্ত বলে মনে হল, মনে হল ঝিরঝিরে মহুয়ার পাতায় যেন কাদের চক্রান্তভরা একটা কুটিল ফিস্‌ফিসানি কানে আসছে। জলজলে রোদের ফালিগুলোতে বুঝি কোনো একটা হিংস্র শ্বাপদ থাবা মেলে রেখেছে তার। প্রকৃতি! প্রকৃতির যেন একটা নতুন তাৎপর্য ধরা পড়ল তার কাছে। আজ এই নিবারণ মুক্ত প্রকৃতির বুকে একটি প্রাণীর প্রাণ বাঁচাতে একজন মানুষের প্রয়োজন হল! আশ্চর্য, পৃথিবীর হিংসাকে যে জয় করতে পারল সে একজন মানুষ!

ঘোর ভেঙে গেল। হঠাৎ আর একটা রাত্রির কথা মনে পড়ল তার। চিন্তার মোড়টা ঘুরে গেল সম্পূর্ণ অন্তদিকে।

মনে পড়ল বাবার সঙ্গে গোরুর গাড়িতে করে ফিরছিল আলোয়াখাওয়ায়

মেলা দেখে। মাঝরাত্রে নামল প্রচণ্ড ঝড় আর প্রবল বৃষ্টি। বাতাসের ঘায়ে চট উড়ে গিয়ে বৃষ্টির ঝাপটায় সব ভিজে যেতে লাগল, কাপড়ের ফাঁক দিয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল গায়ে। মনে হতে লাগল দুপাশের মাতাল কালো অরণ্য এক্ষুনি বা ভেঙে পড়বে তাদের ওপর—পিষে তাদের চুরমার করে দেবে।

তবু গাড়ি চলছিল। হঠাৎ ঝুপ করে একটা শব্দ। পা ভেঙে বসে পড়ল বলদ, বুক সমান কাদায় গাড়ির চাকা আটকে গেছে। গাড়োয়ান শুষ্ক কণ্ঠে বলল, পিছারির গাড়ী আসিলে গাড়ি উঠিবে না বাবু। বড় ভারী, 'ভহ' আছে।

প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরের মতো ঘন জঙ্গলকে ঝাঁকাচ্ছে ক্ষ্যাপা ঝড়।

কালো অন্ধকার, আকাশে কড়্ কড়্ করে ফেটে যাচ্ছে একটা অতিকায় ইস্পাতের পাত। গাড়িতে বসে ভিজতে ভিজতে অসহায় আকুলতার সঙ্গে মনে হয়েছিল কোনো মন্ত্রবলে কি এখন ফিরে যাওয়া যায় না তাদের মুকুন্দপুরের বাড়িতে, ঘরের স্নিগ্ধ নিরাপদ আশ্রয়ে? খর বিদ্যুৎ ঝলসে যাওয়া চোখে সেদিন প্রথম প্রকৃতিকে শত্রু মনে হয়েছিল তার, সেদিন প্রথম—

স্মৃতির মধ্য থেকে ভেসে এল কিছুদিন আগে পড়া মাসিকপত্রের একটা প্রবন্ধ। একজন বিদেশী বিদ্রোহী কবি বলছেন নিজের আত্মজীবনীতে: "অন্ধকারে আমরা পথ হারাইলাম। চারিদিকে ঘন কুয়াশা ও নিবিড় অরণ্য। কাঁটালতায় সর্বাঙ্গ ছিঁড়িয়া যাইতেছে। নির্জন আরণ্যক পাহাড়ে আমরা একান্ত অসহায়। অকস্মাৎ কোথা হইতে একটি বৈদ্যুতিক প্রদীপের আলো আসিয়া পড়িল। আর সেই মুহূর্ত হইতে একদিকে যেমন আমি প্রকৃতিকে ঘৃণা করিতে শিখিলাম, তেমনি সেই সঙ্গে শিখিলাম বিজ্ঞানকে ভালোবাসিতে—"

এই তো সত্য। এই প্রকৃতিপ্রেম, এই মুগ্ধতা—নিজেকে ফাঁকি দেওয়া, জীবনকে বঞ্চনা করা। প্রকৃতির পরিণতিই তো শহর মুকুন্দপুর। সেই মুকুন্দপুরকে আরো বড়, আরো বিস্তীর্ণ করাই তো বিপ্লবীর স্বপ্ন—স্বাধীন ভারতবর্ষের সত্যিকারের স্বাধীনতা! কাঞ্চনের নীল জলে কালী থাকে কিনা রঞ্জন তা জানে না, জানবার কৌতূহলও আর অবশিষ্ট নেই এখন; তবে এটা আজ স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে সেই অলৌকিক ভয়ের চেয়ে ঢের সত্য ওই লোহার পুলটা, ক্ষুধিতা কালীর চাইতে ঢের বেশি সত্য গাড়ির কামরায় ঘুমন্ত আর নিশ্চিন্ত মানুষগুলো।

'আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম—'

ঘুম ভাঙবে বইকি। কিন্তু নিজে ঘুমিয়ে পড়ে নয়, প্রকৃতিকে পূর্ণ থেকে

পূর্ণতর করে দিয়ে। শিলালিপির ফলকে প্রথম ফুটে উঠল জীবনবোধের অক্ষয় স্বাক্ষর।

না—প্রকৃতি নয়। মিথ্যে হয়ে যাক মহুয়া ফুলের এই মাদকতা, এই নেশার উত্তপ্ততা। আজ সত্য হয়ে উঠুক শহর জনপদের ধূলো, গাড়ির চাকার শব্দ, আর সুখ দুঃখ, ভালোমন্দ, অজস্র সংঘাত-চঞ্চল অসংখ্য, অগণিত মানুষ!

নিশিরাত্রি। ঘুম ভেঙে গেল একটা বিশ্রী গোলমালে।

ধড়মড় করে উঠে বসল রঞ্জন। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড মাতামাতি শুরু করে দিয়েছে। তা হলে কি সত্যিই পুলিশ এসে পড়ল? বিছানার তলা থেকে রিভলভারটা নিয়ে সে খাটিয়া থেকে নেমে দাঁড়ালো। চেম্বারে একটা টোটা থাকা পর্যন্ত 'সারেণ্ডার' করবে না।

দরজায় টোকা পড়ল আস্তে আস্তে।

—কে? কে?

—ডর নি খাও বাবু, আমি ফৈয়জ।

আশ্রয়দাতা ফৈয়জ মোল্লা। ওদের দলের সঙ্গে ফৈয়জের কী একটা যোগাযোগ ছিল, তারি সূত্র ধরে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পৌঁছেছে রঞ্জন, আশ্রয় পেয়েছে।

—বাইরে কিসের গণ্ডগোল ফৈয়জ ভাই? পুলিশ নাকি?

—না, না তোমার ডর নাই। দুই ভাই জমি লিই কাজিয়া করোছে।

—মারামারি হচ্ছে বুঝি?

—হাঁ, হছে। তুমি নি ডরাও, শুতি থাকো।

লাঠির ঠকাঠক আওয়াজ উঠছে, উঠছে পৈশাচিক চীৎকার। রঞ্জন জানতে চাইল সভয়ে: খুনোখুনি হবে নাকি!

দরজা ঠেলে এতক্ষণে লণ্ঠন হাতে ঘরে ঢুকছে ফৈয়জ। হেসে বললে, হবা পারে।

—সর্বনাশ! সে কি! আমি যাচ্ছি—

—ক্যানে ব্যস্ত হছেন?—ফৈয়জ হাসল: বহুৎ মানুষ জড়ো হই গেইছেন, তুমি ঠ্যাকাবা নি পারিবেন মান্‌সিলাক। ফের তো তুমাক্ একটা বল্লম মারি দিবে হয়। যাবা দাও—যাবা দাও। অমন ত এইঠে হামেশাই হছে।

কথাটা ঠিক। তা ছাড়া খেয়ালই ছিল না সে ফেরারী—এখানে অজ্ঞাতবাসে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে তাকে। এ অবস্থায় ওদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে

দাঙ্গা-টাঙ্গা থামানো তো যাবেই না, বরং লাভের মধ্যে নিজেকে নিয়েই ঝামেলা বেধে যাবে।

ক্ষুব্ধ হতাশায় বললে, কিন্তু দুই ভাই মারামারি করছে! আপন ভাই?

—না তো কী!—ফৈয়জ হতাশভয়ে বললে, জমি বড় বদ চীজ জী। আর অদের্ও দোষ নাই। পাছত্ শয়তান নাগিলে কী করিবে উয়ারা?

—শয়তান?

—শয়তান তো। জোতদার আমীন মুন্সীর ঘর দেখেন নাই? ওই উদিকে পাকা দালান, বড় বড় ধানের মরাই? ভারী বদমাস উ। ই জমিটা বড় ভালো জমি—ইটা লিবার মতলব করোছে। তাই মতলব দিই দিই দোনা ভাইয়ের কাজিয়াটা নাগাইলে। দুটো একটা খুন হেবে, জেল হেবে, মাম্‌লা করি করি সবাই হই ঘিবে, তো পই জমিটা অর প্যাটত্ যাই সাঁন্ধাইবে।

—চমৎকার মতলব—খাসা মতলব।

—খাসা তো!—

দূরের থেকে চিৎকার আর লাঠির শব্দ আসছে সমানে। একটা অবর্ণনীয় ভয় আর বেদনায় যেন পাথর হয়ে বসে রইল সে। ফৈয়জ মোল্লা ক্লান্তভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা।

—এই করিই তো হামাদের চাষার সর্বনাশ হচ্ছে বাবু। হামাদের ভালোমন্দ হামরা বুঝি না, উয়ারা য্যামন করি হামাদের নাচায়, সেই পাকে হামরা নাচোছি। উয়ারা দাঙ্গা-ফ্যাসাদ বাধাই দেয়, হামারা মারামারি আর কাজিয়া করি, মাথা ফাটাই। ফের অরা 'দেওনিয়া' (উকিল-মোক্তারের দালাল) হই হামাদের শহরত্ উকিলের পাস লিই যায়, মামলা করি, সব হামাদের চলি যায় অদেরই প্যাটে। এই তো সবঠে হচে বাবু—দুনিয়াটা এমনি করিই চলোছে!

দুনিয়াটা এম্‌নি করেই চলছে বটে। মুঠোর মধ্যে শক্ত করে রিভলভারটা আঁকড়ে ধরলে রঞ্জন।

—তোমরা কেন দল বাঁধো না? কেন নিজেদের মধ্যে মারামারি করো? সবাই মিলে একজোট হয়ে নেমে পড়লে দুদিনেই তো ঠাণ্ডা করে দিতে পারো এই সব শয়তানদের!

—হায় হায় বাবু, এত বুদ্ধি যদি চাষার হইত, তবে তো মানুষই হইত উয়ারা—কপালে করাঘাত করলে ফৈয়জ।

—হুঁঃ—

চুপ করে রইল রঞ্জন। স্মৃতির পটে ছবি ভেসে উঠেছে, দেখা দিয়েছে পিছনে ফেলে আসা বিস্মৃতপ্রায় শৈশবের একখানা ছবি। নিশিকান্ত! ধনঞ্জয় পণ্ডিত যাকে মুখ ভেংচে বলতেন: নিশ্-শি-খান্ত! যার কানে হাত দিতে গিয়ে সে অগ্নিস্পৃষ্টের মতো হাত সরিয়ে এনেছিল। যে নির্বোধ পরম সহিষ্ণু নিশিকান্ত একদিন মায়ের কোপ বসিয়েছিল আপন খুড়োর গলায়, চাপ চাপ রক্ত দেখে মাথা আতঙ্কে ঘুরে উঠেছিল তার। রঙ্—খুন খারাপীর রঙ্!

বাইরে থেকে চীৎকার আসছে সামনে। সে নিশিকান্ত আর আজকের দিনের এই দাঙ্গা—এদের পেছনে একই সত্য—একমাত্র ইতিহাস! কিন্তু সেদিনকার নিশিকান্ত অগ্নিপুত্তলি হয়ে শুধু নিজের খুড়োকেই আঘাত করতে পেরেছিল, আজকের এরাও আত্মঘাতটাকেই জেনেছে একমাত্র সত্য বলে। কিন্তু কোনোদিন এই আগের মানুষগুলো কি একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড হয়ে উঠবে না, জ্বালিয়ে শেষ করে দিতে পারবে না পৃথিবীর যত আমিন মুন্সীদের?

ফৈয়জ হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল: আচ্ছা বাবু?

—বলো।

—তোমরা তো দেশ থাকি ইংরাজক তাড়াবা চাহেন?

—হ্যাঁ, সে তো চাই।

—কিন্তু হামাদের কী হেবে?

—কেন, দেশ স্বাধীন হবে?

—ই—সি তো হেবে—ফৈয়জ অপরাধীর মতো বললে, সিটা হেবে কি না হেবে উট লিয়ে হামারা ভাবি না। ইংরেজ গেলে আমীন মুন্সীর কাছ থাকি হামাদের জমি জিরাতগুলান্ কি ফিরি আসিবে? প্যাট ভরি খাবা পামু হামরা? কহেন বাবু, হামরা চাষী মানুষ, সিটাই হামাদের কহেন।

রঞ্জু চুপ করে রইল, জবাব দিলে না।

—ইটা যদি না হৈল্ তো ফের ইংরাজ গেলই কি ফের রহিলেই কি? হামাদের খাজ্‌না তো ইংরাজ ল্যায়না, ল্যায় তশিলদারে। সার্টিফিকিট—সিতো করে জমিদার। হামাদের সব খাই ল্যায় আমিন মুন্সী আর মহাজন—ইংরাজ তো ল্যায়না। কহেন, ইংরাজ গেলেই ইগিলা সব মিটিবে কী?

চুপ করেই সে রইল। আশ্চর্য সব প্রশ্ন করেছে ফৈয়জ মোল্লা, আশ্চর্য এবং অপ্রত্যাশিত। এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্তে প্রস্তুতি নেই তার, তার জানা নেই এ সবের উত্তর। কিন্তু—কিন্তু—বিদ্যুৎ-চমকের মতো মনে হল: তাই তো! এদের শত্রু তো ইংরেজ নয়। এদের যারা প্রত্যক্ষ শত্রু তাদের হাত থেকে এই

মানুষগুলিকে বাঁচাবার জন্তে কোন পথের নির্দেশ দিতে পেরেছে ওরা ? তাই কি বিপ্লবীদের এত বড় আত্মত্যাগের আহ্বানেও সাড়া দিতে পারিনি দেশের সমস্ত মানুষ ? তাই কি এত রক্ত—এত মৃত্যু শুধু ব্যর্থ হয়ে গেছে, দেশের মর্মকেন্দ্রে তা বিন্দুমাত্রও চাঞ্চল্য দিতে পারেনি জাগিয়ে ? ফৈয়জ মোল্লার ঐ প্রশ্নের জবাব বেণুদা তো কোনোদিন দেননি।

তবে ?

সেই বইটা! সেই অবহেলিত, প্রায় দুর্বোধ্য কাগজের মলাট দেওয়া চটি বইটা। সব বুঝতে পারেনি—কিন্তু হঠাৎ যেন মনে হল সেই সত্তীত্বহীন দেশের মানুষগুলো অন্তত এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পেরেছিল। কিন্তু!—

রঞ্জন কোনো কথা বলতে পারল না : শুধু তেম্নি নিথর হয়ে বসে শুনতে লাগল বাইরে জনতার রাক্ষস গর্জন!

প্রতি তিনটা মাস দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল যেন।

কী করে যে এই সময়টা কেটে গেল ভাবতেও আশ্চর্য লাগে দস্তর মতো। তিনমাস আগেকার ভীরু, সুখী মানুষটি আজ কোনোদিক থেকে নিজেকে চিনতে পারে না। কী অদ্ভুত ভাবে এক একটা দিন কেটে গেছে তার! জঙ্গল—সে তো আছেই, গাছের ডালে রাত্রিবাসও হয়েছে। এমন দিন গেছে যে নদীর জল খেয়েই ক্ষিদে মেটাতে হয়েছে তাকে। পোড়ো বাড়িতে রাত কাটিয়েছে, দিন কাটিয়েছে একটা উবুড় করা ভাঙা নৌকোর তলায়। একদিন রাত্রে চৌকীদারের তাড়া খেয়ে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল রাস্তার একটা কালভার্টের নিচে। এক কোমর পচা দুর্গন্ধ জল সেখানে। সর্বাঙ্গে পাঁচ সাতশো জোঁক ধরেছিল সেদিন, মশার নাক মুখ ফুলে দিয়েছিল মনে আছে। দুর্ভোগের চূড়ান্ত হয়েছিল বললেও যেন কথাটাকে কম বলা হয়।

আর মানুষ! কত রকমের মানুষ—কত আশ্চর্য মানুষ!

হাটের গাড়ির লোকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাদের গাড়িতে উঠে পথ পাড়ি দিয়েছে; হাটখোলার চালাঘরে ছেঁড়া চট মুড়ি দিয়ে রাত কাটিয়েছে, সকলের সঙ্গে চিবিয়ে মুড়ি আর ছোলাভাজা খেয়েছে। একদিন কয়েকটা লোক তাকে তাড়া করল, এক যাত্রার আসরে ভিড়ে গিয়ে রক্ষা পেল সে যাত্রা। দুপুর বেলায় ক্লান্ত-পথ চলতে চলতে জল আর বাতাসা খেল জলসত্র থেকে, বাবুর বাড়ির নাটমন্দিরের অন্ধকারে কোণায় বসে খেল প্রসাদ। কত জায়গায়, কত রকম ভাবে আশ্রয় জুটল তার। দুবার ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে, একবার সে রেহাই পেয়েছে সেটা নিতান্ত দৈব-ঘটনা বলেই মনে হয় যেন।

কিন্তু আর নয়—আর সে পারছে না।

কতদিন এমনভাবে চলবে লুকোচুরি—চলবে এমন করে সন্দেহ আর অবিশ্বাসের একটা ক্লান্ত কঠোর বোঝা বয়ে বেড়ানো? বিপ্লবী উলকার এই ভাবেই কি পরিনির্বাণ ঘটল শেষে? দলের সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে, কারো সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। একমাত্র একটুখানি সংযোগসূত্র ছিল পরিমল, সেও ধরা পড়েছে। নিজের সম্পর্কে একটা নিরাসক্তি এসেছে আজকাল, ক্লান্তি এসেছে, এসেছে হতাশ।

সে একা। সে ছেলেমানুষ—অন্তত বেণুদা এই কথাই বলতেন। একটা নিঃসঙ্গতার দিয়ে কী করতে পারবে সে—করতে পারবে কোন্ মহৎ এবং বৃহৎ কাজ?

শুধু মনে হচ্ছে কিছুই হল না, কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। যেমন করে বারে বারে এত সৈনিকের সাধনা ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি করে ওরাও তলিয়ে যাবে অর্থহীন ব্যর্থতার আড়ালে। দেশ কোনোদিন স্বাধীন হবে না—কোনোদিনই না।

কোনো দিনই না?

এ কথা ভাবা অসম্ভব। ক্ষুদিরাম থেকে সূর্য সেন পর্যন্ত সকলেই কি ছুটেছিলেন একটা অবাস্তব আলেয়ার পেছনে! এ যদি সত্য হয় তা হলে জীবনের কোনো মূল্য থাকে না, থাকে না এতটুকুও মূল্য। 'বীরের এ রক্তস্রোত—মাতার এ অশ্রুধারা'—

কিন্তু অস্বস্তি লাগছে। আগের স্টেশনে একটা লোক তার কামরার সামনে দিয়ে পায়চারী করে গেছে বার কতক। লোকটার চোখের দৃষ্টি যেন কেমন কেমন, মনকে সংশয়ী করে তোলে। এই তিন মাসের মধ্যে যে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার পথ সে বয়ে এল, তাতে শিকারীর চোখ সে চিনতে পারে দেখলেই।

সুতরাং গাড়ি থেকে নেমে পড়তে হবে। সরে পড়তে হবে যত শীগ্‌গির সম্ভব। রঞ্জন গলা বার করে চলন্ত গাড়ি থেকে। দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে মেল ট্রেন—চলেছে যেন ঝড়ের ছন্দে। মুখ বার করতেই রাত্রির বাতাস এসে উড়ন্ত একটা কালো বাদুড়ের ডানার মতো ঝাপ্‌টা মেরে দিলে গালে কপালে।

কতগুলো আলো উঠল ঝলমলিয়ে। লাল সবুজ নানা রঙের আলো। একরাশ সিগন্যাল। খট খট করে একটা বিমিশ্র আওয়াজ পাওয়া গেল গাড়ির

চাকায়, আর লাইনের জোড়ে জোড়ে। স্টেশন।

বেল ট্রেন এসে দাঁড়াল। স্টেশনের নামটা পড়া যাচ্ছে না, কিন্তু কুলির চীৎকার উঠেছে। নাটোর—নাটোর!

নাটোর! কী একটা স্মৃতি চেতনার মধ্যে নড়ে উঠল চকিতে সরীসৃপ গতিতে। একটা চমক লাগা দুর্বোধ্য প্রেরণায় রঞ্জন হঠাৎ নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। চলল অন্ধকার প্ল্যাটফর্মটার পাশ দিয়ে এগিয়ে।

রাত খুব বেশি হয় নি। শহরের ভেতরে এসে যখন ঢুকল প্রায় তখন সাড়ে নটার মতো হবে। খুব কি দেরী হয়ে গেছে? বোধ হয় না। অন্তত করুণাদিকে বিরক্ত করবার পক্ষে নিশ্চয়ই যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে যায়নি।

ঠিকানাটা জোগাড় করতে অসুবিধে হল না বিশেষ। গোটা দুই মোড় ঘুরতেই একটা কাঁচা ড্রেনের পাশে একতলা পুরোনো বাড়িটা চোখ পড়ল। বাড়ির সামনেই একটা ল্যাম্পপোস্ট, তার ম্লান আলোয় দেখা গেল নেম-প্লেট, ক্ষয়ে-যাওয়া কালো টিনের পাতার ওপর বিবর্ণ কতগুলো পুরোনো অক্ষর; এ, এন, ঘটক, বি-এল। উকিল, নাটোর।

একবার মাত্র দ্বিধা! তারপর মনকে শক্ত করে কড়ায় ঝাঁকুনি দিলে।

দরজা খুলে গেল। উদ্‌ঘাটিত হল একটি উকিলের পুরোনো সেরেস্তা। ভাঙা চেয়ার, ময়লা টেবিল, কাচভাঙা আলমারীতে রাশীকৃত বই আর পুরোনো কাগজপত্র। চশমাচোখে পাকাচুল এক ভদ্রলোক দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন লণ্ঠন হাতে। ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, কী চাই?

—আমি করুণাদির সঙ্গে দেখা করব।

—করুণাদি! মানে বৌমা? কোত্থেকে আসছেন আপনি?—ভদ্রলোকের ভ্রূরেখা আরো কুঞ্চিত হয়ে উঠল এবারে।

—আমি তাঁর দেশের লোক।

—আচ্ছা বসুন, খবর দিচ্ছি—

সামনেই একটা আধভাঙা বেঞ্চি, খুব সম্ভব মক্কেলদের জন্যে। তারই ওপর বসে পড়ল সে। কী করে বসেছে নিজেই যেন ঠিক বুঝতে পারছে না। একি ভালো হল? ভালো হল এমন করে ঝোঁকের মাথায় এখানে চলে আসা? তাছাড়া, তাছাড়া—হঠাৎ চমকে উঠল: বেণুদার মৃত্যুর কথা সে ভুলে গেল কী করে? সে শোকের আঘাত করুণাদির বুকে কী ভাবে বেজেছে তা তো কল্পনা করা অসম্ভব নয়। এর পরে কেমন করে সে করুণাদির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, কেমন করে সে—

মনে হল উঠে পালিয়ে যায়, এক মুহূর্ত এখানে তার আর বসা উচিত নয়। করুণাদি এপথ তাকে ছাড়তে বলেছিলেন। এই পথ সম্পর্কে অমানুষিক ভয় ছিল তাঁর, ছিল সীমাহীন আতঙ্ক। আর এর জন্যে তাঁকেই দিতে হল চরম মূল্য, পরিশোধ করতে হল এর সমস্ত ঋণ—

উঠে দাঁড়াতে যাবে, এমন সময় ওপাশের দরজার পরদা ঠেলে করুণাদি এসে দাঁড়ালেন।

—একি, একি রঞ্জন!

কাঁপা অনিশ্চিত গলায় রঞ্জন বললে, আমি ফেরারী করুণাদি, এখন আমার নাম প্রবোধ।

কেমন অদ্ভুত একটা শূন্য বেদনাময় দৃষ্টিতে তাকালেন করুণাদি। ঠোঁট দুটো অল্প অল্প নড়ে উঠল তাঁর, কয়েক মুহূর্ত একটা শব্দও বেরুল না। তারপর অস্পষ্ট স্বরে বললেন, এসো ভাই, ভেতরে এসো।

রঞ্জন দ্বিধা করতে লাগলো।

—কোনো লজ্জা নেই, এসো প্রবোধ। লণ্ঠন হাতে সেই বৃদ্ধ ফিরে এসেছেন। চোখে তাঁর তেমনি ক্রূর সংশয়ীর দৃষ্টি। করুণাদি বললেন, এ আমার মামাতো ভাই প্রবোধ, ওঁকে প্রণাম করো।

যন্ত্রচালিতের মতো বৃদ্ধকে প্রণাম করল:

এ, এন ঘটক তবু ভ্রূকুঞ্চিত করেই রইলেন। তারপর বিস্বাদ বিরক্ত গলায় বললেন, জয়োস্তু!

লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় একটা টুলের ওপর স্থির হয়ে বসে আছে রঞ্জন। জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে আছেন করুণাদি, একটা কথা ফুটছে না কারো মুখে।

শুধু পাশের ঘর থেকে উঠছে অবিচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খল চীৎকার: মেরে ফেললে, মেরে ফেললে আমাকে! অদ্ভুত, অমানুষিক চিৎকার। মানুষের গলা নয়, যেন প্রেতের কণ্ঠ। শব্দটা যেন পৃথিবী থেকে আসছে না, ঠেলে উঠছে পাতালের কোনো গভীর অন্ধকার থেকে। এক একটা চীৎকারে যেন গায়ের ভেতরে হিম হয়ে আসে—শুষে খেল, সব রক্ত শুষে খেল আমার—

অশ্রু-করুণ চোখ এতক্ষণে রঞ্জনের দিকে ফেরালেন করুণাদি: ওই শুনছ তো? উনিই আমার স্বামী।

রঞ্জন অস্পষ্ট স্বরে বললেন, কিন্তু—

—কোনো কিন্তু নেই ভাই—করুণাদি বিকৃতভাবে হাসলেন: এইটেই

সত্য। আজ এর চাইতে বড় সত্য আমার আর কিছুই নেই।

—কী লাভ?—তেমনি হাসির রেখাটা করুণাদির মুখখানাকে বীভৎস করে রইল: পাগলকে দেখে কী করবে? ও একটা দুঃস্বপ্ন—শুধু মনকেই কালো করে দেবে তোমার, তার বেশি কিছুই নয়।

—কিন্তু কেন? কেন এমন হল?

দুহাতে মুখ ঢাকলেন করুণাদি। তারপর যখন হাত সরিয়ে নিলেন তখন দেখা গেল গালের পাশ দিয়ে তাঁর বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে।

—ভেবেছিলাম অনেক দিন আগেই তোমাকে সেকথা বলব ভাই। কিন্তু বলতে পারিনি মুখে আটকে আসত। আজ আর দ্বিধা নেই, আজ যখন তুমি এসে পড়েছ তখন তোমাকে সব কথা বলবার জন্যই নিজেকে তৈরী করে নিয়েছি। দাদার মৃত্যুকে আমি মেনে নিয়েছি, ও যে ঘটবে তা আমি জানতাম। কিন্তু মৃত্যুর চেয়ে এই যে দারুণ যন্ত্রণা, তিলে তিলে এই যে আমার শাস্তি—

শেষ হল না কথাটা। পাশের ঘর থেকে তেমনি পৈশাচিক আকাশ ফাটানো চীৎকার উঠল: ক্ষমা করো, আমায় ক্ষমা করো নীলকণ্ঠ। আমার রক্ত খেয়ো না, আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও নীলকণ্ঠ—

করুণাদি বললেন, শোনো।

আর একটা আশ্চর্য ভয়ঙ্কর কাহিনীর যবনিকা উঠল দৃষ্টির সামনে। বাইরের ঝাঁ ঝাঁ রাত্রির স্তব্ধতার সঙ্গে সঙ্গে সে কাহিনী ঘরের মধ্যে যেন বিস্তার করে দিলে একটা হিম আতঙ্কের জাল।

অমিয় ঘটক। যেমন শক্তিমান, তেমনি বেপরোয়া মানুষ। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ডিগ্রি নিয়ে এখানে বসেছিল ব্যবসা করতে। কিন্তু ওটা তার খেলামাত্র, তার সত্যিকারের পরিচয় ছিল একেবারেই আলাদা।

বিপ্লবী দলের নেতা সে। যেমন কঠোর, তেমনি নিষ্ঠুর। তার কাছ থেকেই বেণু চৌধুরী প্রথম এ পথের দীক্ষা গ্রহণ করে। সেই বেণু চৌধুরীকে রিভলভার ছুঁড়তে শিখিয়েছিল নিজের হাতে।

করুণাদির কিছু উপায় ছিল না। অমন শক্তিমান স্বামীর ইচ্ছাকে বাধা দেবার মতো জোর কোথাও ছিল না তাঁর মধ্যে। বিপ্লবী নেতা অমিয় ঘটক। তার পথ নিশ্চিত, তার সঙ্কল্প অটল।

দলের একটি ছেলে ছিল নীলকণ্ঠ। প্রিয়দর্শন তরুণ। গান গাইতে, বাঁশি বাজাতে পারত। সকলেই ভালোবাসত তাকে, অমিয় ঘটক ভালোবাসত সব চাইতে বেশি। কবি, শিল্পী নীলকণ্ঠ। রঞ্জনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল

তার, তাই প্রথমদিন তাকে দেখেই করুণাদি অমন করে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু কবি শিল্পীর দুর্বলতা একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ল অপ্রত্যাশিত একটা ভূমিকম্পের মধ্য দিয়ে। যেন হুড়মুড় করে আকাশটা এসে ভেঙে পড়ল মাথায়। নীলকণ্ঠের পাশের বাড়িতে একটি মেয়ে পড়ত ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশে, আর তাকে গান শেখাত নীলকণ্ঠ! একদিন খবর পাওয়া গেল আত্মহত্যা করেছে মেয়েটি। আর—আর সে গর্ভবতী ছিল!

দিন তিনেক পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবার চেষ্টা করল নীলকণ্ঠ। কিন্তু অমিয় ঘটকের চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারল না বেশিদিন। শহরের একটা পোড়ো বাগানের মধ্যে এক বর্ষার রাত্রে বিচার হল নীলকণ্ঠের।

সে বিচারের ফলাফল যা যা হওয়া উচিত তাই হল। অনেক চিৎকার করেছিল নীলকণ্ঠ—অনেক কেঁদেছিল। কিন্তু নির্জন বাগান আর বৃষ্টির শব্দে সে চিৎকার কারো কানে যায়নি: সে কান্নায় অমিয় ঘটকের পাথরে গড়া মনে আঁচড় পড়েনি এতটুকুও।

কপালে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে গুলি করা হল নীলকণ্ঠকে। নিঃশব্দে পড়ে গেল সে। তারপর টুকরো টুকরো করে মাছ কোটার মতো করে কাটা হল তাকে—বস্তার মধ্যে ইঁটের টুকরো পুরে ফেলে দেওয়া হল বিলের মধ্যে। সারা রাত নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টিতে রক্তের একটা বিন্দুও অবশিষ্ট রইল না কোনখানে।

পরদিন থেকে নীলকণ্ঠ নিরুদ্দেশ। সঙ্গতভাবে যা মনে করা উচিত তাই মনে করল সকলে। এই কেলেঙ্কারীর পর স্বাভাবিকভাবেই ভয়ে আর লজ্জায় সে দেশছাড়া হয়েছে। কয়েকদিন আলোচনা করল, বাপ মা কান্নাকাটি করে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে, "নীলু, ফিরে আয়"—তারপর তাকে ভুলেও গেল কিছুদিনের মধ্যেই।

কিন্তু একজন ভুলল না, ভুলতেও পারল না। সে অমিয় ঘটক।

পরের রাত থেকেই সে আর ঘুমুতে পারল না।

ঘুম এলেই স্বপ্ন দেখে। দেখে অতি ভয়ঙ্কর, পৈশাচিক একটা স্বপ্ন।

পাশে এসে দাঁড়ালো নীলকণ্ঠ। তার সর্বাঙ্গে রক্ত, তার চোখ দুটো জ্বলন্ত রক্তের পিণ্ড! কিছুক্ষণ সেই রক্তপিণ্ডের আগুন সে ছড়াতে লাগল অমিয় ঘটকের গায়ে। তারপর এক লাফে সোজা তার বুকের ওপর চেপে বসল।

সেইখানেই শেষ নয়। তারপরেই যা ঘটল তা সৃষ্টির পরমতম বিভীষিকা! অতি বড় বীভৎস কল্পনাতেও সে বিভীষিকা ফুটে ওঠে না।

আস্তে আস্তে নীলকণ্ঠের মুখটা লম্বা হতে লাগল। ক্রমে তা মশার হুলের মতো দীর্ঘ সুচালো হয়ে উঠল, তারপর সেই সুচালো মুখটা সে বিঁধিয়ে দিলে অমিয় ঘটকের গলায়। তার চোখের রক্তপিণ্ড থেকে আগুন ছুটে পড়তে লাগল, সে শুষে খেতে লাগল অমিয় ঘটকের গলার রক্ত।

আতঙ্কে আর্তনাদ করে জেগে উঠল অমিয় ঘটক।

কিন্তু শুধু এক রাত্রিই নয়। একদিন, দুদিন, তিনদিন। প্রতি রাত্রে ওই একই স্বপ্ন, একই বিভীষিকার পুনরাবৃত্তি। বস্তুবাদী কঠোর অমিয় ঘটক মাদুলী-তাবিজ নিলে, রোজা ডাকালো। ছুটে বেড়াল ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে। কিন্তু নীলকণ্ঠ তাকে ছাড়ে না। প্রতি রাত্রে, চোখে একটুখানি ঘুমের আমেজ নামলেই সে আসে, একটা গুরুভার পাথরের মতো চোখে বসে বুকের ওপর, তার মুখখানাকে সুচালো দীর্ঘায়িত করে অমিয় ঘটকের রক্ত শুষে খায়।

অমিয় ঘটক পাগল হয়ে গেল।

পাঁচ বছর ছিল রাঁচীতে। ভারতবর্ষের সমস্ত বড় বড় ডাক্তারে চেষ্টা করেছে। কিন্তু কিছু হয়নি। ডাক্তারেরা বলেছে: Insanity—একটা প্রবল Psychological reaction-এর ফল। Beyond medical science।

কাহিনী শেষ হল।

অনেক রাত হয়ে গেছে। লণ্ঠনের ক্ষীণ শিখাটা আরো অস্পষ্ট হয়ে গেছে, তেল নেই নিশ্চয়। বাইরে সীমাহীন স্তব্ধতায় পৃথিবী পড়েছে আচ্ছন্ন হয়ে। করুণাদির মুখ দেখা যাচ্ছে না।

—নীলকণ্ঠ, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো।—বাঁচাও আমাকে—

অমানুষিক প্রেতায়িত চীৎকার। আতঙ্কে দাঁতে দাঁত বাজতে লাগল রঞ্জনের। সে দেখতে পাচ্ছে—চোখের সামনে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রক্তাক্ত নীলকণ্ঠের দানবীয় মূর্তিটাকে। তার চোখ নেই, তা অগ্নিপিণ্ড, আর তাই থেকে গলিত আগুনের মতো রক্ত ক্ষরিত হয়ে পড়ছে। মুখটাকে সুচালো প্রলম্বিত করে সে পিশাচমূর্তিটা রক্ত শুষে খাচ্ছে, মেটাতে চাইছে তার দানবীয় পিপাসা!

—নীলকণ্ঠ, আর নয়—আর নয়—

না, আর নয়। এ বাড়ি যেন ভূতে পাওয়া। করুণাদিও যেন ভূতগ্রস্ত। কাল ভোর না হতেই এ অভিশপ্ত পরিবেশ ছেড়ে চলে যাবে, এক মুহূর্তও আর থাকবে না...

...সকালে নাটোর স্টেশনের বুকিং অফিসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, এমন

সময় পেছন থেকে কাঁধে হাত পড়ল তার। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ফিরে তাকালো।

দুটো, রিভলভার উদ্যত হয়ে আছে তার দিকে, আটদশজন পুলিশ এসে ঘেরাও করেছে। যাক্, কিছুই আর কারবার নেই তাহলে।

ট্রেনের সেই লোকটা মিষ্টি করে হাসল: আজ সাতদিন বড় ভুগিয়েছেন আমাদের। এবারে চলুন।

—চলুন—শান্ত স্বরেই উত্তর দিলে রঞ্জন।

—উনিশ—

জেল হাজতেই দেখা করতে এল ধনেশ্বর।

তীক্ষ্ণ চোখ দুটো বার কয়েক নেচে উঠল তার, তারপরেই কোঁৎ করে একটা মশা গিলে নিলে।

ধনেশ্বর হাসল: ফিরে এলে তা হলে! বেশ বেশ।

লোহার কপাটের মতো ঠোঁট দুটোকে শক্ত করে চেপে রইল রঞ্জন, উত্তর দিলে না।

—ভালো কথা তখন কানে গেল না—এবার ট্রান্সপোর্টেশন ফর্ লাইফ—সেইটেই সুখের হবে, কী বলো? ওয়েল, উই উইল্ মিট্ র‍্যাদার অন্—

তারপর যে দেখা সাক্ষাৎগুলো ঘটেছিল তার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। প্রথম দিন যখন ধনেশ্বরের হান্টার গায়ে পড়েছিল, তার চাইতে অনেক শক্ত হয়ে গেছে শরীর, অনেক দৃঢ় হয়েছে মন। দাঁতের ওপর দাঁত রেখে অসহ্যতম যন্ত্রণাকে সহ্য করবার অভ্যাসটাও আয়ত্ত করতে পেরেছে। শেষ পর্যন্ত হালই ছেড়ে দিলে ধনেশ্বর। চিনতে পেরেছে। বুঝেছে এভাবে সুবিধে হবে না। যতই ঘা পড়ছে ততই শক্ত হয়ে এঁটে বসছে কংক্রীটের ভিতের মতো। চাবুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হিংস্রভাবে চুরুটের গোড়াটা কামড়ে ধরলে শেষ পর্যন্ত।

—কিছু বলবে না?

—জানি না।

—কোনো স্টেট্‌মেন্ট দেবে না?

—যা বলেছি এই আমার স্টেট্‌মেন্ট।

হঠাৎ ধনেশ্বর হা-হা করে হেসে উঠল। বুলডগের মতো ভারী মুখের

পেশীগুলো হাসির ধমকে খেলে খেলে যেতে লাগল ঢেউয়ের মতো। অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়েও বিস্মিত ঝাপ্‌সা দৃষ্টিতে থাকতে ইচ্ছে করল হঠাৎ।

—তুমি বলবে না, কিন্তু সব খবর পৌঁছে গেছে আমাদের কাছে। ইয়েস, এভ্‌রি ডিটেল্‌ অব ইট্‌।

রঞ্জন শুনতে লাগল।

—পরিমল লাহিড়ী সব কন্‌ফেস করেছে। হালদারের দোকানে ডাকাতি, বরদাবাবুর বন্দুক চুরি—

—পরিমল!

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—পরিমল।—ধনেশ্বর এবার ঝাঁ করে সামনে ঝুঁকে পড়ল: ইয়োর বুজ্‌ম্‌ ফ্রেণ্ড্‌। কে কে ছিল, কেমন করে প্ল্যান নেওয়া হয়েছিল—সব বলে দিয়েছে, এভ্‌রিথিং!

চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে উদার-ভঙ্গিতে ধোঁয়া ছড়িয়ে দিলে। তারপর মিটি মিটি বাঁকা দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল কথাটার প্রতিক্রিয়া। আর বাঁ হাতের তর্জনীটা দিয়ে অধৈর্যভাবে খুঁটতে লাগল রিভলভারের চামড়ার খাপের বোতামটা।

শরীরে মার্ফিয়ার ইঞ্জেকশন দিয়ে যেন সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলো অসাড় করে দিয়েছে কেউ। নিজের কানকে বিশ্বাস করা যায় না, সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি যেন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এও সম্ভব? পরিমল বিশ্বাসঘাতকতা করেছে! দলের সব কথা ফাঁস করে দিয়ে চরম সর্বনাশ করে বসেছে তার! রঞ্জুর মনে হল পায়ের তলা থেকে ঘরের মেজেটা যেন কেউ টেনে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বুঝি!

ধনেশ্বরের চোখে জলের পূর্বাভাস ঝিলিক দিয়ে উঠল। ওষুধ ধরেছে বলেই মনে হয়। উৎসাহিতভাবে কাগজ-কলম টেনে নিয়ে বললে, তা হলে সব বলেই ফেলো এবার। লুকোবার চেষ্টা করে আর কী ফল হবে?

ঠোঁট দুটো তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নড়ে উঠল একবার—কিন্তু কোনো শব্দ বেরুল না।

—এখনো জবাব দিচ্ছ না? ভেবে দেখো, সব তো জেনেই ফেলেছি। এখন তোমার স্টেট্‌মেণ্ট্‌ না পেলেও কেস্‌ দাঁড় করাতে আমার কোনো অসুবিধে হবে না। বরং তাতে তোমারই লাভ হত, কন্‌ভিক্‌শনটা হয়তো কিছু light হতে পারত।

মনের মধ্যে একটা তোলপাড় চলেছে। শাস্তি কম হবে সেজন্যে নয়,

পরিমলের কৃতঘ্নতায় সমস্ত মানসিকতার ভিত্তিটাতেই মস্ত একটা চিড় খেয়েছে তার। এমনিই কি সবাই, রোহিণীর সঙ্গে পরিমলের কী পার্থক্য নেই বিন্দুমাত্রও? তা হলে কিসের ভরসায় সে এই বিপ্লবের পথে নেমে এসেছিল, কোন্ প্রত্যয়ে, কোন্ শক্তিতে?

কথা বলতে যাচ্ছিল, হয়তো কিছু একটা বলেও ফেলত, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারল না অত্যুৎসাহী ধনেশ্বরই।

টোকা দিয়ে চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফেলে বললে, কিছুই আর লুকোতে পারবে না। এমন কি রূপসার পথে যে মেল রবারিটা হয় তাতে তোমাদের দলের যারা ছিল তাদের নামও আমার জানা হয়ে গেছে।

চকিতে দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল রঞ্জনের, চোখের পলকে সরে গেল মান্নুর ছায়াটা। কৌতুকের এবং স্বস্তির এক ঝলক দক্ষিণা বাতাস এসে মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

ধনেশ্বরের চালাকিটা ধরে ফেলেছে। সব মিথ্যে বলছে, বলছে খুশিমতো বানিয়ে বানিয়ে। রূপসার মেল-ডাকাতিটা ওদের দল থেকে মোটেই করা হয়নি, করেছিল নিশ্চিন্তপুরের আর একটা দল। ওদের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই, পরিমলের পক্ষে সে দলের কারুর নাম জানাও সম্ভব নয়। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল, কাঁধ থেকে ভূত নেমে গেল একটা। হাজার আঘাতেও যা টলেনি, মাত্র একটি উপর-চালাকিতে তা আর একটু হলেই ভেঙে পড়েছিল!

পীড়িত মুখে রঞ্জু হাসল: তা হতে পারে।

—এর পরে তোমার আমায় কোনো কথাই বলতে বাধা নেই নিশ্চয়?

—কিন্তু কোনো কথাই তো আমার জানা নেই?

—জানা নেই—না?—আশ্চর্য, এবার আর রাগ করলে না ধনেশ্বর, অভ্যস্ত রীতিতে সিংহের মতো গর্জনও নয়। নিঃশব্দে হাতের কলমটা টেবিলের ওপর সে নামিয়ে রাখল: মানে, বলবে না?

রঞ্জন জবাব দিলে না।

—বেশ, ট্রান্সপোর্টেশন ফর লাইফ তা হলে আর কেউ ঠেকাতে পারবে না—চেয়ারে শিথিলভাবে শরীরকে এলিয়ে দিলে ধনেশ্বর: ইয়াদ মিঞা?

—জী?

—নিয়ে যান একে—

হাঁরতে উৎপাত করেও যখন সুবিধে হল না, তখন নিরুপায় ধনেশ্বর তাকে

পাঠালো জেলখানায়। এখন একেবারেই একা সে। তাকে সকলের চাইতে আলাদা ঘরে রাখা হয়েছে, রাখা হয়েছে 'সেলে'। এক নিঃসঙ্গ দিন কাটে—দিন কাটে তার ঘরটার মুখোমুখি কম্পাউণ্ডের ওপারে ফাঁসির 'সেলটা'র দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। ফাঁসির সেল খালি। ওর শূন্যতার মধ্যে কেমন একটা অশুভতা আছে, থেকে থেকে হঠাৎ যেন মনে হয় ওই ঘরটার ভেতর কী কতগুলো মূর্তি নড়ে নড়ে বেড়াচ্ছে। গা ছম ছম করে ওঠে—বোধ হতে থাকে ওর মধ্যে প্রেতাত্মার পদসঞ্চার শুনতে পাচ্ছে সে।

এ ঘরে যেদিন প্রথম এসে পৌঁছুল, সেদিন রাত হয়ে গিয়েছিল। ওই ঘরটায় কী আছে না আছে তা তার নজর পড়েনি, পড়বার মতো অবস্থাও তার ছিল না তখন। কম্বলের বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য আর অসীম শ্রান্তিতে জড়িয়ে এসেছিল তার চোখ দুটো।

ঘুম ভাঙল শেষ রাত্রিতে। ভাঙল একটা আর্ত কান্নায়।

—এ ভগবান বাঁচায় দে—বাঁচায় দে—

সে চিৎকারের তুলনা নেই—ভাষায় তার ব্যাখ্যা হয় না। সমস্ত শরীর হিম হয়ে গিয়েছিল গায়ের ভেতর যেন তির তির করে বইতে শুরু করেছিল ঠাণ্ডা বরফের প্রবাহ।

বুঝিয়ে দিল সেন্ট্রি। টর্চের আলো রঞ্জুর ভীত-বিহ্বল মুখের ওপর ফেলে বললে, খুব খারাপ লাগছে, না বাবু?

—ও কিসের কান্না সেন্ট্রি? কে কাঁদছে?

—ফাঁসীর আসামী বাবু। ফাঁস দিতে নিয়ে গেল।

ফাঁস দিতে নিয়ে গেল! চারদিকে যেন নিঃশব্দ অথচ অনুভববেদ্য একটা ঝাঁঝরের আওয়াজ উঠল ঝম্ ঝম্ করে। থমকে দাঁড়িয়ে গেল রক্ত।

—বাঁচায় দে রাম—জান বাঁচায় দে—

জান্তব আর্তনাদে জেলখানার স্তব্ধ বাতাসটা শিউরে শিউরে উঠছে—পাষাণপুরীর চারদিকে ওই কান্না মাথা ঠুকে মরছে। মানুষের কাছে আজ আর আবেদন জানিয়ে কোনো ফল নেই, তাই বাঁচবার শেষ আক্ষেপ: নির্বোধ কাতরতায় পৌঁছে দিচ্ছে ভগবানের দরবারে।

চারদিকে পাক খেয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছে কান্নাটা—নিস্তব্ধ জেলখানার ওপর ছড়িয়ে পড়ছে মড়কলাগা কোনো গ্রামে মাঝরাতে হঠাৎ ভয় পাওয়া কুকুরের গোঙানির মতো। ও কান্না এখন আর মানুষের গলা থেকে বেরুচ্ছে না, যেন সেই কুকুরটার গলা টিপে ধরেছে কোনো ছায়ামূর্তির অশরীরী থাবা।

সেটি শব্দ করে থুথু ফেলল মাটিতে। বললে, রাম, রাম, সীতারাম!—কথার শেষে গলাটা কেঁপে কেঁপে রেশ খেয়ে গেল। যেন ভয় পেয়েছে।

—হায় রাম—বাঁচায় দে রে—

অনেক দূর থেকে আসছে চিৎকার। সে যে কী ঠিক বোঝানো যায় না।

শরীরের মধ্যে ঝম্ ঝন্ করে সেই নিঃশব্দ বাজনা—সেই কুকুরটার আকৃতি! আরো মনে পড়ছে ছেলেবেলায় তার একটা বেড়ালের বাচ্চাকে শেয়ালে নিয়ে গিয়েছিল, বহুদূর থেকে তার কান্না এমনি করেই ভেসে এসেছিল অন্ধকারে। দু হাতে কান চেপে ধরল রঞ্জন, কম্বলে মুখ ঢেকে পড়ে রইল মূছিতের মতো। তারপর কখন মোম-মাখানো দড়ি লোকটার কণ্ঠনালীতে চেপে বসেছে, তার আর্তনাদকে রুদ্ধ করে দিয়েছে, রঞ্জন তা টেরও পায়নি। যথা সময়ে ওয়ার্ডারের হাঁকে মূর্ছাভঙ্গ হয়েছে তার।

আপাতত ওই ফাঁসির সেল স্তব্ধতায় ঢাকা। যেন মড়কলাগা গ্রামে স্তব্ধতার বেষ্টনী। কিন্তু ওর আড়ালে কত মানুষের আকুল কান্না মিশে আছে কে জানে। ওর দেওয়ালের গায়ে শেষ চেষ্টায় তারা আঘাত করেছে, মাথা ঠুকে ঠুকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে ওর লোহার গরাদে, ওর মরচের ওপর মানুষের রক্ত কালো কালো স্তর ফেলেছে দিনের পর দিন। অপঘাত আর অভিসম্পাত দিয়ে গুষ্ঠিত ওই ঘরটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে কেমন ঝিম ধরে আসে, কেমন যেন নেশা লাগে। হঠাৎ খানিকটা চাপ বাঁধা রক্ত দেখে মাথা ঘুরে যাওয়ার মতো।

জেলখানা। শুধু মানুষকে ফাঁসিই দেয় না। তার চাইতে আরো সাংঘাতিক, আরো ভয়ঙ্কর। তিলে তিলে গলা টিপে মারে মানুষের হৃদয়কে, বোধকে। অল্প অল্প বিষ খাইয়ে দিনের পর দিন হননের একটা পৈশাচিক প্রক্রিয়া চলছে এখানে। বিচারের নামে নরমেধ। গ্ল্যাডিয়েটর প্রথার বর্বরতা আজ আর নেই; আছে নৃশংসতর নীতি—বিচারের দিনের আলো দিয়ে রাতের অন্ধকারে ভ্যাম্পায়ার দিয়ে রক্ত চুষে খাওয়ানোকে ঢেকে রাখা।

শুধু কি ওই লোকটারই কান্না? ওই কি শুধু চীৎকার করে বলছে: বাঁচায় দে, বাঁচায় দে রাম?

শুধু ওই ফাঁসির সেলটাই? না, তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জেলখানাতেই ওই আর্তনাদ গুমরে গুমরে উঠেছে?

—হায় রাম জান বাঁচায় দে—

হঠাৎ ঠোঁট দুটো শক্ত হয়ে ওঠে। আর দুর্বলতা নেই। এক সঙ্গে

অনেক কিছু বুঝতে পেরেছে, অনেক কিছুর অর্থ যেন জলের মতো সহজ হয়ে গেছে। বিপ্লবীর কাজ শেষ হয়নি—শেষ হয়নি কিছুই। সব নতুন করে শুরু করতে হবে। দেশ জোড়া এই জেলখানাটাকে ভেঙে ফেলতে না পারলে আর নিষ্কৃতি নেই। বাইরের জেলখানা, মনের জেলখানা।

সেন্ট্রিটা বীরপদভরে চারদিক কাঁপিয়ে চলাফেরা করছিল—মাঝে মাঝে বক্র আর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল ওর দিকে। হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালো—দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল।

যেন কী একটা তার বক্তব্য আছে।

জিজ্ঞাসা করলে, কিছু বলবে ?

অপ্রতিভ ভাবে হাসল সেন্ট্রি। হাসিটা শুধু নতুন নয়—অপরিচিত ঠেকল। এমন জায়গায় এ হাসি যেন প্রত্যাশা করা যায় না।

—না, কিছু নয়—খট্ খট্ করে দু পা এগিয়ে গিয়েই সে আবার ফিরে এল। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলে বিশ্বস্ত গলায়, আপনারা সাঁচ ইংরেজ তাড়াতে পারবেন বাবু ?

রঞ্জনের মুখ মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠল : এসব কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ ?

—না এম্‌নি—কয়েক সেকেণ্ড সেন্ট্রি অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইল।

আস্তে আস্তে বললে, পারলে আপনারাই পারবেন বাবু। মেদিনীপুর জেলে একজন স্বদেশী বাবুর ফাঁস দেখেছি আমি। জোর গলায় পরে চেঁচিয়ে বলেছিল—'বন্দে মাতরম্'—

বলেই, আবার সে অপরাধীর মতো দ্রুতবেগে এগিয়ে চলে গেল।

অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রঞ্জন। এ স্বরে কৃত্রিমতা নেই, ফাঁকি নেই। নরকের দূত মাত্রেই নারকীয় নয়। পাথরের আড়ালে চাপা পড়েছে বলেই অপঘাত ঘটেনি পাতাল গঙ্গার।

সেন্ট্রি ফিরে এসেছে। ওর মুখোমুখি এবার চোখ তুলে দাঁড়িয়ে গেল সে।

তার দৃষ্টি এবার আলাদা। হঠাৎ যেন তার দুটি চোখে চকমকি ঠুকে দিয়েছে কেউ।

চাপা ইস্পাতী গলায় বললে, আমার ঠাকুরদা কানপুরে লড়াই করেছিল মিউটিনিতে। ইংরেজ ধরে তাকে ফাঁস দিয়েছিল। কিন্তু—

—সরকার, সেলাম—

জেলখানার ও প্রান্তটা অবারিত হয়ে উঠল। জেলার অথবা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ এগিয়ে আসছে কেউ। হঠাৎ সেন্ট্রির মুখের চেহারা বদলে

গেল, ফিরে এল স্বাভাবিক যান্ত্রিক নির্লিপ্ততা।

—ঠিক সে রহো—

পা দুটো জড়ো করে অ্যাটেন্‌শনের ভঙ্গিতে খটাস্‌ করে একটা জোর আওয়াজ তুলল সে। তারপর অত্যন্ত দ্রুতবেগে মার্চ করে চলে গেল জেলখানার লম্বা করিডোরটা দিয়ে।

চোখের তারা দু'টা ঝলমল করে উঠল রঞ্জনের। আর ভয় নেই, আর দ্বিধা নেই। শক্ত বনিয়াদের নীচেই সংকেত করছে ভেঙে চুরমার করে দেবার চোরাবালি। আজ যাকে নিষ্প্রাণ পাথরের পিণ্ড বলে মনে হচ্ছে, তার ভেতরে ধুঁইয়ে উঠছে আগ্নেয়গিরি। মিউটিনিতে যে রক্ত একবার দপ দপ করে জ্বলে উঠেছিল, আজও তার দাহতা নষ্ট হয়নি। ইন্ধন পেলেই জ্বলে উঠবে। লাভা জমেও ঢাকা পড়েনি ক্রেটারের জ্বালামুখী!

না, আজ আর ধনেশ্বরকে তার ভয় নেই। সব ঠিক আছে। সব নির্ভুল।

ভয় সত্যিই নেই।

পরের দিন যখন ধনেশ্বর জেলখানায় এসে আবার তাকে ডেকে পাঠালো, তখন সে শিউরে উঠল তার মুখের চেহারা দেখে। আশ্চর্য, একদিনেই কেমন যেন বদলে গেছে ধনেশ্বর। হঠাৎ যেন কেমন বুড়ো হয়ে গেছে, চোখের কোণে কালির পোঁচড়া পড়েছে, কুঞ্চন লেগেছে গালের চামড়ায়। অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে ধনেশ্বরকে, মনে হচ্ছে সে অসুস্থ।

দুজন সশস্ত্র রক্ষী সঙ্গে এসেছিল। ধনেশ্বর বললে, বাইরে দাঁড়াও তোমরা।

সেলাম করে তারা ঘরের বাইরে চলে গেল।

—বোসো রঞ্জন—একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলে ধনেশ্বর।

—বসব?—আশ্চর্য হয়ে গেল সে।

—হ্যাঁ—বোসো।—অন্যমনস্কভাবে ধনেশ্বর জবাব দিলে।

রঞ্জন বসল না। চাপা ঠোঁটে উদ্ধত ভঙ্গিতে বললে, কেন মিথ্যে পীড়াপীড়ি করছেন? স্টেটমেণ্ট আমি দেব না।

—দরকার নেই—তেমনি অন্যমনস্ক স্বরে ধনেশ্বর বললে, বোসো, কথা আছে।

কথার ভঙ্গিটা এত নতুন রকমের ঠেকল যে বিস্ময়ের সীমা রইল না। এও কি একটা নতুন কায়দা, স্বীকারোক্তি সংগ্রহ করবার অভিনব পদ্ধতি কোনো? কিন্তু তা সত্ত্বেও সে বসল—প্রতীক্ষা করতে লাগল।

ধনেশ্বর হাসল। অত্যন্ত করুণ, অত্যন্ত বিষণ্ণ হাসি। হঠাৎ রঞ্জু

আবিষ্কার করল ধনেশ্বরের রগের কাছে এক গোছা পাকা চুল নড়ছে বাতাসে, যা এতদিন ওর নজরে পড়েনি! ম্লানস্বরে বললে, হয় না—হবার নয়।

—কী হবার নয়?—ঝোঁকের মাথায় এগিয়ে আসা প্রশ্নের বেগটা রঞ্জন সামলাতে পারল না।

—কিছুই হয় না—ধনেশ্বরের হাসিটা যেন কান্নায় রূপ পেল এবার। পকেট থেকে একটা হলদে রঙের লেফাফা বাড়িয়ে দিলে সে ওর দিকে। বললে, পড়ো।

বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল: পরিমলের স্বীকারোক্তি?

—না, পড়ো।

বারকয়েক দ্বিধাভরে ধনেশ্বরের দিকে তাকিয়ে রঞ্জন খামটা তুলে নিলে। একটা টেলিগ্রাম।

—এটা পড়ব আমি।

আবছা গলায় ধনেশ্বর বললে, পড়তেই তো দিলাম!

টেলিগ্রামটা খুলল রঞ্জন। সংক্ষিপ্ত কয়েকটি শব্দ: "Ajit died of explosion while making bombs, come sharp—Dhiren."

—এর মানে?—সন্দেহে ভ্রূকুঞ্চিত করে রঞ্জন বললে, আমাকে এ টেলিগ্রাম দেখাবার অর্থ কী? কোনো অজিতকে তো আমি চিনিনে।

—না, তুমি চিনবে না। তেমনি কান্নাভরা বিচিত্র হাসি হাসল ধনেশ্বর: আমার ভাগ্নে। নিজের ছেলের চাইতেও বেশি ভালোবাসতাম!

অজ্ঞাতেই একটা দুর্বোধ্য শব্দ করল রঞ্জন।

নিষ্প্রাণ ধরা গলায় ধনেশ্বর বললে, কে জানত, অজিতকে পর্যন্ত আমি ঠেকাতে পারব না? কিছুই হয় না—কিছুই করবার জো নেই। জানো, অজিতকে আমি নিজের হাতে মানুষ করতে চেয়েছিলাম!—ধনেশ্বরের কথার শেষ দিকটা থর থর করে কেঁপে উঠল। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল রঞ্জন।

—তোমার দোষ নেই, কারুরই দোষ নেই। যে দিন এসেছে, এমনিই হবে। কেউ কিছু করতে পারবে না, কেউ ঠেকাতে পারবে না—হঠাৎ ধনেশ্বর বললে, আচ্ছা, তুমি যাও—আর তোমাকে দরকার নেই।

পুলিশ দুটো এগিয়ে এল, এস্কর্ট করে নিয়ে চলল তাকে সেলের দিকে। যেতে যেতে পেছন ফিরে রঞ্জন দেখল—টেবিলের ওপর দুহাতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে ধনেশ্বর। রগের পাশে অদ্ভুত চক চক করছে পাকা চুলের গোছাটা!

—হায় রাম, বাঁচার দে—যারা ফাঁসি দেয়, আজ এ কান্না তাদেরও!

—কুড়ি—

আট বছর। আট বছর পরে রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় তার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে আনে বর্তমানের মধ্যে।

অনেকখানি সরে গেছে পদ্মা—এখান থেকে তার মূল প্রবাহটা অনেক দূরে। তিমির পেটের মতো ধবধবে শাদা আর উজ্জ্বল বালুচর ছড়িয়ে আছে চক্রবাল পর্যন্ত—নৌকোর পাল আর স্টিমারের কালো কালো চোঙা বয়ে আনে নদীর সংকেত। এদিকটাতে এলোমেলো ভাবে দুলছে কুলের জঙ্গল, টুকুরো টুকুরো ভাবে সবুজ হয়ে আছে ফুটি আর তরমুজের ক্ষেত। বাংলাদেশের বড় একখানা মানচিত্রে গঙ্গার ব-দ্বীপের মতো বালুচরের ভেতর দিয়ে এসে পড়েছে এলোমেলো জল রেখা। তাদের আনাচে কানাচে হাঁটু অবধি ডুবিয়ে প্রতীক্ষা করে আছে বড় ছোট নানা জাতের বক—চোখে সন্ধানী দৃষ্টি, মাছের নিশানা পেলেই জলে ছোঁ মারবে। ভাঙা পাড়ের গায়ে গায়ে গাং শালিকের গর্ত, তার কোনো কোনটায় মেছো আলাদ, জলো ঢোঁড়া আর মেঠো-ইঁদুরের আস্তানা! আধডোবা ডাউলের জীর্ণ মাস্তলে পান্নারঙের মাছরাঙা রয়েছে ধ্যানস্থ হয়ে।

হাতে যখন কাজ থাকে না আর পড়তে পড়তে মাথা যখন ঝিম ঝিম করে ওঠে, তখন বই বন্ধ করে সে শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকায় সম্মুখের দিকে। পদ্মার চরে দিনান্ত। বাঁ দিকে অনেক দূরে একটা পুরোনো মঠের চূড়ো কালো হয়ে আসছে রাত্রির রঙে। তার পেছনে সুপুরীর বন ক্রমেই একাকার আর অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, ভাঙা পাড়ের গায়ে কোলাহল তুলেছে ঘরমুখো গাং শালিক। একটির পর একটি বক পদ্মার চর ছেড়ে উঠেছে আকাশে, তীক্ষ্ণ কর্কশ চীৎকার করে ডানা মেলে দিচ্ছে ম্লানায়মান দিগন্তের দিকে।

উঁচু মঠটার নীরব নিঃসঙ্গ গম্ভীরতার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে রঞ্জন। সেই পুরোনো গল্প। কোন্ ধনগর্বিত সন্তান নাকি মায়ের চিতায় মঠ তুলে দিয়ে দম্ভ করেছিল: মাতৃঋণ শোধ করলাম! এতবড় স্পর্ধা ক্ষমা করেন নি আকাশের দেবতারা—মঠের চূড়ো কথার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ল মাটিতে। মাতৃঋণ শোধ হয় না—কেউ শোধ করতে পারেনি কোনোদিন। শ্রদ্ধা নিয়েছে সংস্কারের রূপ।

ওটার দিকে তাকিয়ে কেমন অদ্ভুত লাগে। ঘনিয়ে-আসা অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীটাও যেন ওর চারদিকে ঘুরে ঘুরে পাক খায়—হঠাৎ ছুটে আসা একটা দমকা বাতাসে হঠাৎ-প্রাণ পাওয়া অতীত প্রেতশ্বাস ফেলে চলে যায়।

চাকর এসে আলো রেখেছে ডেক চেয়ারের হাতলে, রেখেছে খবরের কাগজ আর একখানা খাম। হলদে রঙের লেফাফা—মিতার চিঠি। ওই কোনাকুনি করে ঠিকানা লেখবার একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি—এটা একান্তই মিতার নিজস্ব ধরণ।

—ডাক এল বুঝি?

—হাঁ বাবু, এই মাত্তর।

অতি যত্নে খামের কোণা ছিঁড়ে সে বার করলে চিঠিটা।

"কাল রাত্রে ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছিল। মনে হল দরজার কড়া নড়ছে, তুমি বুঝি এলে। আমি তখন কতগুলো চিঠি নিয়ে ব্যস্ত, শব্দটা শুনে চমকে উঠলাম। যদিও জানি সবটাই মনের ভুল, তবু উঠে গিয়ে দরজাটা খুললাম। একরাশ বৃষ্টির ছাট এসে চোখেমুখে পড়ল, বিদ্যুৎ চমকে—হঠাৎ মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগেকার এমনি একটা ঝোড়ো সন্ধ্যার কথা। হয়তো তোমার মনে নেই—কিন্তু সেদিনটাকে আমি কখনো ভুলতে পারব না। কী বিশ্রী, অথচ কী অদ্ভুত সন্ধ্যা!

বাস্তবিক তোমাকে না হলে চলছে না। মাঝে মাঝে এক একটা এমন সমস্যায় মধ্যে পড়ি। ভাবি, তুমি থাকলে সব কত সহজ হয়ে যেত। আচ্ছা, এত তো রাশি রাশি কাজ, তবু যখন তখন তুমি আমায় অন্যমনস্ক করে দাও কেন বলো দেখি?

—ভালো কথা। কাল সুতপাদি'র সঙ্গে দেখা হয়েছে। কী ভয়ংকর মোটা হয়ে গেছেন, ভাবতে পারবে না। আজকাল উনি এখানকার একজন নেত্রী—একটা মস্ত মোটরে চড়ে 'হরিজন বিদ্যামন্দির' উদ্বোধন করতে যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন, ভয়ংকর চটে আছেন কিনা আমাদের ওপর।

সে সব পরে জানাব। কিন্তু তুমি কবে আসবে, সত্যি বলো তো? মাঝে মাঝে কেন যে খারাপ লাগে। ধানকল ইউনিয়নের সেক্রেটারী নয়, তোমার মিতা জানতে চাইছে, কবে আসবে তুমি?

একটা নিশ্বাস ফেলে চিঠিটা বন্ধ করল সে। খুলল খবরের কাগজটা।

দারিদ্র্যজীর্ণ গ্রামের ক্ষীণ আভাস, গাছপালার বিরলশ্রী। আরো দূরে শীর্ণধারা নদীর একটা সংকেতও যেন পাওয়া যায়। এই বন্দী জীবনের সঙ্গে একটা আশ্চর্য মিল আছে তাদের।

শুধু এক আধদিন যখন রৌদ্রে-পিঙ্গল আকাশে পড়ত মেঘের ছায়া, ঘনিয়ে আসত বর্ষার কালো মেঘ, তখন কোথা থেকে দু চারটে ময়ূর এসে উড়ে বসত ক্যাম্পের উঁচু পাঁচিলের ওপর, বসত টাওয়ারটার মাথায়। নানা রঙের পেখম মেলে দিয়ে নাচত—একটা অন্য পৃথিবীর খবর যেন বয়ে আনত তাদের কাছে। মরু-মৃত্তিকা যেন রূপ আর প্রাণের অভিনন্দন পাঠিয়ে দিত।

সেই রকম এক একটা সময় ভারী খারাপ লাগত—হঠাৎ যেন অসহ্য হয়ে উঠত বন্দিত্বের এই বন্ধন-যন্ত্রণা। বিস্বাদ একটা তিক্ততায় চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছে করত—স্নায়ুগুলো যেন অবশ হয়ে যেত। ঘরে গিয়ে দু চার লাইন কবিতা মেলাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে শুয়ে পড়ত বিছানায়।

কিন্তু এই অবসাদগুলো বড় খারাপ, বড় ভয়ঙ্কর এই চুপ করে থাকা, এই একা একা বিস্বাদ ভাবনার মধ্যে তলিয়ে থাকা—এ লক্ষণগুলো মারাত্মক। এর ফলে একজনের মস্তিষ্ক-বিকার ঘটতে দেখেছে সে। বক্সার ক্যাম্পে আর একজন কী ভাবে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছিল সে কথাও সে ভোলেনি।

হঠাৎ কেউ হয়তো বিকট বেসুরো গলায় একটা গান ধরে বসত—কেটে যেত ঘোরটা। চোখে পড়ত, ক্যাম্পের নানা ঘরে ছোট ছোট দলে হয়তো ক্লাস বসে গেছে। উত্তেজিত আলোচনা চলেছে—বুদ্ধিতে আর দীপ্ত-সংকল্পে জ্বল জ্বল করে উঠেছে চোখগুলো। সঙ্গে সঙ্গে উদগ্র সুরাসারের মতো কী একটা সঞ্চারিত হয়ে যেত শরীরে—শিথিল শিরাগুলোর মধ্যে দ্রুত তালে রক্ত ছুটে চলত যেন স্ফুলিংগ বিকীর্ণ করে করে।

সেও এসে বসত দলের মধ্যে। গীতি-কবিতা নয়, জীবন-কাব্য। নিরাশ হলে চলবে না! Nothing to loose but your shackles, যারা ভয় পেয়ে সরে দাঁড়িয়েছে, যারা কাজের দায়িত্ব বইতে না পেরে যোগ-সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করেছে—তারা থামলেও আমরা তো থামব না। এতদিনেই তো আমাদের সত্যিকারের যাত্রা সুরু হয়েছে। এবারে কাজ আলাদা, পথও আলাদা। বাংলা দেশে ফিরে গিয়ে সেই পথই ধরব আমরা। মধ্যবিত্ত বিপ্লব-বিলাসে আর ক্ষ্যাপামির হাউই ওড়াবো না, প্রাণবন্ত করে তুলব ঘুমন্ত অগ্নিশিখরকে। ফৈয়জ মোল্লার যে প্রশ্নের জবাব বেণুদা দিতে পারেন নি—সে জবাব পৌঁছে দেব সারা মানুষের দরবারে দরবারে।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে কত কথা ভেবেছে রঞ্জন। রাজপুতানার মরুপ্রান্তরে বিস্তীর্ণ তমসা—বাংলা দেশের মতো ঝিঁঝিঁর ডাক নেই, নেই শেয়ালের প্রহর-ঘোষণা। নিয়ন্ত্রিত তালে সেন্ট্রির বুটের শব্দ কানে আসে—মনে পড়ে যায় তার বাংলা দেশ এখান থেকে স্বপ্নের মতো সুদূর। কিন্তু একদিন সেখানে ফিরে যাবে সে। কাজ করবে, ঝাঁপ দিয়ে পড়বে তার সত্যিকারের সমস্যাগুলোর মধ্যে। মুষ্টিমেয়ের মৃত অঙ্কুরকে বনস্পতিতে প্রাণিত করবে সমষ্টির কর্ষণায়।

ফিরে তো এসেছে। এসেছে সেই ছায়াবীথি আর নদীর উল্লাসে ভরা তার 'সার্থক জনমে'র পুণ্যপীঠে। কিন্তু চোখের সামনে আপাতত কী রূপ দেখতে পাচ্ছে সেই বাংলা দেশের? ব্যবস্থাপক সভায় যে বিতর্ক-বিধ্বস্ত দেশের মন্ত্রিত্ব-সংকট আজ চরমে উঠেছে, পড়েছে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ, তার সঙ্গে কোথায় এর যোজনা-সূত্র? এই থানায় আজ দুবছর ধরে সে অন্তরীণ হয়ে আছে। ওই তো বাঁ দিকে নিকারীদের ছোট গ্রামটায় আলো মিট মিট করছে, তার পাশেই নমঃশূদ্র পাড়া। এই দুবছরের ভেতরেই পাড়া দুটোর কী সুস্পষ্ট রূপান্তরই না চোখে পড়ল। প্রতি বছর বর্ষায় বান ডাকে পদ্মার স্রোতে—চর ডুবিয়ে হা হা করে ঘোলাজল ছুটে আসে, ভয় করে থানাটাকেও ভেঙে নামিয়ে না দেয়। পদ্মার বান ডাকে, কিন্তু কই, ওদের জীবনে তো বান ডাকল না! ওদের জগতে কোথায় সেই গিরিশিখর—বপ্রক্রীড়াশাল গজের মতো মেঘ গর্জে পাহাড় ফেটে যেখান থেকে ঢল নামবে! এই পদ্মার বাতাসেও কোথা থেকে আসে ম্যালেরিয়ার বীজ—কোথা থেকে আসে মারীর বিষস্পর্শ—কে বলতে পারে সে কথা? ওই গ্রামদুটোর অতীত সমৃদ্ধি এখনো বোঝা যায়—রাশি রাশি পোড়া ভিটে থেকে, জীর্ণ শীর্ণ আটচালা ঘর দেখে। কিন্তু যে ভিটে একবার মানুষ ছাড়া হল তা আর ভরে উঠল না, যে টিনের চাল বাতাসে একবার উড়ে গেল সে আর ফিরে এল না নিজের জায়গাতে। শ্রাবণ মাসে 'মনসার গান' এবার আর সমারোহ করে হয়নি ওখানে, নিকারীপাড়া থেকে শোনা যায় নি সম্মিলিত দেশী কাওয়ালী:

"আওরতেরা ডাবা বাজাইয়ে গান করে সুরে,
একদিন হজরতের ঘরে, একদিন নবীজীর ঘরে!
আছিল জয়নাল বিবি, আর ছিল খোদিজা বিবি,
আর ছিল কুন্‌নুন্ বিবি, নবীজীর ঘরে—"

কিছুই নেই, কিছুই বেঁচে নেই। শুধু আশ্বিন-কার্তিক আর ফাল্গুন-চৈত্রে

ওদিকের শ্মশানঘাটটায় চিতা জ্বলেছে অনেক বেশি ; গোরস্থানের দিক থেকে রাত্রে অনেক প্রবল হয়ে উঠেছে শেয়ালের কলস্বর।

এই বাংলা দেশ। মন্ত্রীসভায় এর সত্যিকারের সংকট রূপিত হয় না, কচুরিপানার সমস্যাও হয়তো এর জীয়ন-কাঠি নয়। এর চারদিকে শুধু বাদুড়ের কালো কালো ডানার মতো নড়ে বেড়াচ্ছে আকারহীন অপচ্ছায়া। এ-দেশের সন্ধান পায়নি বেণুদার আগ্নেয়-স্বপ্ন, 'ফাঁসির ডাকে'র লেখক। আজ চড়া বিদ্যুতের আলোয় কড়া পাওয়ারের চশমা চোখে যারা এ-পি, ইউ-পির সংবাদ ঘেঁটে বাংলা দেশের অবস্থা নিয়ে নিবন্ধ লিখে চলেছে, এই মৃত্যু-জর্জর ব্রাত্য বাংলা তাদের কাছে পাচ্ছে কোন্ সঞ্জীবনীর মন্ত্র, অভাবপক্ষে কতটুকু সান্ত্বনার বাণী ?

ফৈয়জ মোল্লার প্রশ্ন। এই নিকারীদের প্রশ্ন—নমঃশূদ্রের প্রশ্ন। সমস্ত দেশের উতরোল প্রশ্ন। কতকাল সে প্রশ্নকে এড়িয়ে চলব আমরা ? কতকাল মাইক্রোফোন-ফাটানো বক্তৃতা দিয়ে ভুলিয়ে রাখব সমষ্টির—সমগ্রের এই বারিধি-কল্লোলিত জিজ্ঞাসাকে ?

সমস্ত শরীর জ্বালা করছে, টিপ টিপ করছে কপালটা। ভেতরে কেউ বুঝি পেরেক ঠুকে চলেছে একটার পর একটা। চোখের জন্তেই এমনটা হচ্ছে বোধ হয়। হঠাৎ যেন কেমন একটা দুর্বলতা এসে পড়ে—এখান থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে মিতার পাশটিতে।

কয়েকটা নরম আঙুলের ছোঁয়া বুলিয়ে কেউ আস্তে আস্তে কপালটা টিপে দিলে বেশ হত। কিন্তু না—এসব যা তা ভাবনার কোনো মানে হয় না। ডাক্তার বাবুর কাছ থেকে কয়েকটা অ্যাসপরিন আনাতে হবে আবার।

কিন্তু বাংলা দেশ। ডেকে উঠেছে শেয়াল—যেন সমস্ত দেশের শবযাত্রার পথে তুলছে উল্লসিত হরিধ্বনি। আজ যদি সে বাইরে থাকত—কত কাজ করবার ছিল তার। বিপ্লবের অগ্নি-দীক্ষার মধ্য দিয়ে মন তৈরী হয়ে গেছে। কিন্তু অকারণ অপচয় আর সংশয়ের পথ নয়, অমিয় ঘটক, বেণুদা, করুণাদি কিংবা সুতপার ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করেও নয় ;—সমস্ত মানুষের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে, সাধারণ মানুষের যৌথশক্তিতে গড়া নিশ্চয়তার কঠিন বনিয়াদের ওপরে পা দিয়ে। বাস্তবিক, কত কাজ করবার আছে। বিশ্রামের জন্তে মেলা আছে মিতার সহযাত্রী, আর সেই সঙ্গে আছে—সীমাহীন, অজস্র !

—"তুমি কবে আসবে ?" মিতার প্রশ্ন। তারও মন মুক্তির জন্তে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে আজকে। এ আর নয়, এ আর সহ্য হয় না। আর ভালো

লাগে না নির্বাপিত উল্কার মতো এই অপমৃত্যুর শাস্তি। কত কাজ—কত কাজ! শেষে মিতাও তাকে পেছনে ফেলে কত এগিয়ে গেল!

—পড়লেন কাগজ?

থানার দারোগা। নিরীহ ভদ্রলোক, অমায়িক, স্বল্পভাষী। সব সময়ে মুখে একটু করে বিনীত হাসি লেগেই আছে তাঁর। রঞ্জনের এই বন্দিত্বের জন্যে যেন তিনিই অপরাধী—এই জাতীয় একটা আত্মনিগ্রহ সব সময়ে তাঁকে কেমন সংকুচিত করে রাখে।

সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে রঞ্জন বললে, বসুন।

দারোগা বসলেন। ধড়া-চূড়া ছেড়ে একখানা লুঙ্গি আর একটা সিলকের সার্ট পরে এসেছেন। আরাম করে হাত পা ছড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালেন আর একটা বাড়িয়ে দিলেন ওর দিকে। বললেন, তারপর আজকের কাগজে নতুন খবর-টবর কী আছে বলুন।

রঞ্জন হাসল।

—নতুন খবর আর কী থাকবে। সেই পুরানোর কপচানি।

—তা ঠিক—যা বলেছেন।—আরামের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন দারোগা: খবরের কাগজে পড়বার মতো কিছুই থাকে না আজকাল। সব সেই থোড়বড়ি খাড়া, আর খাড়াবড়ি থোড়। বিরক্তি ধরে যায়, বুঝলেন?

দারোগার মনের ভাবটা বুঝতে পারে রঞ্জন। খবরের কাগজে বিশেষ কিছু না থাকলেই খুশি হন তিনি। এত খবর, এত কোলাহল—মানুষের মস্তিষ্ক আর স্মৃতির ওপরে খানিকটা অহেতুক অত্যাচার ছাড়া তো আর কিছুই নয়। কী হবে এত খবর দিয়ে, কোন্ প্রয়োজন এইসব রাশীকৃত সংবাদে? দৈনন্দিন জীবনে কোলাহলের অন্ত নেই, অভাব নেই সমস্যার। চুরির এজাহার লিখতে হয়, ফেরারীর খবর রাখতে হয়, দাগীদের ওপরে মেলে রাখতে হয় সারাক্ষণের সজাগ দৃষ্টি; ডাকাতির সংবাদ এলেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে হয় হন্তদন্ত হয়ে। তার ওপর আবার যদি জাতীয় আর আন্তর্জাতীয় সমস্যা এসে ভিড় করে, তা হলে জীবনধারণ রীতিমতো দুর্বিষহ হয়ে ওঠে নিশ্চয়ই। খবরের কাগজ সম্পর্কে প্রশ্ন করা—এ আর কিছুই নয়, দৈনিক আলাপের যা হোক একটা মুখবন্ধ মাত্র।

রঞ্জন বললে, আপনার থানার খবর কী।

—থানার খবর?—দারোগা এতক্ষণে ধাতস্থ হয়ে বসলেন: থানার খবরের আর অভাব আছে কবে? যে সুখের চাকরী মশাই আমাদের! এই তো সকালে

কাশিমপুরে মস্ত একটা দাঙ্গা হয়ে গেছে। আইল ভেঙে লাঙল দিয়েছিল, তাতেই মস্ত হাঙ্গামা হয়ে গেল। দুটো জোর চোট খেয়েছে, তাদের একটা বোধ হয় বাঁচবে না।

—ধরলেন আসামী ?

একটা বড় গোছের হাই তুলে উদাসকণ্ঠে দারোগা বললেন, হ্যাঁ, দুপক্ষের গোটা দশবারোকে ধরে চালান করে দিলাম। আর বলেন কেন মশাই, যত ঝকমারীর কাজ। সাত জন্মের পাপ না থাকলে দারোগা হয় না কেউ।

রঞ্জন আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এই রকম দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা শুনলে মনে পড়ে সেই খুনী নিশিকান্তকে, মনে পড়ে সেই রাত্রে দুই ভায়ের মধ্যে দাঙ্গার কথা—সেই আর্তনাদ আর লাঠির শব্দ। কত দিন চলবে এই আত্মঘাতের পাপ, এই অপবুদ্ধির বিষাক্ত বিদ্বেষ ? নিজেদের মর্মজ্বালায় যে অগ্নি-পুত্তলিকা আজ জ্বলে মরছে তারা কবে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারবে শত্রুর দুর্গচূড়ায় ?

বিষণ্ণভাবে অল্প একটু হাসল সে। বললে, কেন, ইংরেজরাজত্বে আপনারাই তো সত্যিকারের লাটসাহেব বলে শুনি। এমন সম্মান আর এমন প্রাপ্তিযোগ—

—সম্মান আর প্রাপ্তিযোগ!—দারোগা ভ্রূকুটি করলেন: সে সব এখন লাস্ট সেঞ্চুরির মিথ্ মশাই। সম্মান মানে তো দিনরাত শালা বলছে। আর প্রাপ্তিযোগ!—দারোগা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি আন্দোলিত করলেন: লোকে দুর্দান্ত চালাক হয়ে গেছে আজকাল। ঘুষতো দূরে থাক, পাঁচটা টাকা সেলামী নিলেই চাকরী রাখা দায় হয়ে ওঠে।

—তা হলে খুব দুঃসময় যাচ্ছে আপনাদের ?

—সে আর বলতে! কী যে দিনকাল পড়েছে মশাই। গাধার মতো খাটনি আর ইন্‌সপেকটার থেকে সুরু করে তিনশো তেত্রিশ দেবতার পূজো। জান-প্রাণ বেরিয়ে গেল একেবারে।

দূরে একটা লণ্ঠনের আলো দেখা গেল। চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির সরকারী ডাক্তারবাবুর বাসা ওখানে। পাশা খেলায় দুর্দান্ত ঝোঁক ডাক্তার বাবুর। যেদিন সন্ধ্যায় 'কল' থাকে না, সেদিন পাশার ছক আর ঘুটি নিয়ে এসে দর্শন দেয় অনিবার্য ভাবে।

দারোগা বললেন, ডাক্তার আসছে।

কিন্তু যে এল সে ডাক্তার নয়। সামনে লণ্ঠন হাতে ডিস্‌পেন্‌সারীর সুইপার মধু, পেছনে একটি ষোড়শী—ডাক্তার বাবুর বড় মেয়ে সীতা। একখানা থালায়

ওপর পরিপাটি করে তিন চারটি বাটি সাজিয়ে এনেছে। লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে বললে, মা পাঠিয়ে দিলেন।

রঞ্জন বললেন, যে রকম ব্যাপার দেখছি, তাতে আমার এখানকার রান্নাবান্নার পাট তুলে দিয়ে তোমাদের ওখানেই পাকাপাকি ব্যবস্থা করে নিতে পারি।

তেমনি সলজ্জ শান্তস্বরে সীতা বললে, বেশ তো।

ঘরে ঢুকল সীতা। রঞ্জন জানে এর পরে কী কী করবে ও—ওর কাজগুলো রুটিনের মতো মুখস্থ হয়ে গেছে তার। প্রথমেই টেবিলের ওপর খাবারটা ঢেকে রাখবে, একটা কাচের গ্লাসে গড়িয়ে দেবে এক গ্লাস জল। তারপর তাকিয়ে দেখবে তার বিছানাটার দিকে—দেখবে তার চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল রূপ। বেড্‌কভারটা অর্ধেক লুটিয়ে আছে মাটিতে, বিছানার ওপরে স্তূপাকার বই ছড়ানো। ফাউন্টেন পেনটা পড়ে আছে খোলা অবস্থায়, বালিশের ওপরে খানিকটা কালি ছিটোনো। স্যুটকেসের পাল্লাটা আধ হাত ফাঁক হয়ে আছে —হয়তো দুটো চারটে ইঁদুর এরই মধ্যে নিশ্চিন্তে ঢুকে বসে আছে ওর ভেতরে। এক মুহূর্ত নিশ্চয় ইতস্তত করবে সীতা, তারপর যত্ন করে ঝেড়ে দেবে বিছানাটাকে। বই আর কলম তুলে রাখবে, আটকে দেবে স্যুটকেসের কল দুটো। এ কাজ সীতার নিত্যদিনের—এ তার অভ্যাস হয়ে গেছে। নিজের অজ্ঞাতেই একটা নিশ্বাস পড়ল রঞ্জনের। সীতার এই স্নিগ্ধ সেবার দাক্ষিণ্যটুকুর মধ্যে মিতা যেন প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে—সীতার উপস্থিতি যেন আর একজনকে সঞ্চার করে দেয়।

সীতা বেরিয়ে এল। যাওয়ার সময় বললে, একটু লক্ষ্য রাখবেন, বেড়ালে খেয়ে না যায়।

রঞ্জন মাথা নেড়ে বললে, আচ্ছা।

দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, তোর বাবা কোথায় রে সীতু?

—বাবা?—সীতা থেমে দাঁড়ালো। নতমুখে আঁচলের খুঁট আঙুলে জড়াতে জড়াতে তেমনি শান্ত কোমল গলায় বললে, 'কলে' গেছেন। ফিরতে রাত হবে।

লণ্ঠনের আলোটা মিলিয়ে গেল ক্রমশ।

—ওঃ, তাহলে আর পাশা জমবে না আজকে। ওঠা যাক, কী বলেন?

—আসুন।

তিন পা এগিয়ে দারোগা ফিরে তাকালেন একবার: ভালো কথা, কোনোরকম অসুবিধে হচ্ছে না তো আপনার?

—কোনো কম্‌প্লেন—

—না, না, কম্‌প্লেন নেই কিছু।

—আচ্ছা—দারোগা চলে গেলেন।

রঞ্জন তেমনি ভাবেই বসে রইল নীরব হয়ে। পদ্মার বুক থেকে আসছে ভিজে বাতাস, একটু একটু শিউরে উঠেছে লণ্ঠনের শিখাটা। অভিশপ্ত মঠটা অন্ধকারে নিমগ্ন। বালুচর আর জলধারাগুলো যেন তামায় তৈরী—অস্পষ্ট আর অসমুজ্জ্বল, তারার আলোয় লালাভ। গাং শালিকের কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেছে—এতক্ষণে নিভৃত কোটরে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে ওরা। ওধারে নিকারীপাড়ায় একটা আগুনের কুণ্ড জলছে, বোধ হয় জ্বাল দিচ্ছে গাবের রস।

মন আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসে।

কী আশ্চর্য জীবন। কর্মহীন, ঔৎসুক্যহীন—একটা চূড়ান্ত নির্বেদ সমস্ত বোধগুলোকে রেখেছে সমাচ্ছন্ন করে। পাঁচ বছর জেল, দু বছর অর্ডিন্যান্স আর অন্তরীন-বন্দীর জীবন চলছে এই দ্বিতীয় বৎসর। শহর মুকুন্দপুর এখন একটা অলীক ছায়াবাজীর মতো চোখের সামনে নেচে নেচে চলে যায়। কবে একদিন বুকের মধ্যে আগুন জলে উঠেছিল, দ্বীপান্তরের পার থেকে কবে কার কান্না এসে স্বপ্নাতুর নিশ্চিন্ত জীবনকে জোয়ারের তরঙ্গে দুলিয়ে দিয়েছিল। পরিমল, বেণুদা, তরুণ সমিতি। বর্ণচোরা ক্ষিতীশ চক্রবর্তী। কর্তব্যের কঠোর সংকল্প। এই মৃত্যুকে ছেদন করতে হবে, দূর করতে হবে এই ভয় আর অন্যায়ের শাসনকে। ওরে ভীরু ওরে মূঢ়, তোমার নিঃসঙ্কোচ মস্তক তোলো আকাশে। মনে রেখো দেবতার দীপ হাতে নিয়ে রুদ্রদূতের মতো আবির্ভূত হয়েছ তুমি। যত শৃঙ্খল, যত বন্ধন, সবাই তোমার চরণ বন্দনা করে নমস্কার জানাচ্ছে। মৃত্যু নেই সত্যের।

সেই সব উন্মত্ত দিন। অগ্নিদীক্ষা। আদর্শের পায়ে নিঃসঙ্কোচ প্রাণবলি। আজ প্রসারিত এই পদ্মার চরে, শান্ত সন্ধ্যায়, তারায় সমুজ্জ্বল এই বিস্তীর্ণ আকাশের নিচে সে চঞ্চলতা কোথায়? এখন শুধু অবকাশ আছে, অখণ্ড আর অনন্ত অবকাশ। কবিতা লেখা চলে, রাশি রাশি কবিতা। কিন্তু ভালো লাগে না। এই নিঃসঙ্গতা আর নির্জনতা সৃষ্টিকে উৎসাহ দেয় না, ভাবনা-বিলাসকে নিয়ে গুঞ্জন করে।

মরে যাওয়া নদীর মতো মন্থর—গতিহীন সময়। তাড়া নেই, তাগিদ নেই কিছু। বৃহৎ বাংলা—বৃহত্তর ভারত—কারুর রূপই মনের সামনে দেখা দেয়না বিশ্বরূপ হয়ে। এখানে বাংলা দেশ বলতে ওই মৃতকল্প গ্রাম, ওদের নির্বোধ

অপ্রসন্ন জীবন— চিন্তা ভাবনা সব কিছু যেন ওদের সঙ্গেই একাকার হয়ে গেছে। বিপ্লবের বহ্নিময় প্রেরণা নেই, আছে খানিকটা গভীর বেদনা আর নিবিড় সহানুভূতি।

কিন্তু এতো স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। এই শান্তি, মনের স্তিমিত মন্থরতা—এর জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করা দরকার। এই কয়েক বছরে অনেক পড়েছে সে, অনেক জেনেছেও। মনের কাছে আজ পরিষ্কার জবাব এসেছে, উত্তর এসেছে সেই রাত্রে ফৈয়জ মোল্লার সেই ব্যথিত প্রশ্নগুলোর। আজ জানে ওই নিকারীদের জীবনেও সেই প্রশ্নগুলোই সত্য হয়ে আছে এবং তাদের জবাব দিতে পারাই আজকের একতম কাজ।

বাইরের পৃথিবী ডাক দিচ্ছে—ডাক দিচ্ছে সেই কাজের দায়িত্ব। এরই মধ্যে মনকে ঝিমিয়ে পড়তে দিলে চলবে কেন তার। এবার আর বেণুদা, সুতপা কিংবা ওদের মতো আরো অনেকের অবক্ষয় নয়, একটা ব্যাধিগ্রস্ত উন্মত্ততার সংক্রামকতায় করুণাদির জীবন কান্না দিয়ে ভরিয়ে তোলাও নয়। সে ছিল প্রস্তুতির পর্ব, এখন সত্যিকারের মুহূর্ত এসেছে। অজস্র কাজ, বিশ্রামহীন সংগঠন, আমিন মুন্সীদের বিরুদ্ধে ফৈয়জ মোল্লাদের জাগিয়ে তোলা, নিশিকান্তদের অপমানকে আগুনের মতো দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়া। যাদের জন্যে তিরিশ সালের বন্যায় অবিনাশবাবু নিজেকে বিসর্জন দিয়েছিলেন, যাদের জন্যে এসেছিল উনিশ শো তিরিশ সালের অহিংস আন্দোলনের প্রাণবন্যা: আর যাদের প্রায় ভুলে গিয়েই রক্তের বন্যায় যাদের মুক্তি দেবার স্বপ্ন দেখেছিলেন ক্ষুদিরাম থেকে সূর্যসেন, এমন কি বেণুদা পর্যন্ত।

শুধু বেদনা আর সহানুভূতি নয়। এবার কঠোরতর কাজ, তিলি তিলে গড়ে তোলার কাজ।

চাকর এল। ধ্যান ভাঙিয়ে দিলে এসে।

—বাবু, খেয়ে নিলে হত না? রাত হয়ে গেছে।

দূর সমষ্টি-জীবনের পরিক্রমা থেকে রঞ্জন ফিরে এল তার ইন্টার্ণমেন্ট-ক্যাম্পের ডেক-চেয়ারে। নড়ে চড়ে সোজা হয়ে উঠে বসল সে।

—আজ তোর ভাত নষ্ট হল কৈলাস। বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, ডাক্তার বাবুর বাড়ি থেকে খাবার দিয়ে গেছে।

কৈলাস জবাবে একগাল হাসল।

—সে আমি আগেই জানতাম বাবু। তাই আজ রান্না করিনি।

হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসল। মাছ, মাংস, ডিমভাজা, ঘি ভাত, এক বাটি

পায়েস। এ সব সীতার নিজের হাতেরই রান্না। সীতার মা কিছুদিন থেকে ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত, ওইটুকু মেয়ের ওপরেই সংসারের সমস্ত ভার পড়েছে। বাপ, মা ভাই, বোন, সকলের পরিচর্যা মিটিয়ে এত রান্না সে করে কখন, আর করেই বা কী করে! চমৎকার এই মেয়েটি। যেমন লক্ষ্মীর মতো চেহারা, তেম্‌নি মিষ্টি স্বভাবটি।

খেতে খেতে চোখ পড়ল বিছানাটার ওপর, তারপর শেল্‌ফের দিকে, সুট্‌কেসটার দিকে। একটি কল্যাণী নিপুণ হাতের ছোঁয়া যেন তাদের ওপরে জলজল করছে সোনার লেখার মতো। এই রকম একটি কল্যাণ হাতের স্পর্শ কবে যে জীবনের ক্লান্তিকে মধুময় করে দেবে!

মিতার চিঠি মনে পড়ছে: "তুমি এসো, তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছি। তুমি না এলে আমার কাজে জোর পাবো না।" পদ্মার ঘূর্ণির মতো চুরমার করে টেনে নিয়ে যেতে চায় ওই ডাক। জোর তো শুধু দেবে না—জোর নিজেও পাবে।

ছেলেবেলায় অস্বস্তি জাগানো ফুলে ফুলে আলো করা সেই বাড়িটা কি এখনো আছে সেই রকম? শাদা পাথরের টেবিলের ওপর অগ্নিবলয়িত মূর্তিটা এখনো কি রয়েছে সেইখানটিতেই? সেই মহীশূর ধূপের গন্ধের সঙ্গে মিশেছে কি বাগানের রাশি রাশি সেই সব শাদা ফিকে লাল আর আশ্চর্য নিবিড় রক্ত রঙের ব্ল্যাক্ প্রিন্স গোলাপের গন্ধ? এখনো কি সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—পাখায় ইন্দ্রধনু-আঁকা বড় পাহাড়ী প্রজাপতি?

আর হরিণটা? টলটলে নীল চোখ? ঘাসের জমিটুকুর ভেতরে বড় বড় কান তুলে উদগ্রীবভাবে প্রতীক্ষা করছে মিতার পায়ের শব্দের জন্যে? না, সব মরে গেছে। ওই পরগাছার রঙীন জেল্লা মিশিয়ে গেছে ধুলোয়। আজকের মিতা ওর থেকে একেবারেই আলাদা। তার ঘুম-ভরা চোখ এখন বুদ্ধিতে প্রখর, শরীরে এখন সূর্য-তপস্বিনীর দীপ্তি। রাজকন্যা আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে মাটির কন্যা। সুতপাদি যা হারিয়েছেন, হয়তো আজ মিতা তাই-ই পেয়েছে। বেণুদা যাকে ভেবেছিলেন আদর্শচ্যুতি—ওদের কাছে তা অর্থহীন মনে হয় এখন। প্রেমকে ওঁরা প্রতিবন্ধক ভেবেছিলেন, কিন্তু নতুন কালের আলোতে আজতো তা পাথেয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আত্ম-সর্বস্বতা ওরা চায় না, কিন্তু কেন স্বীকার করবে আত্মবঞ্চনাকে?

পরিমলের গ্রামে রয়েছে, মিতার ইউনিয়ান। আরো কত কাজ জমেছে কে জানে। আজ আর ওদের সাধনা সব হারানোর নয়, সব ফিরে পাওয়ার।

আজকের নায়িকা শ্মশানে বাসর রচনা করে কপালে বিভূতির টীকা পরিয়ে দেয় না—শ্মশান থেকে সে ডাক দিয়ে আনে পুষ্পিত জীবনের উত্তরণে। একার নয়, সমগ্রের। তাই দুজনের প্রেম দিয়ে আজ আর নীড় রচনা নয়, দুজনের শক্তি দিয়ে সমস্ত মানুষের সংসার গড়বার কাজ। জৈব অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে এসে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নির্ভয়ে বলতে পারা :

"Spring through death's iron guard,
Her million blades shall thrust ;
Love that was sleeping, not extinct
Throw off the nightmare crust—"

আর নতুন প্রেমের এই মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে দেখতে পাওয়া :

"Sky-high a signal flame,
The sun returned to power above
A world, but not the same !"

কিন্তু সীতা ?

কেমন খটকা লাগল, কেমন বেদনার্ত হয়ে উঠল মন। একটুখানি সন্দেহ দেখা দিয়েছে যেন। আজকাল যেন অকারণে মেয়েটা লজ্জারক্ত হয়ে ওঠে, কেমন আড়ষ্ট হয়ে আসে চোখের পাতা। মাঝে মাঝে অদ্ভুত গভীর আর সুদূর দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকায়ও মনে হয়। কোনো রকম দুর্বলতা জেগেছে নাকি ওর ?

খচ্ করে একটা কাঁটা বিঁধে গেল বুকের মধ্যে। অসম্ভব নয়, একেবারেই অসম্ভব নয়। তাই কি তার সম্পর্কে এত যত্ন—এত পরিচর্যা ? তাই কি এই ঘর গুছিয়ে দেওয়াটা শুধু গুছিয়ে দেওয়াই নয়, গভীর একটা মমতার মতো আরো কিছু জড়িয়ে থাকে তার সঙ্গে ?

কী সর্বনাশ, কী ভয়ঙ্কর কথা !

রঞ্জন উঠে পড়ল। মুহূর্তে খাওয়ার স্পৃহাটা মিটে গেছে, মুছে গেছে খিদের রেশমাত্রও। মাথার মধ্যে কেমন করতে লাগল তার, যেন কতকগুলো লোহার পেরেকের ওপর হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল ক্রমাগত। কপালের রগগুলো যেন ছিঁড়ে যেতে চাইল টুকরো টুকরো হয়ে।

না, না, এসব বাজে চিন্তাকে মোটেই প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। এসব আর কিছুই না—একান্তভাবে তারই উইশ্‌ফুল থিঙ্কিং। বড় ভালো মেয়ে সীতা, ভারী ভালো মেয়ে। কেন তার এমন দুর্ভাগ্য ঘটবে, কেন সে পা দেবে এই

ভয়ঙ্কর সর্বনাশের খাদের মধ্যে? এসব আর কিছুই নয়—বহুল্লভব পুরুষের অবচেতন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি, আত্মপ্রেমের আত্মস্তুতি।

জোর করে ঠেলে সরিয়ে দিলে বিকৃত এই ভাবনাকে। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় এসে বসল রঞ্জন: হ্যাঁ—নিরাশ হলে চলবে না, কোনো রকম অল্প শিথিলতাকেও আর আমল দেওয়া যাবে না। কত কাজ আছে, কত কী করবার আছে তার। বাইরের জগৎ ডাকছে হাতছানি দিয়ে। সমস্ত দেশ রাত্রির কালো আকাশের মতো যেন গভীর বেদনাতুর চোখ মেলে তাকিয়ে আছে তার দিকে। অসহায় বন্দিত্ব, কঠিন শৃঙ্খল। এই বন্দিত্বের হাত থেকে তুমি মুক্ত করো আমাকে, এই শৃঙ্খল দূর করে দাও তুমি। তুমি এসো। রঞ্জনের বুকের মধ্যে বাজতে লাগল একটা আর্ত কলধ্বনি।

বালুচরে শোঁ শোঁ করে কাঁদছে ছেদহীন কুলের জঙ্গল।

রাত কেটে যায়, আসে সকাল। দিনের পর দিন। সময়ের সমুদ্রে ঢেউ ওঠে, ঢেউ ভাঙে। বৈশাখের শেষাশেষি একদিন নামে অশ্রান্ত ধারাবর্ষণ; পদ্মার জল বেড়ে ওঠে, কুলের বন অর্ধমগ্ন দেহ তুলে জেগে থাকে গেরুয়ারাঙা স্রোতের ওপর। নাগিনীর গর্জন লাগে মরা পদ্মার ধারায়; চড়াগুলো তলিয়ে গিয়ে তিন চারটি ধারা একটি ধারাতে রূপান্তরিত হয়। উঁচু ডাঙা জলের ঘায়ে ঝুপঝাপ করে ভাঙতে শুরু করে।

সব সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে আসে। রুটিনে বাঁধা জীবন, কাল কী হবে, পরশু কী হবে কী হবে, তারও পরের দিন—সব আঙুলে গুণে বলবার মতো জীবন। দারোগা আসেন, পাশার ছক পেতে বসেন ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার গালে হাত দিয়ে চাল ভাবেন। বারো পাঞ্জা সতেরো পড়তে থানার মুহুরীবাবু আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন বিকচ্ছ হয়ে।

দারোগা মাঝে মাঝে অত্যন্ত উদার ভঙ্গিতে বলেন, কত ভাগ্যে যে আপনাদের মতো লোককে আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম রঞ্জনবাবু। পুলিশে চাকরী করতে এসে তো আর ভদ্রলোকের মুখ দেখি নি।

রঞ্জন হাসে: চিরদিনই আমাকে আপনাদের মধ্যে এইভাবে আটকে রাখতে চান নাকি?

দারোগা জিভ কাটেন: ছি, ছি, কী যে বলেন। পুলিশের চাকরী কী যে লজ্জা আর ধিক্কারের ব্যাপার, সেটা তখনই বুঝি—যখন আপনাদের মতো লোককেও আমাদের পাহারা দিয়ে আটকে রাখতে হয়।

রঞ্জন কৌতুক করে বলে, বেশ তো, ছেড়ে দিন না, চলে যাই।

দারোগা ম্লান হয়ে যান। মাথা নিচু করে বলেন, কেন লজ্জা দিচ্ছেন। সবই তো জানেন, আমাদের ক্ষমতার দৌড়ও জানেন। নেহাৎ পেটের দায় বলেই গোলামী করি নইলে—

তা সত্যি। আন্তরিকতার স্পষ্ট উত্তাপ পাওয়া যায়। আইন আর পেষণযন্ত্র মানুষকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলতে পারে, স্বাধীন সত্তা হরণ করতে পারে তার, কিন্তু মনকে তো মেরে ফেলতে পারে না। দেশ, জাতি—অপমান আর নির্যাতন, থেকে থেকে তারও হৃদয়কে এসে দুলিয়ে তোলে। কিন্তু জীবিকা, দৈনন্দিন প্রয়োজনের প্রত্যক্ষ আর নিষ্ঠুর সমস্যা। সবাই মহামানব হতে পারে না, নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে বিলিয়ে দেবার মতো যোগ্যতাও তো থাকে না সকলের। এই সমস্ত মুহূর্তে, দারোগার এই অনুতাপ-বিদ্ধ কণ্ঠস্বরে যেন সেই অপমানিত মানুষটি নিজেকে অতি দুর্বলভাবে ব্যক্ত করবার চেষ্ট করে।

বাস্তবিক এখন ভালো লাগে দারোগা সাহেবকে। রাগ হয় না, অভিযোগ করতে ইচ্ছেও হয় না। সবাই দেবতা নয়, হলে পৃথিবীটার চেহারাটাই তো অসহ্য হয়ে উঠত। সামগ্রিক দেশকে জানবার পরে কবি রঞ্জন এখন মানুষকে ভালোবাসতে শিখেছে। ত্রুটি বিস্তর রয়েছে মানুষের, আছে স্বার্থবুদ্ধি, আছে প্রচুর সংকীর্ণতা। তবুও মানুষ—মানুষ। সে নিত্যকালের, তাই হৃদয়ের মৃত্যু নেই কখনো। হয়তো এমনি একটা হৃদয় ধনেশ্বরেরও ছিল। ছিল কি?

ডাক্তারবাবু বলেন, আজ একটু দেরী করে চা খাবেন রঞ্জনবাবু। সীতা বোধ হয় দু চারটে মিষ্টি তৈরী করেছে, নিশ্চয় পাঠিয়ে দেবে আপনাকে।

রঞ্জন বলে, সীতা তো রোজই খাওয়াচ্ছে। আজ না হয় কিছু একচেঞ্জ করা যাক। আমার ঘরে দু টিন ভালো ক্রীম-ক্র্যাকার পড়ে আছে, নষ্ট হচ্ছে। নিয়ে যান না, ছেলেপুলেদের—

ডাক্তারবাবু সস্নেহে হাসেন।

—আমি আপনার বাবার বয়সী। ভদ্রতাটা আমার সঙ্গে নাই-ই করলেন। বাড়িতে ছেলেপুলের কি খাওয়ার ত্রুটি আছে এক বিন্দু। ওসব বরং আপনারই থাক, একদিন নয় দল বেঁধে সবাই এগুলোকে শেষ করে দিয়ে যাব।

এর ওপর আর কথা চলে না।

দিন কাটে। আকাশে নববর্ষার নীল মেঘ দেখা দেয়। প্রেতায়িত মাঠকে কুয়াশায় আচ্ছন্ন করে দিয়ে প্রবল ঘন ধারায় বর্ষণ নামে। পদ্মার পাড় ভাঙে, তার সঙ্গে ভেঙে পড়ে গাং-শালিকের বাসা। রাক্ষসী নদীর জল দুলে ওঠে, ফুলে ওঠে, গর্জন করে। বুনো কুলের জঙ্গল কোথায় গেছে

শুকিয়ে, সেখানে এখন পনেরো হাত লগিরও থই মেলে না। জেলেদের গ্রামগুলো বৃষ্টিতে অস্পষ্ট হয়ে যায়, 'ফটিক-জল' পাখি ঝাঁক বেঁধে নাচতে শুরু করে বর্ষণ-ক্ষরিত কালো আকাশে।

আকাশ, বাতাস, হঠাৎ ক্ষেপে-ওঠা পদ্মা—সকলের সঙ্গে একটা সহজ প্রীতির সম্পর্ক। বই পড়তে পড়তে ক্লান্তি বোধ করলেই বাইরের জগৎটা এসে যেন মিতালি পাতিয়ে নেয় রঞ্জনের মনের সঙ্গে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে বসে থাকতে পারে এদের ভেতরে নিমগ্ন হয়ে; তা ছাড়া দারোগা আছেন, কম্পাউণ্ডার আছেন, ডাক্তার আছেন। একটা বিচিত্র নিশ্চিন্ত পরিবেষ্টনী।

তবুও বন্দীজীবন পীড়িত করে মনকে। খবরের কাগজ বিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষের সংবাদ বয়ে আনে। আমেদাবাদ আর কানপুরের মিলে মিলে শ্রমিক ধর্মঘট। মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা। বিলাতে রক্ষণশীল দলের অনমনীয় মনোভাব। কাজের অন্ত নেই তার। আজ যদি সে বাইরে থাকত, কত কাজ যে করতে পারত! শক্তি আছে দেহে, প্রচুর উৎসাহ আছে মনে। একথা সত্যি যে কিছুদিন থেকে দেশের নতুন কাজের পদ্ধতির সঙ্গে তার সংযোগ নেই। দেশ যে কতটা এগিয়ে গেছে তা ঝাপসা ঝাপসা ভাবে খানিকটা অনুমান করতে পারে মাত্র, বুঝতে পারে না সঠিকভাবে। আজকের কর্মীদের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে, চিন্তা মিলিয়ে নিতে হয়তো তার সময়ও লাগবে খানিকটা। তা লাগুক, তবু সময়ের দাবী এসে পৌঁছে গেছে, ব্যক্তি মানুষ, আত্মকেন্দ্রিক রঞ্জুকে আজ নিজের জীবন রচনা করতে হবে সমগ্রের মধ্যে, আর দেরী করা চলবে না।

পরিমল তো আছেই। তার ভিলেজ-অর্গ্যানাইজেশন আছে, আরো কত কাজ বাড়িয়ে বসে আছে সে কে জানে। আর আছে মিতা। অবকাশ দিয়ে গড়া কাজ, ভালোবাসা দিয়ে বেষ্টিত কর্তব্য কর্মক্লান্ত মুহূর্তগুলো সঙ্গে সঙ্গে পাদপাদপ। কাজকে মধুর করবে, চলাকে দেবে গতি। নতুন পৃথিবী গড়বার পথে মূর্তিময়ী সহযাত্রিণী।

—"আমি তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছি, কবে আসবে তুমি?"

কবে আসবে তুমি? সারা শরীরে কথাটার রেশ বয়ে নিয়ে রঞ্জন পায়চারী করতে লাগল ঘরময়। হঠাৎ টিনের চালের ওপর ঝম্ ঝম্ করে শব্দ বেজে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে গুমোট করে ছিল আকাশটা, বৃষ্টি নামল এইবারে। ক্যাম্পের সামনে নিমগাছটায় সাড়া পড়ে গেল ধারাস্নানের আনন্দে।

এমনি সময় বাইরে থেকে একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে একেবারে রঞ্জনের দাওয়ায় এসে উঠল।

—আরে সীতা যে!—আশ্চর্য হয়ে বলল, এই দুপুরবেলায় কী মনে করে? এসো, এসো, ঘরে এসো।

ভিজে আঁচলটা ভালো করে জড়িয়ে নিলে সীতা। লজ্জাকরুণ মুখে বললে, মা একটা বই চাইছেন, তাই—

—বই? তা বোসো, বোসো। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

ভীরুর মতো যেন ছোঁয়া বাঁচিয়ে সীতা চেয়ারটার একপাশে বসল। রঞ্জন বললে, বাংলা বই তো বেশি আমার কাছে নেই, দু একটা পত্রিকা আছে। তাই দিতে পারি।

—দিন—

পত্রিকা নিয়ে সীতা উঠে দাঁড়াবার উপক্রম করল। কিন্তু বাইরে তখন মুশলধারায় বৃষ্টি নেমেছে। নাগিনী পদ্মার জল ফুটে উঠছে টগবগ করে, ঝুপঝাপ শব্দে ভেঙে পড়ছে পাড়। রঞ্জন বললে, এই বিষ্টির ভেতর যাবে কী করে? একটু দাঁড়িয়ে যাও।

চেয়ারের হাতলটা ধরে সীতা দাঁড়িয়ে রইল সসঙ্কোচে। কপালের ওপর নেমে আসা চুলে জলের বিন্দু। লজ্জিত মুখখানাতে যেন পূর্বরাগের রক্তিম স্পর্শ। গভীর কালো চোখের দৃষ্টি একবার ওর মুখের ওপর ফেলেই মাথা নামাল সীতা। আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো, সে বিদ্যুৎ যেন তার তরল চোখের ওপরেও চমক লাগিয়ে গেল।

আর চমকে উঠল রঞ্জন। এবারে আর ভুল নেই—আর সন্দেহ নেই কোথাও। এমন দৃষ্টি আর একজনের চোখে সে দেখেছিল, ঠিক এমনি আর একজনের দৃষ্টিই তার সমস্ত জীবনকে আলো করে দিয়েছে। সে মিতা। আজ সাত বছরের ওপার থেকে আবার কার চোখে তা ফিরে এল, ফিরে এল কোন অর্থহীন শূন্যতায়!

অস্বস্তিভরা আতঙ্কে যেন অসাড় হয়ে গেল সে, একটা আকস্মিক প্রবল আঘাত লাগবার মতো তার স্নায়ুগুলো যেন সমস্ত অনুভূতি হারিয়ে বসেছে। বাইরে বৃষ্টির শব্দ—নিমগাছটার পাতায় তেমনি সমানে চলেছে ক্ষ্যাপামির উল্লাস। দ্রুত পদধ্বনির মতো হৃৎপিণ্ডে শব্দ উঠছে অবিশ্রাম। আর কেমন অপূর্ব স্নিগ্ধ ভঙ্গিতে আবার চোখ তুলেই সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিয়েছে সীতা।

তার গালের লালিমা আরো ঘন হয়ে এসেছে, অপরাধীর মতো আঙুলে জড়িয়ে চলছে আঁচলটাকে।

এ অসম্ভব, এ অসহ্য। অঙ্কুরেই বিনাশ ঘটাতে হবে এর। এই শান্ত লক্ষীর মতো মেয়েটির মনকে একবিন্দু কালিমার হাত থেকেও বাঁচতে হবে তাকে।

—আর কিছু বলবে সীতা?

সীতা বললে, হুঁ।

—কী বলবে?—এবার চেষ্টা করেই যেন সহজ হওয়ার ভাবটা আনতে হল গলায়।

প্রায় অস্ফুট স্বরে সীতা বললে, আমি আপনার কাছে পড়ব।

—আমার কাছে?

—হাঁ—সীতার লজ্জিত চোখে এবার অনুনয়ের আকুতি রূপ পেল: আমাকে একটু ইংরেজি পড়িয়ে দেবেন। যদি আপনার খুব অসুবিধে না হয় তা হলে কাল দুপুর বেলায়—

কাল দুপুর বেলায়! সমস্ত অনুভূতি চমকে উঠল। ফাঁস পড়ছে, এসেছে প্রথম পাক। এখনি একে ছিন্ন করা উচিত। এমনি রূঢ়ভাবে বলে দেওয়া উচিত তার সময় নেই, দুপুর বেলা তার নির্জন ক্যাম্পে একটি কুমারী মেয়েকে পড়াবার বিপজ্জনক দায়িত্ব সে নিতে পারে না।

কিন্তু সীতার চোখের দিকে তাকিয়ে একটা কথাও বলতে পারল না সে। নিজের মধ্যে যে প্রবল প্রতিবাদ উঠেছিল, নিজের অজ্ঞাতেই তা আশ্চর্য ভাবে স্তিমিত হয়ে গেল।

—আচ্ছা, এসো।

বৃষ্টির জোরটা কমে গেছে, কিন্তু ঝিরঝির করে পড়ছে তখনো। সীতা আর দাঁড়ালো না, দ্রুত বেরিয়ে চলে গেল ঘর থেকে।

বৃষ্টি থামল। বিকেল এল, এল সন্ধ্যা। রঞ্জনের যেন বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না আজ। সমস্ত দেহমন যেমন ক্লান্তি, তেমনি গ্লানিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে তার। এ কী হচ্ছে—এ কোন্ দুর্বলতার বীজ বপন করতে যাচ্ছে সে। জানে এর কোনো পরিণাম নেই, নেই এর কোনো সার্থক পরিণতির দ্যোতনা। অনর্থক জীবনে জেগে থাকবে ক্ষতরেখা, অকারণে আর একটি মেয়েকে চিরদিনের মতো ক্ষতিগ্রস্ত করে রেখে যাবে। পড়ানো নিয়ে যার শুরু, তার শেষও কি সেইখানে?

ছি ছি, এ হতেই পারে না। মন নিয়ে দোলা খাওয়ার মতো কাঁচা বয়েস তার কেটে গেছে। কাজ, অনেক কাজ। দরকার হলে কঠিনভাবে ঘা দিয়ে মোহভঙ্গ ঘটিয়ে দিতে হবে মেয়েটার।

কী করবে কাল? এলে বলবে, তুমি চলে যাও? অথবা বলবে—

কিন্তু কিছুই বলবার দরকার হল না আর।

ছপ ছপ করে একরাশ জলকাদা ভেঙে শশব্যস্তে প্রবেশ করলেন দারোগা আনন্দ শচ্ছল স্বরে জানালেন, রঞ্জনবাবু, কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্‌।

—কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্‌! রঞ্জন চমকে বিছানার ওপর উঠে বসল: ব্যাপার কী?

—স্বার্থপরের মতো আপনাকে আটকে রাখতে পারলেই খুশি হতাম আমরা। কিন্তু তার উপায় নেই আর।

—হেতু?

—আপনার রিলিজের অর্ডার এসেছে?

—রিলিজ! চমক আর অবিশ্বাসে উচ্চকিত চোখে চেয়ে রইল রঞ্জন।

তিন ঘণ্টার মধ্যেই—You are to start! তারপর সকালের ট্রেনে কলকাতা। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে আপনাকে খালাস দেওয়া হবে। এমার্জেন্সি অর্ডার।

কিন্তু এত শর্ট নোটিশে? আমার জিনিসপত্র—

—সব ব্যবস্থা করব, কিছু ভাববেন না। Congratulations again! কিন্তু আমাদের ভুলে যাবেন না রঞ্জনবাবু। অপরাধ অনেক করেছি, যোগ্য মর্যাদাও দিতে পারিনি। সেজন্যে দায়ী আমরা নই, দায়ী আমাদের—যাক, মনে রাখবেন দয়া করে।

লণ্ঠনের আলোয় পুলিশের দারোগার নিষ্ঠুর কঠিন চোখও চকচক করে উঠল নাকি?

পদ্মার স্রোতে নৌকো ভাসল রাত এগারোটায়।

কিন্তু কী আশ্চর্য, ঘটনাটা ঘটল ঠিক তারই পূর্ব মুহূর্তে। যাত্রার সঙ্গী হয়ে এলেন না দারোগা সাহেব স্বয়ং, তার পরিবর্তে এল এ-এস-আই সুধীর দাস।

—কী মশাই, দারোগা সাহেব কোথায়?

সুধীর যেন একটু একটু হাঁপাচ্ছিল। বললে, তিনি আসতে পারলেন না। আমিই এসকর্ট করে নিয়ে যাবো আপনাকে।

—কেন?

—একটা কাণ্ড হয়ে গেছে মশাই। ওপারে এক জমিদার আছেন, ডাক-সাঁইটে দুঁদে লোক। খুন করাতে পারেন চোখ বুজে, এতকাল তো প্রজাদের ভিটেতে কলাই বুনেই এলেন তিনি। এবারে উল্টে পড়ছে তাঁর পাশা। গাঁয়ের হিন্দু-মুসলমান শ চারেক লোক মিলে তাঁর বাড়ি অ্যাটাক্ করেছে। তিনিও ভেতর থেকে বন্দুক চালাচ্ছেন সমানে, একটা খণ্ডযুদ্ধ হচ্ছে। সেই খবর পেয়েই দারোগা সাহেব ছুটে গেলেন। ওদিকে আবার আপনাকেও নিয়ে যেতে হবে, তাই আমি এলাম।

—বলেন কি, খণ্ডযুদ্ধ!

সুধীর দাস একটা বিড়ি ধরালো: কে জানে মশাই, হাওয়া যে এখন কোন্ দিকে যাচ্ছে! দুদিন বাদে কী যে ঘটবে কিছুই তো বুঝতে পারছি না। নইলে এই নমঃশূদ্র আর নিকারীরাও সহায়রামবাবুর মতো বাঘা লোকের বাড়ি অ্যাটাক করতে সাহস পায়! ছোটলোকের যে রকম তেজ বেড়েছে তাতে কোনোদিন বা দুনিয়াটাকেই পাল্‌টে দেয় এরা!—সুধীর বৈরাগ্যভরে বিড়ির ধোঁয়া উড়িয়ে দিলে।

রঞ্জন চুপ করে রইল। কোথায় যেন একটা সমাধান হয়ে যাচ্ছে। মনের বিশৃঙ্খল সূত্রগুলো যেন জুড়ে যাচ্ছে একসঙ্গে—রূপ নিচ্ছে একটা সুনিশ্চয়তার।

পদ্মার স্রোতে নৌকো চলল এগিয়ে।

আবার বাইরের পৃথিবীতে তার বিস্তৃত উদার আক্রমণ। এই মুক্তি। বুকভরা অশ্রান্ত জোলো বাতাস টেনে পারছে সে। নৌকো ভেসে চলেছে পদ্মার বন্ধনহীন স্রোত প্রবাহে। এপাশে আফিঙের বিষাক্ত নেশার মতো তন্দ্রাচ্ছন্ন বাংলার দেহে তার নতুন কর্মক্ষেত্র; ওপাশের সীমানাহীন জলের বিস্তারে যেন তারই দুরধিগম্যতার ব্যঞ্জনা।

সীতা কাল দুপুরে আসবে বলে গিয়েছিল।

ও কিছু না। পথ চলতে চলতে অমন দু চারটে লতা পায়ে জড়িয়ে ধরেই। তাদের ছিঁড়ে ফেলে এগিয়ে চলাই তো জীবন। মুক্তি। ডাকছে জনবহুল, কর্মবহুল পৃথিবী। কতদিন সে দেশের রাজনৈতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। সে ক্ষতি পূরণ করে নিতে হবে—সময় নেই তার। ফিরতে পারবে না, পারবে না পেছনের নীড়ে তাকাতে। দেশ জুড়ে চলেছে জন-জগন্নাথের রথ, কালের যাত্রা। সেই রথযাত্রায় পেছনের ভিড় তাকে ঠেলে নিয়ে যাবে; নিয়ে যাবে তারই আদর্শ আর ব্রতচর্যার নির্ভুল লক্ষ্যে।

কিন্তু—

ও কিন্তু থাক। সীতা ভুলে যাবে। হয়তো কালই। নয়তো বড় জোর এক বছর। আর মিতা প্রতীক্ষা করে আছে। সীতার মধ্যে উষার পুনরাবির্ভাব বুঝি দেখেছিল—সাত ভাই চম্পার স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গে তা হারিয়ে যাক্। মিতা। রজনীগন্ধার মৃত্যু হয়েছে আত্মবিলাসের রাত্রে। মিতার দৃষ্টি-প্রদীপে আজ সূর্য-মুখীর তপস্যা। দুরূহ পথে নিত্য সহচারিণী সে :

"This is our day ; So turn my Comrade turn

Like infant eyes, like sunflower to the light !"

স্রোতের টানে নৌকো চলেছে সম্মুখে। পেছনে থানার আলোটা মিলিয়ে এল—অন্ধকারে তলিয়ে গেল ভাঙা মঠের নির্বাক মূর্তিটা। তমসাবৃত জনপদে বিস্তীর্ণ বিপুল ভারতবর্ষ—তার নতুন কর্মক্ষেত্র ; খড়্গধার জলতরঙ্গে গণ-সমুদ্রের ডাক।

কিন্তু ওকি! নৌকোর মধ্যে থেকে হঠাৎ সকলেরই চোখ পড়ল ওদিকের আকাশে।

বহুদূরে কোথায় আগুন লেগেছে। দিকচক্রবাল ধরেছে একটা প্রেত-পিঙ্গল মূর্তি—দৈত্যের ছিন্ন হৃৎপিণ্ডের মতো তার ওপরে থেমে আছে রক্ত মেঘ। আগুনের এক একটা বিসর্পিল শিখা কতগুলো লোলুপ আঙুলের মতো আকাশ থেকে কী যেন ছিনিয়ে নিতে চাইছে!

সচকিতে রঞ্জন বললে, সেই জমিদারবাড়িতেই আগুন লাগল নাকি ? ও সুধীর বাবু!

সুধীরের কপালে ভ্রূকুটি ফুটে উঠল।

—কে জানে মশাই! তবে সহায়রামবাবুর বাড়িটা ওই দিকেই বটে—শুকনো গলায় সে জবাব দিলে।

রঞ্জনের মন দুলতে লাগল, হঠাৎ আলো হয়ে উঠল দৃষ্টি। অপমানিত নিশিকান্তেরা, কি জেগে উঠেছে, আত্মহত্যার হাত থেকে কি মুক্তি পেয়েছে ফৈয়জ মোল্লার দল ? ওই তো—ওই তো তারই সঙ্কেত—আগামী প্রভাতে ক্রান্তি-সূর্য জাগবার আগে অগ্নিদীপিত পূর্বরাগ : "Sky-high a signal flame—"।

এর পর ?

এরপর তো একা রঞ্জন আর কোথাও নেই। আর নয় ব্যক্তিসত্তার কাহিনী। এতক্ষণে রঙীন্ বুদ্বুদটা এইবারে মিলিয়ে যাচ্ছে আদিগন্ত খরপ্রবাহে। এরপর সে সকলের। তার ইতিহাস সাড়া দেবে লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী

মানুষের সঙ্গে, তার পরিচয় সর্বজনীন প্রাণ-বিক্ষোভে, তার পথের আহ্বান পাঠাচ্ছে ওই রক্তপিঙ্গল শিখালোলুপ আগ্নেয়-দিগন্ত। সীতা আজ মৃত অতীত হয়ে পড়ে রইল কবি রঞ্জুর গীতি-কবিতার খাতায়। আর ওই আগুনের পথে মিতা তাকে ডাক দিয়েছে, তার হাতে অনির্বাণ বিপ্লবের রক্তমশাল। ব্যক্তি-মানসের এই কাহিনীটুকুই তারই প্রস্তুতি-পর্ব।

অগ্নিমেঘ-আকাশের চন্দ্রাতপ মাথার ওপর। আগুনের ফুল্‌কির মতো দপ দপ করে জ্বলছে সত্যের সাক্ষর—লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি নক্ষত্রের শিলালিপি॥

—শেষ—